প্রাচীর

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রাচীর

রেইনড্রপস

প্রকাশিত

প্রাচীর

সম্পাদক	■	জিম তানভীর
প্রথম প্রকাশ	■	শা'বান ১৪৩৫ হিজরি, জুন ২০১৪ ঈসায়ী
দ্বিতীয় মুদ্রণ	■	শা'বান ১৪৩৫ হিজরি, জুন ২০১৪ ঈসায়ী
তৃতীয় মুদ্রণ	■	যুলক্বাদা ১৪৩৫ হিজরি, সেপ্টেম্বর ২০১৪ ঈসায়ী
দ্বিতীয় সংস্করণ	■	জুমাদা আল-আওয়াল ১৪৩৬ হিজরি, ফেব্রুয়ারি ২০১৫
গ্রন্থস্বত্ব	■	রেইনড্রপস
প্রচ্ছদ	■	রেইনড্রপস
মূল্য	■	২৫০ টাকা

www.raindropsmedia.org
www.facebook.com/raindropsmedia
www.youtube.com/raindropsmediaorg2015

ISBN: 978-984-33-8969-5

“শত্রুরা আমার কী–ই বা ক্ষতি করবে? আমি তো জান্নাতকে বুকে নিয়ে চলি ... কারাগার আমায় দেয় রবের সাথে একাকী সময় কাটানোর সুযোগ, তারা আমায় হত্যা করলে আমি স্বাদ নেব শাহাদাতের অমৃতসুধার, আর যদি তারা আমায় নির্বাসনে পাঠায় তবে আমি বেরিয়ে পড়ি দ্বীনি সফরে ...”

– শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله

রেইনড্রপস এর অন্যান্য প্রজেক্ট

অডিও লেকচার সিরিজ

১) পরকালের পথে যাত্রা
২) পথিকৃৎদের পদচিহ্নঃ নবীদের জীবন
৩) ধূলিমলিন উপহারঃ রামাদান
৪) সীরাহ অডিও

প্রকাশিত অন্যান্য বই

১) সীরাহ ১ম খণ্ড

প্রকাশিতব্য বই

১) সীরাহ ২য় খণ্ড

সূচিপত্র

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বলা তারিক মেহান্নার কথাগুলো পড়ি আজকে থেকে প্রায় দুই বছর আগে। কথাগুলো আমাকে এতটাই নাড়া দিয়েছিল যে, আমি সেদিনই কথাগুলো অনুবাদ করতে বসে পড়ি। সম্ভবত সেই লেখাটি আমার করা প্রথম অনুবাদ। পরবর্তীতে আরো কিছু কারাবন্দী ভাইয়ের লেখা পড়া হয়। যতই পড়লাম ততই মনে হতে লাগল, তাদের কথায় কী যেন একটা আছে যেটা অন্য কারো লেখায় নেই। অন্যদের কথা যদি কানে বাজে তবে তাদের কথা যেন হৃদয়ে ধাক্কা দেয়। তাদের চিন্তাগুলো স্ফটিক-স্বচ্ছ ও নির্মোহ, কথাগুলো ইস্পাতদৃঢ়, এবং তাদের উপলব্ধিতে আছে এমন এক তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি যা অনেক 'স্বাধীন' মানুষদেরও নেই।

সময়ের সাথে আবিষ্কার করলাম, সত্য কথা বলার আরেক নাম কারাবাস। আর তাই আমরা দেখি ইসলামের ইতিহাস জুড়ে সত্যভাষী 'আলিমদের সাথে কারাগারের এক অদ্ভুত সখ্যতা। আর আমাদের এই সম্মানিত 'আলিমগণ হচ্ছেন নবী ইউসুফ ﷺ এর গর্বিত উত্তরসূরী, যাকে আল্লাহ কারাগারে প্রেরণ করেছিলেন, দান করেছিলেন নবুয়্যওয়াত, শিক্ষা দিয়েছিলেন 'ইলম এবং হিকমাহ এবং সবশেষে দিয়েছিলেন দুনিয়ার বুকে রাজত্ব। আর সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের পূর্ববর্তী 'আলিমগণ সত্যকে ভালোবেসেছেন নিজের জীবন থেকেও বেশি, তাই আল্লাহ তাদের কলমের দ্বারা দ্বীনকে রক্ষা করেছেন এবং আজও তা করে চলেছেন।

আর এরই সাথে ইতিহাস থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পাই, তা হলো, একজন মানুষকে বন্দী করা যায়, হত্যা করা যায় কিন্তু তার চিন্তা ও আদর্শকে দমন করা যায় না। আর তাই আমরা দেখি ইমাম আবু হানিফা, শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহদেরকে رحمهم الله বন্দী করে থামিয়ে রাখা যায়নি, তারা যে শিক্ষা দিয়েছেন তা আজ পৌঁছে গেছে মুসলিম বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তে। এটা আল্লাহর عز وجل ক্ষমতার এক জাজ্বল্যমান প্রদর্শনী।

﴿ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

"আল্লাহ তাঁর কাজকর্মে সর্বেসর্বা, কিন্তু অধিকাংশ লোকেই জানে না।" [সূরা ইউসুফ, ১২: ২১]

আল্লাহ তা'আলা তার দ্বীনকে আলোকিত রাখবেন আর সেই প্রক্রিয়ার মধ্যে যেন আমরা শামিল হতে পারি, সে প্রয়াসেই কারাবন্দী ভাইদের লেখা প্রকাশ করা। আল্লাহ তা'আলা হক্কের জবান পছন্দ করেন, যালিম চায় গলা টিপে সে জবান রুদ্ধ করে দিতে, আর তাই আমরা চাই সে কথাগুলো প্রকাশ করে দিতে। তাই সমসাময়িক কিছু কারাবন্দী ভাইদের অনুদিত লেখার সংকলন এই বই। এ বইয়ের প্রায় সব লেখাই আমাদের ভাইরা লিখেছেন কারাগারে বসে, ইনশা আল্লাহ, লেখাগুলো ঝর্ণা হয়ে আমাদের শুষ্ক হৃদয়ে প্রাণের সঞ্চার ঘটাবে, আমাদের ঈমানের গাছগুলোকে সতেজ করে তুলবে এবং আমাদেরকে এই উপলব্ধি করাতে সক্ষম হবে যে, আমরা মুক্ত হয়েও কতটা বন্দী, আর কারাগারে আমাদের ভাই-বোনেরা বন্দী হয়েও কতটা স্বাধীন!

এই কাজটি সম্পন্ন করার একচ্ছত্র দায়ভার থেকে মুক্তি চেয়ে নেওয়া আমার একান্তই দায়িত্ব। এ কাজটি শেষ করা হয়তো সম্ভবই হতো না, যদি না আল্লাহর একগুচ্ছ বান্দা একনিষ্ঠভাবে এই কাজে নিজেকে ঢেলে দিত। আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ এই কাজকে গ্রহণ করে নেবেন এবং পাঠকবৃন্দ যেন এই কাজের দ্বারা উপকৃত হতে পারেন, সেই তৌফিক্ব ঢেলে দেবেন, এই কামনা করি।

ওয়াসসালাম
জিম তানভীর
০৮ শা'বান, ১৪৩৫ হিজরি।

তারিক মেহান্না

তারিক মেহান্না

তারিক মেহান্না একজন ৩১ বছর বয়স্ক মুসলিম দা'ঈ, পেশায় ফার্মাসিস্ট। তিনি আমেরিকায় পড়াশোনা করেছেন এবং সেখানে মুসলিমদের মাঝে অত্যন্ত সম্মানিত এবং পছন্দনীয় একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি সেখানে দীর্ঘদিন জুমু'আর খুতবা দেওয়ার পাশাপাশি তরুণদের সাথে হালাক্বাহ ও দা'ওয়াতের কাজ করেছেন। আমেরিকার নিষ্ঠুর আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার এবং মুসলিম বন্দীদের অধিকার রক্ষায় তিনি ছিলেন এক নিবেদিত কণ্ঠস্বর। তিনি শুধু দিয়েই গেছেন, কিছুই নেননি। যারা তাকে চেনে তাদের ভাষায় তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, আন্তরিক, স্পষ্টভাষী এবং আপসহীন এক ব্যক্তিত্ব।

একজন সচেতন রাজনৈতিক স্পষ্টবাদী ব্যক্তি হওয়ায় দীর্ঘদিন ধরে এফবিআই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল এবং তাকে নানাভাবে হয়রানি করে আসছিল। তারা গুপ্তচর হওয়ার প্রস্তাব দিয়ে ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দাঁড়া করে এবং তাকে একাধিকবার গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীতে এক প্রহসনমূলক বিচারে ২০১২ সালের ১২ এপ্রিল তার ১৭ বছরের কারাদণ্ড হয়। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনইসের ম্যারিয়ন শহরে কমিউনিকেশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিটে সাজা ভোগ করছেন।

তারিক মেহান্নার জবানবন্দিতে তার 'সন্ত্রাসী' হয়ে ওঠার গল্প

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ঠিক চার বছর আগের এই দিনে আমি স্থানীয় হাসপাতালে আমার শিফটিং ডিউটি শেষ করে গাড়ির দিকে হেঁটে যাচ্ছিলাম। তখন দুই ফেডারেল এজেন্ট (FBI) আমার পথরোধ করে। তারা আমাকে দুটি প্রস্তাবের মাঝে একটি বেছে নিতে বলে। একটি সহজ, অপরটি কঠিন। তাদের ভাষায় "সহজ" প্রস্তাবটি ছিল সরকারের চর অর্থাৎ এজেন্ট হিসেবে কাজ করার। সেটি করলে আমাকে কখনও আদালত বা কারাগারের ত্রিসীমানায়ও যেতে হবে না। আর কঠিন প্রস্তাবটির বাস্তব রূপ আজ আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন। আমি কঠিন প্রস্তাবটিই বেছে নিয়েছি এবং তাই, গত চার বছরের অধিকাংশ সময় ধরে আমি আলমারির খোপের মতো ছোট্ট একটা কক্ষে দিনের ২৩ ঘন্টাই নিঃসঙ্গ অবস্থায় বন্দী হয়ে কাটিয়েছি। আমাকে এতদিন আটকে রাখতে এবং বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে এফবিআই ও তাদের আইনজীবীরা কঠিন পরিশ্রম করেছে। সরকার সাধারণ মানুষের পকেটের ট্যাক্সের লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যয় করেছে। শেষমেশ আজ আমাকে আপনাদের সামনে হাজির করা হয়েছে যেন আমাকে আরো দীর্ঘদিন কারাভোগের সাজা দেওয়া যায়।

রায় ঘোষণার এই দিনটিকে সামনে রেখে অনেকেই আমাকে অনেক পরামর্শ দিয়েছে। আপনাদের সামনে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কী বললে আমার উপকার হবে, আমার কী কথা বলা উচিত ইত্যাদি নিয়ে অনেকেই পরামর্শ দিয়েছেন। অনেকেই বলেছেন আমার ক্ষমা চেয়ে আত্মসমর্পণ করা উচিত যাতে করে লঘু শাস্তি হয়। অনেকে বলেছেন ক্ষমা চাই বা না-চাই, আমার কপালে কঠিন শাস্তিই জুটবে। কিন্তু সেসব পরামর্শ উপেক্ষা করে আমি আজকে শুধু নিজেকে নিয়ে কয়েক মিনিট কথা বলতে চাই।

যখন আমি আমেরিকান সরকারের বেতনপুষ্ট গুপ্তচর হওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম, তখন সরকার আমাকে আটক করল মুজাহিদীনদের সাহায্য করার "অপরাধে"। এই মুজাহিদীনরা মুসলিম বিশ্বের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে লড়ছে। মিডিয়ার ভাষায় এরা হচ্ছে "সন্ত্রাসী" বা "টেররিস্ট"। আমি কোনো মুসলিম দেশে জন্মগ্রহণ করিনি। এই আমেরিকাতেই আমার জন্ম আর বেড়ে ওঠা। আর এ

কারণেই অনেক মানুষ আমার উপর রীতিমতো ক্ষেপে আছে! তাদের কথা হলো, “কীভাবে এই লোকটা একজন আমেরিকান হয়ে “সন্ত্রাসী”দের পক্ষে অবস্থান নিতে পারলো! কীভাবে ওদের বিশ্বাসে বিশ্বাসী হলো!” মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস তার পারিপার্শ্বিকতার আদলে গড়ে ওঠে এবং আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আর তাই আমি বলছি, আমার আমেরিকা বিরোধীতার পেছনে স্বয়ং আমেরিকাই দায়ী।

ছয় বছর বয়স থেকে, আমি কমিক বইয়ের একটা বিশাল সংগ্রহ গড়ে তুলতে শুরু করি। ব্যাটম্যানের চরিত্রটি আমার মনে একটা ধারণা খুব স্পষ্টভাবে গেঁথে দেয়। আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয় বিশ্বের চিরন্তন বাস্তবতার সাথে আর তা হলো: গল্পের চরিত্রগুলোর মতো এই দুনিয়াতেও অত্যাচারী যালিম আছে, আছে নির্যাতিত ও মজলুম, এবং তাদের মাঝে আছে এমন কিছু মানুষ যারা নিপীড়িত, শোষিত মানুষের পক্ষে অবস্থান নেয়। এই বাস্তবতা আমাকে এতটাই আন্দোলিত করেছিল যে, আমার পুরো শৈশব জুড়ে আমি যেসব বইয়েই এ ধরনের বাস্তবতা খুঁজে পেতাম সেগুলো সাগ্রহে পড়ে ফেলতাম। আংকেল টম’স কেবিন, ম্যালকম এক্স এর আত্মজীবনী প্রভৃতি বইগুলো আমার মাঝে সেই ধারণাটিকেই সুদৃঢ় করে তোলে। এমনকি ‘দ্য ক্যাচার ইন দ্য রাই’(The Catcher in the Rye) বইটিতেও আমি এই ধরনের নৈতিকতার ছাপ খুঁজে পাই।

হাইস্কুলে উঠার পর আমি সত্যিকার ইতিহাস ক্লাস করা শুরু করি। আমি অবাক হয়ে দেখলাম সেই ব্যাটম্যানের কমিকের মতোই তো লাগছে সবকিছু! আমি আবিষ্কার করলাম শোষক-শোষিতের এই ঘটনাবলি উপন্যাসের সীমানা পেরিয়ে আসলে আরো অনেক বেশি বাস্তব। আমি নেটিভ আমেরিকানদের (আমেরিকার আদি অধিবাসী) ইতিহাস পড়লাম এবং জানতে পারলাম বহিরাগত ইউরোপিয়ানদের হাতে তাদের কী করুণ দশা হয়েছিল। আবার এই ইউরোপ থেকে আগত লোকদের বংশধরেরা কীভাবে রাজা জর্জ (৩য়) এর হাতে শোষিত হয়েছিল। আমি পল রিভিয়ার, টম পেইনদের সম্পর্কে জানলাম, জানলাম কীভাবে আমেরিকানরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব করেছিল। আজকে সেটাকেই আমরা আমেরিকান রেভ্যুলেশন ওয়ার হিসেবে উদযাপন করি।

ছোটবেলায় শিক্ষাসফরে আমরা এই বিপ্লবের যুদ্ধক্ষেত্রগুলো দেখতে বের হতাম। এই আদালতের অদূরেই তেমন কিছু যুদ্ধক্ষেত্র রয়েছে। আমি হ্যারিয়েট টাবম্যান, ন্যাট টার্নার, জন ব্রাউনদের সম্পর্কে পড়াশোনা করলাম। তারা ছিলেন দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের অগ্রপথিক। আমি ধীরে ধীরে পড়তে লাগলাম ইমা

গোল্ডম্যান, ইউজিন ডেবস এবং লেবার ইউনিয়নের সংগ্রামের কথা। জানতে পারলাম সমাজের খেটে খাওয়া মানুষ, গরীব লোকদের দুঃখের ইতিহাস। আমি আরও জানলাম অ্যানা ফ্রাংকের কাহিনি, নাৎসিদের বর্বরতার কথা, কীভাবে তারা সংখ্যালঘু মানুষদের হত্যা করেছে এবং বিরোধী পক্ষকে কারারুদ্ধ করেছে। জানলাম রোজা পার্ক, ম্যালকম এক্স, মার্টিন লুথার কিং প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের মানবাধিকারের জন্য সংগ্রামের গল্প। হো চি মিন সম্পর্কে পড়াশোনা করতে গিয়ে জানলাম কীভাবে ভিয়েতনামবাসীকে নিজেদের স্বাধীনতাকে বাঁচিয়ে রাখতে যুগ যুগ ধরে একের পর এক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে। আরো জেনেছিলাম নেলসন ম্যান্ডেলা আর তৎকালীন বর্ণবাদের বিরুদ্ধে তার সংগ্রাম সম্পর্কে।

এ সব ইতিহাসই যেন আমার ছয় বছর বয়সে শেখা কমিক বইয়ের কাহিনির পুনরাবৃত্তি। যালিম এবং মযলুমের মধ্যকার এ দ্বন্দ্ব চিরন্তন দ্বন্দ্ব। যখনই এসব গল্প পড়তাম, সবসময়ই আমি নিজেকে শোষিত মানুষের পক্ষে অনুভব করেছি। মনের অজান্তে আমি শোষিতদের পক্ষে রুখে দাঁড়ানো মানুষগুলোকে সম্মান ও সমর্থন করতে শুরু করেছি, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে। আমি আমার ক্লাস নোটগুলোকে কখনই অযত্নে ফেলে দিতাম না। আমার বেডরুমের আলমারিতে সেই ক্লাসনোটগুলো এখনও দিব্যি সাজানো আছে।

কিন্তু ইতিহাসের মহানায়কদের একজন যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছেন। তিনি ম্যালকম এক্স। তার অনেক কিছুই আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু আমি সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি তার পরিবর্তন দেখে। ম্যালকম এক্সকে নিয়ে নির্মিত স্পাইক লি এর "এক্স" চলচ্চিত্রটা আপনারা দেখেছেন কি না জানি না। এটি প্রায় সাড়ে তিন ঘন্টার একটি চলচ্চিত্র, যেখানে দেখা যায় শুরুর দিকটাতে যে ম্যালকম এক্স ছিলেন একজন অশিক্ষিত অপরাধী, শেষের দিকটাতে সেই ম্যালকমই পরিণত হন একজন স্বামী, একজন পিতা, গণমানুষের রক্ষাকর্তা, একজন বাগ্মী নেতা এবং হজ্জ পালনকারী একজন নিয়মানুবর্তী মুসলিম ব্যক্তিতে। সবশেষে তিনি শহীদ হন।

ম্যালকমের জীবন আমাকে একটি মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছে।

আর তা হলো ইসলামটা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোনো বিষয় নয়। জন্মসূত্রে শুধুমাত্র মুসলিম পরিবারে জন্মালেই কেউ মুসলিম হতে পারে না। এটা কোনো সংস্কৃতি বা নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনাচরণ নয়। বরং এটি একটি জীবনব্যবস্থা,

এটি একটি জীবনবোধ। আর এটা গ্রহণ করার জন্যে কে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে বা কী পরিবেশে বেড়ে উঠেছে এগুলো কোনো ব্যাপার নয়। এ বিষয়টা আমাকে ইসলাম নিয়ে আরো গভীরভাবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করে। আমি তখন কেবল কিশোর। কিন্তু ইসলাম আমাকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিলো, যে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বড় বড় বিজ্ঞানীরা খেই হারিয়ে ফেলেছেন। যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পাওয়ার ব্যর্থতা অনেক ধনী আর বিখ্যাত মানুষদের বিষাদ আর আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে, "কী আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য?", "এই মহাবিশ্বে আমরা কেন, কীসের আশায় বেঁচে আছি?" – ইসলাম আমাকে কেবল জীবনের উদ্দেশ্য জানিয়ে ক্ষান্ত হলো না, বরং দুনিয়ার বুকে কীভাবে বেঁচে থাকতে হবে তাও শিখিয়ে দিল।

ইসলামে খ্রিষ্টধর্মের মতো যাজকতন্ত্রের জটিলতা নেই যে, ধর্মীয় ব্যাপারে বিশেষ কিছু পুরোহিতের দারস্থ হতে হয়। তাই আমি নিজেই কুরআন এবং রাসূল ﷺ এর শিক্ষাগুলো ঘাঁটতে আরম্ভ করলাম। এই দুনিয়া, এই দুনিয়ায় আমার জীবনে, আমার চারপাশের মানুষের জীবনে আর সমগ্র বিশ্বকে ইসলামের কী দেওয়ার আছে – তা জানার আগ্রহ থেকে আমি শুরু করলাম জ্ঞানার্জনের যাত্রা। আমি যতই ইসলাম সম্পর্কে জানতে লাগলাম ততোই ইসলামকে বহুমূল্যবান সোনার টুকরোর মতো মূল্যবান মনে করতে লাগলাম। এগুলো উঠতি বয়সের কথা, কিন্তু আজকেও আমি শত চাপ আর ঝড়ঝঞ্ঝা উপেক্ষা করে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে চাই, আমি একজন গর্বিত মুসলিম।

আমার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু একসময় নিবদ্ধ হলো বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মুসলিমদের জীবনে। আমি যেদিকেই তাকাতাম, সেদিকেই দেখতাম বড় বড় পরাশক্তিগুলো আমার ভালোবাসাকে ধ্বংস করতে তৎপর। আমি দেখেছি আফগানিস্তানের মুসলিমদের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়ন কী করেছে। আমি দেখেছি বসনিয়ার মুসলিমদের উপর সার্বিয়ানদের অত্যাচার, দেখেছি চেচনিয়ার মুসলিমদের উপর রাশিয়ার অনাচার। আমি দেখলাম লেবাননের মুসলিমদের সাথে ইসরাঈল কী অন্যায় করেছে এবং আমেরিকার পূর্ণ সমর্থন এবং সহযোগিতায় যা সে আজও চালিয়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনে।

আমার এও অজানা ছিল না যে আমেরিকা নিজেই মুসলিমদের সাথে কী ভয়ানক অন্যায় করে আসছে। আমি উপসাগরীয় যুদ্ধ সম্পর্কে জানলাম, জানলাম কীভাবে ইউরেনিয়াম বোমা ব্যবহার করে ইরাক জুড়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। সেই বোমার তেজস্ক্রিয়তায় মরণব্যাধি ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়েছিল

বহুগুণে। আমেরিকার নেতৃত্বে জাতিসংঘ কর্তৃক আরোপিত নিষেধাজ্ঞার কারণে ইরাকে খাদ্য, পানি এবং ঔষধপত্র প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। যার ফলাফল ছিল ইরাকে অন্তত ৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যু। আমার মনে আছে একটা ভিডিও ক্লিপ দেখেছিলাম, “60 Minutes” প্রোগ্রামে, সেখানে সাক্ষাৎকারে ম্যাডেলিন অলব্রাইট বলেছিলেন, “এটাই তাদের যথার্থ পাওনা!” আমি দেখলাম কীভাবে কিছু মানুষ এই নির্মম শিশু হত্যার ঘটনায় শান্ত থাকতে না পেরে এরোপ্লেন হাইজ্যাক করে ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার উড়িয়ে এর প্রতিশোধ নেয়।

এর পরবর্তী সময়ে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ আমেরিকা ইরাক আক্রমণ করে বসল। আবিষ্কার করলাম “Shock & Awe” (এক ধরনের আক্রমণাত্মক সামরিক কৌশল)এর পরিণতি। ইরাকের যন্ত্রণাক্লিষ্ট শিশুরা হাসপাতালের ওয়ার্ডে শুয়ে আছে, তাদের কপালে বিঁধে আছে মিসাইলের তীক্ষ্ণ শ্র্যাপনেল (shrapnel)। না, CNN এ এসবের কিছুই দেখায়নি। মেরিন সেনারা হাদীসা শহরে ২৪ জন ঘুমন্ত মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করে উড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের মধ্যে ছিল ৭৬ বছর বয়স্ক হুইলচেয়ারে বসা এক বৃদ্ধ, আরও ছিল বিছানাতে ঘুমন্ত নারী এবং শিশু।

আমি আরো জানলাম এক চৌদ্দ বছরের ইরাকি বালিকার কথা।

বোন আবীর-আল-জানাবি, তাকে পাঁচজন আমেরিকান সেনা গণধর্ষণ করে। তারপর তাকে ও তার পরিবারের সকলকে মাথায় গুলি করে হত্যা করে। পাষণ্ডরা তাদের মৃতদেহ আগুনে পুড়িয়ে দেয়। আমি আপনাদের একটা জিনিস মনে করিয়ে দিতে চাই। একজন মুসলিম নারী কখনও তার একটি চুল পর্যন্ত পরপুরুষের সামনে উন্মুক্ত করে না। অথচ কল্পনা করে দেখুন একটিবার, রক্ষণশীল পরিবারের এই ছোট্ট মেয়েটির কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে। পাশবিকভাবে তাকে যৌন নির্যাতন করছে, একজন-দুজন নয়, পাঁচ সৈনিক মিলে। এই আজও, আমি কারাগারে বসে পাকিস্তান, সোমালিয়া আর ইয়েমেনে আমেরিকার চলমান ড্রোন হামলার খবর শুনছি। এইতো গত মাসেই, শুনলাম ১৭ জন আফগান মুসলিমকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে এবং এরপর তাদের লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। এদের বেশিরভাগ ছিলেন মা এবং তাদের ছোট সন্তান।

এগুলো হয়তো আপনার কাছে নিছক পত্রিকার খবর বৈ কিছু নয় ...

কিন্তু এই আমি, এরই মাঝে শিখেছি, ইসলামের আনুগত্য আর ভ্রাতৃত্বের সংজ্ঞাটুকু। প্রতিটা মুসলিম নারী আমার বোন, আর প্রতিটা মুসলিম পুরুষ আমার

ভাই, আর এই আমরা একসাথে একটা বিশাল পরিবার যারা একে অপরকে সাহায্য করে যাব। অন্যভাবে বলতে গেলে, আমি আসলে আমার ভাইবোনদের উপর এমন নির্বিচার অত্যাচার দেখে চুপ বা "নিষ্ক্রিয়" থাকতে পারিনি। শোষিতের জন্য সহানুভূতি আমার সবসময়ই ছিল, কিন্তু আজ যেন ব্যাপারটা একদমই ব্যক্তিগত। যারা আমার ভাই-বোনদের হয়ে লড়ছে তাদের প্রতি আমার সম্মানও তাই অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসরিত।

আমি পল রিভিয়ারের কথা উল্লেখ করেছি। একদিন ব্রিটিশ হানাদাররা স্যাম এডামস ও জন হ্যানককে গ্রেফতার করতে এবং মিনিটম্যানদের অতর্কিত আক্রমণ করে তাদের অস্ত্র বাজেয়াপ্ত করতে লেক্সিনটনে আসছিল। আগাম এই খবর পেয়ে সেদিন পল রিভিয়ার ঘোড়ায় চেপে মধ্যরাতে লোকদেরকে সতর্ক করতে বেরিয়ে যান। ফলে কনকর্ডে গিয়ে ব্রিটিশ সেনারা মুখোমুখি হয় ভিন্ন দৃশ্যের। মিনিটম্যানরা ব্রিটিশ অভিযানের আগাম বার্তা লাভ করে পূর্বপ্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে, অস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে অপেক্ষা করছে যুদ্ধের জন্য। ব্রিটিশরা সে যুদ্ধে পরাজিত হয়, আর এ বিজয়ের হাত ধরে আসে আমেরিকান রেভ্যুলেশন। জেনে অবাক হবেন মিনিটম্যানরা সেদিন যা করেছিল আমি সেই ঘটনাকে একটি আরবি শব্দ দিয়ে অতি সহজে ব্যাখ্যা করে দেব। তা হলো: জিহাদ। আর এটা নিয়েই আমার আজকের এই বিচার।

আমার বিরুদ্ধে হয়তো আপনারা জঙ্গিদের বক্তব্য এবং ভিডিও অনুবাদের অভিযোগ শুনেছেন। শুনেছেন শিশুতোষ এবং হাস্যকর অভিযোগ, "ওহ! সে তো ঐ অনুচ্ছেদের অনুবাদ করেছে!", "ওহ! সে তো এই বাক্যটা এডিট করেছে" – এর সবই একটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খেয়েছে, তা হলো: ব্রিটিশরা আমেরিকার বিরুদ্ধে যা করেছিল ঠিক একই কাজ আমেরিকা মুসলিমদের বিরুদ্ধে করায় যেসব মুসলিমরা রুখে দাঁড়িয়েছে তাদের সমর্থন করা। আমার ব্যাপারে আনীত অভিযোগগুলোর ব্যাপারে এটা জলের মতো পরিষ্কার, আমি কখনই শপিং মলে আমেরিকান হত্যার পরিকল্পনা করিনি। এগুলো একেবারেই পাতানো অভিযোগ। সরকারদলীয় সাক্ষীদের সাক্ষ্যগুলোই এমন অভিযোগের বিপরীতে কথা বলে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে অভিজ্ঞ আইনজ্ঞরা এই ব্যাপারে আমার লেখা ব্যবচ্ছেদ করে তাদের অভিযোগের পক্ষে কিছুই বের করতে পারেননি। পরে, আমি যখন মুক্ত হলাম, তখন সরকার আমার কাছে ছদ্মবেশী চর প্রেরণ করে একটি "সন্ত্রাস পরিকল্পনা"র সাথে যুক্ত হওয়ার প্রস্তাব পাঠায়। সাজানো নাটক তৈরি করে সরকার আমাকে এর মধ্যে জড়ানোর ষড়যন্ত্র করেছিল। কিন্তু আমি তাতে সাড়া দেইনি। রহস্যজনকভাবে, বিচারকরা এই ঘটনাটি যেন শোনেইনি।

যাই হোক, আমার বিরুদ্ধে যে বিচার কার্যক্রম চলছে তা মুসলিম দ্বারা আমেরিকার নাগরিক হত্যা নিয়ে নয়, বরং তা আমেরিকান কর্তৃক মুসলিম হত্যার বিরোধিতা করার কারণে। আমি বিশ্বাস করি, মুসলিমদেরকে অবশ্যই হানাদারদের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে হবে, হোক সে হানাদাররা সোভিয়েত বা আমেরিকা কিংবা মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত। আমি এটাই বিশ্বাস করি, আমি সবসময় এমনটাই বিশ্বাস করতাম এবং সবসময় এমনটাই বিশ্বাস করে যাব (ইনশা আল্লাহ)। এটা সন্ত্রাসবাদ নয়, এটা চরমপন্থা নয়। এটা নিছক আত্মরক্ষা, নিজের মাটিকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা।

আমি আমার আইনজীবীদের এই মতের সাথে দ্বিমত পোষণ করি যখন তারা বলে, "সবাই তোমার এই বিশ্বাসের সাথে একমত হবে এমনটা নয়"। আমি বলি, না, এটা যার-যার-তার-তার বিষয় নয়। যার সামান্য কাণ্ডজ্ঞান ও মানবতাবোধ আছে, আমার সাথে সে এই বিষয়ে একমত না হয়ে পারে না। কেউ যদি আপনার বাসায় ডাকাতি করতে আসে এবং আপনার পরিবার-পরিজনের ক্ষতি সাধন করে, কমনসেন্স বলে আপনার উচিত ডাকাতকে তাড়িয়ে দেওয়া। কিন্তু যখন সেই ভূমি হয় "মুসলিম ভূমি" আর আক্রমণকারী বাহিনী হয় "আমেরিকান সেনাবাহিনী", তখন কেন যেন সব নীতিনৈতিকতার মাপকাঠি উল্টে যায়! নিজেদের রক্ষা করা তখন "সন্ত্রাসবাদ";আকাশ আর সাগর পাড়ি দিয়ে আসা হানাদারদের বিরুদ্ধে নিজ দেশকে রক্ষা করতে যারা যুদ্ধ করে, তারা হয় "সন্ত্রাসী", তারা হয় খুনী, "আমেরিকান হত্যাকারী"।

আজ থেকে আড়াইশ বছর আগে এই রাস্তায় আমেরিকানরা ব্রিটিশ সৈন্যদের হাতে যেভাবে নিগৃহীত হয়েছিল, ঠিক একই বাস্তবতার শিকার আজ মুসলিমরা, তবে এবার আমেরিকান সৈন্যদের হাতে। একেই বলে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা। যখন সার্জেন্ট বেলস নিরীহ আফগানদেরকে হত্যা করেছিল তখন আমি দেখলাম সবাই কেবল তাকে নিয়ে ব্যস্ত, মিডিয়াতেও কেবল তার জীবনের উপর আলোকপাত করা হচ্ছে - তার পারিবারিক জীবন, তার মানসিক চাপ, তার বন্ধককৃত বাড়ি, তার PTSD নিয়ে বিস্তারিত খবর দেখানো হলো। পুরো ব্যাপারটায় তার জন্য এমনভাবে একটা সহানূভূতি তৈরি করা হয়, যেন সে-ই ভুক্তভোগী! যাদেরকে সে নির্বিচারে হত্যা কছে, তাদের প্রতি কোনো সহানূভূতিই দেখানো হয়নি! যেন এটা কোনো ব্যাপারই নয়। যেন আফগানরা মানুষ নয়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, এই মানসিকতা আমাদের সবাইকে গ্রাস করেছে। এমনকি আমার আইনজীবীদের তাদের বদ্ধ চেতনার খোলস থেকে বের করে এনে,

“মুসলিমদেরও আত্মরক্ষার অধিকার আছে”- এই সামান্য ব্যাপারটা আলোচনা করে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে আমার পাক্কা দু’বছর সময় লেগেছে এবং শেষ পর্যন্ত তারা নিতান্ত অনিচ্ছার সাথে আমার সাথে একমত হয়েছে। দু’বছর! এই ঘাঘু আইনজীবীদের কাজ আমাকে রক্ষা করা। মুসলিমদের আত্মরক্ষাকে তাদের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে এই আইনজীবীদেরই সময় লেগেছে দুই বছর! আর সেখানে আমাকে যেকোনো একজন বিচারকের সামনে দাঁড় করিয়ে যখন বলা হয়, “এই বিচারক নিরপেক্ষ, তোমার সমমনা”, আমি তখন বলি, “রাখুন আপনার নিরপেক্ষতা”। আমেরিকাকে আজ যে মানসিকতা গ্রাস করে নিয়েছে তাতে আমার মতের পক্ষে কোনো উকিল বা বিচারক খুঁজে পাওয়া যাবে না, যারা আমার সহজ কথাগুলো সহজভাবে বুঝবে। তাই সরকারও আমার উপর মামলা ঝুলিয়ে রেখেছে। এটা করা যে তাদের খুব প্রয়োজন ছিল তা নয়। কিন্তু আসলে তারা দেখালো যে তারা চাইলেই এমনটা করতে পারে।

ইতিহাসের ক্লাস থেকে আমি আরো একটা জিনিস শিখেছি: আমেরিকা হলো সেই দেশ যারা ঐতিহাসিকভাবে সংখ্যালঘুদের ব্যাপারে সবচেয়ে বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল। তারা নিজেদের অন্যায়গুলোকে আইনগত বৈধতা দিত। আবার পরবর্তীতে তারাই অবাক হয়ে ভাবত, “আরে, আমরা এমন ছিলাম!” দাসত্ব, বৈষম্যমূলক জিম ক্রো আইন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানীদের বন্দীশিবিরে অন্তরীণ রাখা- এই সবগুলো কাজকেই আমেরিকানরা স্বাভাবিকভাবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং সুপ্রীম কোর্টও এই বৈষম্যমূলক আইনগুলোকে বছরের পর বছর লালন করেছে। কিন্তু সময়ের সাথে আমেরিকা তার চেহারা পরিবর্তন করেছে। তারা নিজেদের অতীতের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়, “আরে, আমরা বুঝি এমন ছিলাম!” নেলসন ম্যান্ডেলার কথা ধরুন, তাকে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার সন্ত্রাসী গণ্য করত। তাকে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তিতে দণ্ডিত করা হয়েছিল। কিন্তু সময় গড়িয়েছে, বদলেছে বিশ্বের চেহারা, মানুষ জানতে পেরেছে আসলে সরকারই ছিল সন্ত্রাসী, ম্যান্ডেলা নয়। ম্যান্ডেলা মুক্তি পেলেন, পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি হলেন। তাই আসলে সবকিছুই আপেক্ষিক। যে যেভাবে চায়, সেভাবেই “সন্ত্রাস” এবং “সন্ত্রাসী”দের সংজ্ঞায়িত করে। এই সংজ্ঞাগুলো নির্ভর করে স্থান-কাল-পাত্র আর সেই সময়ের ক্ষমতাধর পরাশক্তিগুলোর উপরে, কেননা তারাই নিজেদের মতো করে এসব সংজ্ঞা বানায়।

হ্যাঁ, আপনার চোখে আমি আজ একজন সন্ত্রাসী। আমি এখন জেলখানার কমলা রঙের একটা পোশাক পরে দাঁড়িয়ে আছি। এই পোশাকেই হয়তো আমি সারাটি জীবন কাটিয়ে দেব। এটাই আপনাদের কাছে যুক্তিযুক্ত। কিন্তু ইতিহাসের

পুনরাবৃত্তি ঘটে। এমন একটা দিন আসবে, যেদিন এই আমেরিকা বদলে যাবে। বদলে যাবে এর মানুষগুলো। তারা বুঝবে আজকের এই দিনটিতে আসলে কী প্রহসন হয়েছিল। তারা আবিষ্কার করবে কীভাবে হাজার হাজার মুসলিম খুন হয়েছিল, পঙ্গু হয়েছিল আমেরিকান সেনাবাহিনীর হাতে। কিন্তু "হত্যা এবং ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে" কারাগারে যেতে হচ্ছে এই আমাকেই। কারণ আমি সেইসব মুজাহিদীনদের সমর্থন করেছিলাম, যারা প্রকৃতপক্ষে 'হত্যা এবং ধ্বংসের ষড়যন্ত্র' থেকে মুসলিমদের রক্ষা করতে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। একদিন আমেরিকানরা দেখবে, আমাকে "সন্ত্রাসী" বানাতে সরকার কীভাবে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। যদি বোন আবীর আল জানাবিকে মৃত থেকে জীবিত করে ফিরিয়ে এনে আমেরিকানদের দ্বারা গণধর্ষণের সময় তাকে জিজ্ঞেস করতে পারতাম, "বল তো, সন্ত্রাসী কারা", আমি নিশ্চিত, সে আমার দিকে আঙ্গুল তাক করতো না।

সরকার বলছে সহিংসতায় আমার মন নাকি আচ্ছন্ন হয়ে আছে! আমেরিকানদের হত্যা করার জন্য আমি নাকি পাগল হয়ে আছি! একজন মুসলিম হিসাবে বর্তমান সময়ে এর চেয়ে হাস্যকর মিথ্যা আমি কল্পনা করতে পারছি না।

তারিক মেহান্না
১২ এপ্রিল, ২০১২

কখনও ঝরে যেও না ...

মু'মিন ব্যক্তি হচ্ছে বৃক্ষের মতো; দমকা হাওয়ার সাথে সর্বদা যুদ্ধে লিপ্ত। এই প্রবল বাতাসের ঝাপটার মাঝে বেঁচে থাকতে হলে সে বৃক্ষটির কিছু গুণ থাকা চাই। যেমন, সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে হলে গাছটির বীজ অবশ্যই উর্বর মাটিতে বপন করতে হবে। কুরআনে ঠিক এ কথাটাই বলা আছে:

> "মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল এবং তাঁর সহচরগণ ... তাওরাতে এবং ইঞ্জিলে তাদের বর্ণনা এরূপ যেমন একটি চারা গাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে, চাষীকে আনন্দে অভিভূত করে, যেন আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করেন..." [সূরা আল-ফাতহ, ৪৮: ২৯]

তাওরাতের নিম্নোক্ত বিবরণটির কথা এখানে বলা হয়েছে:

কৃষক তার বীজ বুনতে বের হলো। বপনের সময় কিছু বীজ পথের পাশে পড়ল। সেগুলোর কিছু পায়ের নিচে পিষ্ট হয় আর কিছু পাখিরা খেয়ে ফেলে। কিছু বীজ পড়ল পাথুরে মাটিতে। আর্দ্রতার অভাবে সেগুলো বড় হতে হতেই শুকিয়ে গেলো। কিছু বীজ কাঁটার মাঝে পড়ল। ঐ বীজ থেকে জন্ম নেওয়া গাছের সাথে সাথে কাঁটাগুলোও বেড়ে উঠতে থাকে। একসময় কাঁটাগুলোই গাছগুলোকে মেরে ফেলে। বাকি বীজগুলো পড়ল উর্বর মাটিতে। সেগুলো বেড়ে উঠল মাথা উঁচু করে। আর বেড়ে উঠে শতগুণ বেশী শস্য উৎপাদন করল।

... এর তুলনা হলো এই: বীজগুলো হলো সৃষ্টিকর্তার বাণী। কিছু মানুষ সেই বাণী শুনার পর শয়তানের প্ররোচনায় সেগুলো অন্তর থেকে মুছে ফেলে। ফলে এরা ঈমান আনে না। তাই পরিশেষে এরা রক্ষা পাবে না। এদের তুলনা হচ্ছে পথের পাশের সেই অবহেলিত জমি।

কিছু লোক শুনার সময় আগ্রহের সাথে শুনে কিন্তু এদের আগ্রহে গভীরতা নেই। এরা কিছু সময়ের জন্য বিশ্বাস করে কিন্তু প্রলোভন দেখালেই বিচ্যুত হয়ে পড়ে। এই শ্রেণির লোকের উদাহরণ হলো সেই পাথুরে মাটি যা আর্দ্রতার অভাবে গাছগুলোকে বেড়ে উঠতে দিতে পারে না। কাঁটাযুক্ত জমি হচ্ছে তাদের উপমা যারা সৃষ্টিকর্তার বাণী শুনেছে কিন্তু পথ চলতে চলতে একসময় ভয় আর দুনিয়ার

মোহে আটকে গিয়ে পূর্ণতা লাভ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু কিছু লোক সৎ এবং শুদ্ধ হৃদয় নিয়ে সৃষ্টিকর্তার বাণী শুনে তা আঁকড়ে ধরেছিল এবং ধৈর্যের সাথে পরিশেষে ফল লাভ করেছিল। এদের উদাহরণ হচ্ছে সেই উর্বর মাটি যা বীজকে বুকে নিয়ে মহীরুহের জন্ম দেয়। [লুক ৮: ৫-১৫]

অর্থাৎ, হৃদয়কে এমন উর্বর মাটির সাথে তুলনা করা হয়েছে যেখানে বীজ বপন করা হয়। ইমাম ইবন আল-ক্বাইয়্যিম ﵀ আল-ফাওয়াইদ গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৭০) এভাবেই বলেছেন,

> *"সবার হৃদয়ের স্বাভাবিক অবস্থাই হচ্ছে উর্বর, এতে যা বপন করা হয় তাই সহজে বেড়ে উঠে। যদি ঈমান এবং আল্লাহভীরুতা বা তাক্বওয়ার চারা এতে রোপণ করা হয়, তবে তা এমন সুমিষ্ট ফল দান করবে যা হবে চিরন্তন। আর যদি অজ্ঞতা এবং কামনা-বাসনার চারা রোপণ করা হয় তাহলে তার ফল হবে তিক্ত এবং কটু।"*

তাই তুমি যখন তোমার অন্তরকে ঈমানের বীজের জন্য উর্বর করে তুলবে, তখন সেই গাছটি সুন্দর ভাবে বেড়ে উঠবে এবং মিষ্টি ফল ধারণ করবে। হৃদয়কে উর্বর করার উপায়গুলো সামনে আলোচনা করা হবে।

যখন তোমার হৃদয়ে ঈমানের সুদৃঢ় বৃক্ষ গড়ে উঠবে, তখন একটা দমকা হাওয়া তোমার দিকে ধেয়ে আসবে। কারণ উপরে বর্ণিত আয়াত অনুযায়ী, আল্লাহ বলছেন শক্ত গাছটি 'কাফেরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি করে'। একজন দৃঢ় মুসলিমের মতো আর কোনো কিছুই এই বাতাসকে এতটা ক্ষেপিয়ে তোলে না। আর এটাই চিরন্তন বাস্তবতা। যখন ফির'আউন মুসা ﵇ এবং তাঁর অনুসারীদের পিছনে মিশরের মরুভূমিতে ধাওয়া করছিল তখন সে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ করে:

> "নিশ্চয়ই এরা (বনী-ইসরাঈলরা) ক্ষুদ্র একটি দল। এবং তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে।" [সূরা শুআরা, ২৬: ৫৪-৫৫]

এই দমকা হাওয়া তোমাকে সমূলে উচ্ছেদ করে ফেলে দিতে চাইবে। তুমি হয়তো চারিদিকে তাকিয়ে অন্য কিছু গাছকে সহজেই পড়ে যেতে দেখবে। কেউ হয়তো বাতাসের ধাক্কায় সমূলে উৎপাটিত হয়ে যাবে। এরা হলো মুনাফিক্বেরা। এদের দুর্বল মূল সহজেই প্রকাশ হয়ে পড়ে:

> “এবং নোংরা বাক্যের উদাহরণ হলো নোংরা বৃক্ষ। একে মাটির উপর থেকে উপড়ে নেওয়া হয়েছে। এর কোনো স্থিতি নেই।” [সূরা ইবরাহিম, ১৪: ২৬]

রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ বিশেষভাবে মুনাফিক্বকে এমন গাছের সাথে তুলনা করেছেন যেটা বাতাসের সাথে সাথে নড়ে এবং কখনো বা পড়ে যায়। (দেখুন আল-লু’লু’ ওয়াল মারজান, হাদিস #১৭৯১)। সুতরাং তারা দলে দলে বাতাসের ধাক্কায় পড়ে যাক, তুমি তাদের মতো হয়ো না। বরং, তুমি তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর। আল্লাহকে ধন্যবাদ দাও যে, তিনি তোমাকে তাদের পরিণতি থেকে রক্ষা করেছেন এবং তারপর এগিয়ে যাও। তাদের জন্য ইসলাম ছিল একটা শখ মাত্র, এ সপ্তাহের আকর্ষণ!

যখন বাতাস বুঝতে পারবে যে, তোমাকে এভাবে মাটি থেকে সরাসরি তুলে ফেলা সম্ভব নয়, তখন সে আরো সূক্ষ্ম পন্থা অবলম্বন করবে: সে চেষ্টা করবে তোমার পাতাগুলো কৌশলে ঝরিয়ে দিতে। কিন্তু সে তোমাকে সবগুলো পাতা একসাথে ঝরাতে বলবে না। কারণ সেটা তো তার দুরভিসন্ধি প্রকাশ করে দেবে। বরং তখন সেই বাতাস মৃদুভাবে বইবে যাতে করে তোমার একটা পাতা ঝরাতে পারে, তারপর আরেকটা, তারপর আরেকটা - যতক্ষণ না তুমি পাতাহীন বৃক্ষে পরিণত হও। উস্তাদ সাইয়্যিদ কুতুব رحمه الله এটা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন:

> *“... কোনো আদর্শের পক্ষে অবস্থান নেওয়া গোষ্ঠীর প্রতি শাসকবর্গের আচরণ এমন হয় যে, তারা সবসময় কূটকৌশলের মাধ্যমে সেই আদর্শিক গোষ্ঠীকে তাদের দৃঢ় অবস্থান থেকে শুধু সামান্য বিচ্যুত করতে চায়। তারা এর মাধ্যমে একটা সমঝোতামূলক সমাধানে আসতে চায়। কিছু জাগতিক পুরস্কারের বিনিময়ে তারা তাদেরকে বোকা বানাতে চেষ্টা করে। এমন অনেকেই রয়েছে যারা ভাবে যে তারা তাদের আদর্শের জন্য লড়ছে কিন্তু বস্তুত তাদেরকে সমঝোতা আর আপসের ছদ্মবেশে তাদের আদর্শ থেকেই বিচ্যুত করে দেওয়া হয়েছে। কারণ তারা আদর্শকে জলাঞ্জলি দেওয়া এই সমঝোতাগুলোকে বড় করে দেখে না। তাই বিরোধীপক্ষও তাদেরকে প্রকাশ্যভাবে আদর্শ ত্যাগ করতে বলে না। বরং এদিকে সেদিকে হালকা পরিবর্তন করতে অনুরোধ করে যাতে উভয়পক্ষ মাঝখানে মিলিত হতে পারে।*

যে মানুষটি আদর্শের পক্ষে লড়ছে শয়তান তাঁকে ধোঁকা দিতে বলে, কর্তৃপক্ষের সাথে সামান্য সমঝোতার মাধ্যমে তো তুমি তোমার আদর্শকে আরো সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু পথের শুরুতে যে বিচ্যুতি খুব সামান্য হয়, পথের শেষে তা-ই বিশাল হয়ে দেখা দেয়। আদর্শের পতাকাবাহীরা আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র কোনো বিষয়ে আপস করতে রাজি হওয়ার পর আসলে সেখানেই থেমে যেতে পারে না। কারণ এরপর যখনই এক পা পিছিয়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হবে তখনি সেটা ঠেকাতে তার সমঝোতায় আসার ইচ্ছা আরো বৃদ্ধি পাবে। তাই কর্তৃপক্ষ এই আদর্শবাদীদেরকে অতি সন্তর্পণে এবং ক্রমান্বয়ে তাদের আদর্শ থেকে টলাতে থাকে...”

তাই এই ফাঁদে পা দিবে না। বাতাসের মুখে একটা পাতাকেও ঝরতে দেবে না। যেভাবে রসূলুল্লাহ ﷺ মুনাফিক্বকে বাতাসের সাথে নুয়ে পড়া গাছের তুলনা দিয়েছেন তেমনি ভাবে মু'মিনকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করেছেন। কারণ খেজুর গাছের পাতা কখনো ঝরে না। (দেখুন আল-লু'লু' ওয়াল মারজান, হাদিস #১৭৯২) বাতাস যতই তীব্র হোক না কেন তার সামনে মুসলিম শুধু দাঁড়িয়েই থাকে না, বরং সব পাতা মেলে মাথা উঁচু করে থাকে। বাতাস যত তীব্র হবে তোমার পাতাগুলোকে আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরবে। আর এ জন্যই তো তোমার বিরুদ্ধে বাতাসের এত ক্ষোভ !

“তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল” [সূরা বুরুজ, ৮৫: ৮]

কিন্তু এই বাতাস তার ক্ষোভের পেছনে ভিন্ন কারণ দাঁড় করিয়ে এই বাস্তবতাকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করবে। সে দাবী করবে এই রাগ আসলে তোমার বিরুদ্ধে নয়। এই রাগ তো কেবল উগ্রবাদ, জঙ্গিবাদ কিংবা অন্য কোনো কিছুর বিরুদ্ধে। কিন্তু সত্য কথাটা হচ্ছে যাদেরকে সে সমূলে তুলে ফেলতে পারে না, যাদেরকে তাদের আদর্শ থেকে এক বিন্দুও টলানো যায় না ঐসব মুসলিমদেরকে সে ভারি অপছন্দ করে। আর যখন গাছটা একটা পাতাও ত্যাগ করতে অস্বীকার করে তখন সেই বাতাস আরো রেগে যায়। আর যখন এই বাতাস রাগতে থাকবে, তখন আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করবেন:

“...এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়- তার প্রত্যেকটির

> পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না।" [সূরা আত-তওবাহ, ৯: ১২০]

তাই যখন প্রবল আক্রোশে বাতাস বইবে তখন ভয় পেও না। বরং তার চোখে চোখ রাখো আর:

> "...বল, তোমরা আক্রোশে মরতে থাক।" [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১১৯]

ঐ পাতাগুলো হচ্ছে আল্লাহর তরফ থেকে তোমার প্রতি আমানত। আল্লাহ তোমাকে এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ করতে দিয়েছেন। যদি তুমি তার খিয়ানত কর তবে তোমাকে এমন মানুষ দ্বারা পরিবর্তন করে দেওয়া হবে যারা তাদের আমানত রক্ষা করবে।

> "হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। ..." [সূরা আল-মা'ইদাহ, ৫: ৫৪]

এই আয়াতটি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে গাছ এবং পাতাগুলোর বর্ণনা দেয়। এটাকে বীজ এবং পাতায় বিশ্লেষণ করা যাক।

সম্পূর্ণ গাছটি হচ্ছে দ্বীন।

তোমার অন্তরে আল্লাহর জন্য ভালোবাসার বীজ থেকে এই গাছটি অংকুরিত হবে। আত-তুহফাহ আল ইরাক্বিয়াহ নামে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহর ﵀ একটি সুন্দর প্রবন্ধ রয়েছে। *মাজমু আল ফাতওয়া*র দশম খণ্ডের শুরুতে এটি পাওয়া যাবে। সেখানে তিনি এই আয়াতে উল্লেখিত ভালোবাসার কথা ব্যাখ্যা করছেন এইভাবে,

"আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের জন্য ভালোবাসা হচ্ছে ঈমানের সর্বোচ্চ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি এবং ঈমানের সর্বোচ্চ মূলনীতি। কার্যত এটিই দ্বীনের সকল আমলের মূল ভিত্তি... মুসা এবং ঈসা ﷺ এর বর্ণিত ভাষ্য অনুযায়ী, আমাদের পূর্ববর্তী দুটি জাতি, ইহুদি এবং খৃস্টানদের প্রতি রেখে যাওয়া সর্বোত্তম উপদেশ হচ্ছে হৃদয়, মন এবং সদিচ্ছা দ্বারা সর্বান্তকরণে আল্লাহকে ভালোবাসা। এটাই ইব্রাহীমের ﷺ দ্বীনের আক্বীদার সারকথা যা তাওরাত, ইঞ্জীল এবং ক্বুরআনের আইনের নির্যাস।"

আল্লাহর জন্য ভালোবাসাই হচ্ছে সেই বীজ যা থেকে প্রতিটি কাজ এবং বিশ্বাস - প্রতিটি পাতা এবং ফল- অংকুরিত হয় আর এজন্যই এই ভালোবাসাটাই এ আয়াতে সর্বপ্রথম উল্লেখ করা হয়েছে।

তারপর আমরা লাভ করব সেই বীজের প্রথম ফল, ওয়ালা' এবং বারা': 'মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে'। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ رحمه الله এ বিষয়ে বর্ণনা করেন,

"মানুষ যাকে ভালোবাসে তার ভালোবাসার মানুষকেও ভালোবাসে, সে যা ঘৃণা করে তাও ঘৃণা করে, তার সহযোগীদের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, তার শত্রুদের প্রতি শত্রুভাব পোষণ করে... তাই এই বিষয়ে তারা উভয়েই এক"

সহজ ভাষায় বললে, বাতাসের প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার এই পাতাটি ঝরিয়ে দেওয়া যাতে করে তোমার মনে শত্রু আর বন্ধুর মাঝে বিভাজন রেখাটা অস্পষ্ট হয়ে পড়ে। একবার যখন তুমি তোমার শত্রুকে বন্ধু ভাববে, তোমার শত্রুর কাজ তখনি সম্পন্ন হয়ে যাবে। তাই কখনো এই পাতাটি ঝরে যেতে দিবে না। কখনো না!

এর পরের পাতাটি হচ্ছে জিহাদ: "...তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে..." স্পষ্টতই এই পাতাটিকে বাতাস অন্যগুলোর চেয়ে বেশী ঘৃণা করে। কেন তা বোঝার জন্য এইডস এর কথা ভাবো। এটা শরীরকে মেরে ফেলার জন্য কী করে? এইডস কিন্তু সরাসরি শরীরকে আক্রমণ করে না বরং এটি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে অর্থাৎ শরীরের 'প্রতিরক্ষা বাহিনী'কে আক্রমণ করে যাতে

করে অন্যান্য রোগ জীবাণু কোনোরকম বাধা ছাড়াই আক্রমণ করতে পারে। এই শরীরটা হচ্ছে মুসলিম উম্মাহর মতো। জিহাদ হচ্ছে এর রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে সে আক্রমণকারীদের থেকে নিজেকে রক্ষা করে। আর সেই বাতাস/সরকার হচ্ছে এইডসের মতো যা প্রতিরোধের এই স্পৃহাটাকে মেরে ফেলার জন্য কাজ করে যাতে করে মুসলিম উম্মাহকে আক্রমণ এবং দখল করে নেওয়া সহজ হয়ে যায়। এই কারণেই সাইয়্যিদ কুতুব, আব্দুল্লাহ আযযাম, আয-যারক্বাওয়ী, শাইখ ওসামা ﷺ প্রমুখদের মতো লোকদেরকে আজ দানবরূপে চিত্রিত করা হয়। কারণ এরা প্রতিরোধের সেই চেতনাকে ধারণ করেন। আর তাই তোমার এই পাতাটি ঝরিয়ে দিতেই বাতাস সবচে জোরে বইবে। এই ফাঁদে পা দিও না। মনে রেখো: এইডস!

পরিশেষে সুদৃঢ় বৃক্ষ সেটাই যা "কোনো নিন্দাকারীর নিন্দায় ভীত হবে না" বস্তুত বৃক্ষটি তিরস্কার বা নিন্দায় প্রভাবিত হবে। কিন্তু সেভাবে নয়, যেমনটি আশা করা হয়েছিল! সেটা কেমন হবে ? যখন বাতাস তোমার পাতাগুলো ঝরিয়ে দিতে চায়- যখন 'ওয়ালা এবং বারা' আর জিহাদের ধারণাকে আঁকড়ে ধরে রাখার কারণে সে তোমাকে আক্রমণ আর তিরস্কার করে তখন ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহর ﷺ ভাষায় তোমার প্রতিক্রিয়া হবে এমন: *"যার হৃদয় আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় পরিপূর্ণ সে অন্য কারো সমালোচনা বা তিরস্কারে দমে যায় না বরং এগুলো তাকে আরো শক্তভাবে দ্বীনকে আঁকড়ে ধরতে প্রেরণা যোগায়..."*

সবশেষে এই আয়াত আমাদেরকে সেই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি দেয় যে কুরআনের এই শিক্ষাগুলোর প্রতি সৎ থাকতে পারা হলো, 'আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন'। বাতাসের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারাটা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর একটা অনুগ্রহ। একটা গাছকে সোজা হয়ে দাঁড় করিয়ে রাখতে বা ধুলায় মিশিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আল্লাহই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী:

> "তোমরা যে বীজ বপন কর, সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? তোমরা তাকে উৎপন্ন কর, না আমি উৎপন্নকারী? আমি ইচ্ছা করলে তাকে খড়কুটা করে দিতে পারি, অতঃপর হয়ে যাবে তোমরা বিস্ময়াবিষ্ট।" [সূরা ওয়াক্বিয়াহ, ৫৬: ৬৩-৬৫]

শেষ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে শেষ যামানায় কারো বদলে যাওয়াটা খুব সহজ হয়ে পড়বে। মানুষ চাপে পড়ে এবং নিজেদের দুর্বলতার কারণে খুব দ্রুত সত্যকে ত্যাগ করবে। তিনি ﷺ বলেন:

"পুনরুত্থান দিবসের আগে, রাতের অন্ধকারের মতো ফিতনা আসবে যার মাঝে একজন মানুষ মু'মিন হয়ে ঘুম থেকে উঠবে আর কাফির হয়ে ঘুমাতে যাবে, আবার মু'মিন হয়ে ঘুমাতে যাবে আর কাফির হিসাবে জেগে উঠবে।"

এই ধরনের ঘটনাগুলো হচ্ছে কিছু অজানা বা গায়েবী ঘটনার ফল যা আমরা মানুষেরা হয়তো ঠিক উপলব্ধি করতে পারব না। তবে, কুরআন এবং সুন্নাহতে এমন কিছু ব্যবহারিক উপায় বলে দেওয়া আছে যার সাহায্যে আমরা মানবসভ্যতার ইতিহাসের সঠিক পক্ষে থাকতে পারি। এখানে আমরা শুধু দুটি উপায় আলোচনা করব এবং দুটিই একটি মজবুত বৃক্ষের দৃঢ়তার সর্বপ্রথম শর্তটির উপর আলোকপাত করে: উর্বর জমি- একটি সুস্থ হৃদয়।

* রসূলুল্লাহ ﷺ মক্কায় যখন কঠিনতম পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাঁর প্রতি নাযিলকৃত সূরাসমূহের মূল বিষয় ছিল পূর্ববর্তী নবীদের কাহিনি। ইসলামের জন্য কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন যে তিনিই প্রথম নন, বরং যুগে যুগে এমন আরো অনেকেই ছিলেন, এটা বোঝানোই ছিল এর উদ্দেশ্য। একই সাথে আগের নবীরা কীভাবে এসব পরীক্ষার মোকাবিলা করেছিলেন সে শিক্ষাও তাঁকে এর মাধ্যমে দেওয়া হচ্ছিল। মক্কার বিপদের ঘনঘটায় আচ্ছন্ন দিনগুলোতে এই ইতিহাসের গল্পগুলো রসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবিদের رضي الله عنهم মনোবল দৃঢ় করতে বিশাল ভূমিকা রেখেছিল। এই কথাটিই নিম্মোক্ত আয়াতে প্রতিফলিত হয়,

> "আর আমি রসূলগণের সব বৃত্তান্তই তোমাকে বলছি, যার দ্বারা তোমার অন্তরকে মজবুত করছি। আর এভাবে তোমার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য নসীহত ও স্মরণীয় বিষয়বস্তু এসেছে।" [সূরা হুদ, ১১: ১২০]

একইভাবে প্রথম দিককার মুসলিমদের সেইসব কঠোর পরীক্ষার দিনগুলোর পাশাপাশি ইতিহাস, বিশেষভাবে সেই সকল মুসলিমদের ইতিহাস অধ্যয়ন করাটা উপকারী হতে পারে যারা তাদের সময়ে কোনো না কোনো প্রকারের সাহসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অনেক সময় কোনো একটা পরিস্থিতিতে আমাদের করণীয় বুঝে উঠতে আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে ফিক্বহের বই ঘাঁটি যেখানে শুধুমাত্র সৎকর্মশীলদের জীবনী পড়েই তাদের ব্যক্তিত্বকে আত্মস্থ করার মাধ্যমে আমাদের করণীয় সম্বন্ধে আরো ভাল দিকনির্দেশনা পেতে পারি। '*সাফাহাত মিন সবর আল উলামা*' (আলেমদের সবরের পাতা থেকে) নামক অসাধারণ বইটিতে লেখক বলেন:

"নিজের মধ্যে সৎগুণের বিকাশ ঘটাতে এবং মহৎ উদ্দেশ্যে কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারের মানসিকতা তৈরী করার একটি ভালো উপায় হচ্ছে সেই সকল আলেমদের জীবনী পড়া যারা তাঁদের অর্জিত 'ইলমের উপর আ'মল করেছেন। মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য অধ্যবসায়ের সাথে ত্যাগ স্বীকার করে যাওয়া আলেমদের পদাঙ্ক অনুসরণের ক্ষেত্রে তাদের জীবনী পড়াটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। বলা হয়ে থাকে এই কাহিনিগুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র সেই সকল সৈন্য যার মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাঁর প্রিয়পাত্রদের অন্তরকে সুস্থির রাখেন। ইমাম আবু হানিফা ﵀ বলেন, "আলেমদের জীবনী এবং তাঁদের গুণাবলি অধ্যয়ন আমার কাছে 'ইলমের চেয়ে বেশী প্রিয় কারণ এগুলো তাঁদের চরিত্র বর্ণনা করে।"

তাই সৎকর্মশীলদের জীবনী অধ্যয়ন, তাঁদের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্রকে আপন করে নেয়া অন্তরকে শক্তিশালী এবং জীবন্ত করার একটি ভালো উপায়। এটি ঈমান এবং 'ইলমের বীজ বপনের জন্য অন্তরকে উর্বর করে তোলে। তাহলে কোথা থেকে শুরু করা উচিত? শাইখ ইবনে আল জাওযী ﵀, সাইদ আল খাতির গ্রন্থের ৬০ পৃষ্ঠায় বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবিদের ﷺ জীবনী থেকেই সবচেয়ে বেশি উপকারী জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব।

* অন্তরকে দৃঢ় করার দ্বিতীয় উপায়টি আরো সহজ: শুধু তোমার রব্ব এর কাছে চাও! উম্মে সালামাহ ﷺ কে একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল রসূলুল্লাহ ﷺ কোন দুআটি সবচেয়ে বেশি করতেন। উত্তরে তিনি বলেন:

"ওনার সবচেয়ে বেশি করা দু'আটি ছিল: ও অন্তর সমূহের নিয়ন্ত্রণকারী, আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর স্থির করে দাও। (ইয়া মুক্বাল্লিবাল ক্বুলুব, সাব্বিত ক্বলবি 'আলা দ্বীনিক)"

এই দুআটি সারাদিন সবসময় অভ্যাস করা উচিত। কাজে যাওয়ার সময় কিংবা স্কুলের বারান্দা দিয়ে হাঁটার সময় যখনই সুযোগ পাওয়া যায় তখনই এই সহজ দুআটি পুনরাবৃত্তি করার অভ্যাস করা উচিত। গুপ্তধনের মতো এই দুআটিকে আঁকড়ে রাখা উচিত এবং সর্বদা এটিকে ঠোঁটের ডগায় রেখে অন্তরকে ইসলামের সাথে সংযুক্ত করে রাখা উচিত। এটা খুবই সহজ হওয়া সত্ত্বেও এটা যাদের খুব প্রয়োজন তাদের অনেকেই এটিকে অবহেলা করে।

তাই হৃদয়কে স্থির এবং সুস্থ রাখার মাধ্যমে, অন্তরের জমিকে উর্বর রাখার মাধ্যমে তোমার শিকড়কে সুদৃঢ় করো। আর মজবুত শিকড়বিশিষ্ট গাছগুলোর শাখা-প্রশাখাই একদিন আকাশ ছোঁয়:

> "পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত।" [সূরা ইবরাহিম, ১৪: ২৪]

আর যখন তোমার শাখা-প্রশাখা আকাশ ছোঁবে, তখন কেউ তোমার পাতা পর্যন্ত পৌঁছুতেই পারবে না। তারা তোমাকে বন্দী করতে পারে, তোমাকে হত্যা করতে পারে কিন্তু তারা কখনো এ কথা বলতে পারবে না যে, তারা তোমার পাতা ঝরাতে পেরেছিল...

তারিক মেহান্না
বুধবার, ৪ সফর ১৪৩৩/ ২৮ ডিসেম্বর, ২০১১
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট- সেল#১০৭

দা’ঈদের প্রতি নাসিহা

এই লেখাটি পড়ার আগে প্রথমে আংকেল টম বলতে কী বোঝানো হয় তা জেনে নেওয়া দরকার। আংকেল টম বলতে হীনমন্য প্রজাতির দাসভাবাপন্ন, বিনয়বিগলিত, সেবাপ্রদানে-তৎপর এক চরিত্রের দিকে নির্দেশ করা হয় যে কিনা শাসকশ্রেণীর প্রতি অতিমাত্রায় অনুগত। ঐতিহাসিকভাবে এটি একটি কৃষ্ণাঙ্গ চরিত্র যে নিজেদের নীচু জাত এবং সাদাদের উঁচু জাত মনে করে এবং তাদের চাটুকারিতায় লিপ্ত থাকে।

তারিক মেহান্নার কাছে প্রশ্ন: আসসালামু আলাইকুম, আমার আগের প্রশ্নটির বিশদ উত্তর দেওয়ার জন্য আল্লাহ ﷻ আপনাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। কিন্তু আমি আপনার কাছে আরো কিছু বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা আশা করছি। আপনি আগের প্রশ্নের জবাবে পশ্চিমা দেশের অনেক দা’ঈ কে “আংকেল টম” হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আপনার এ কথার সূত্র ধরে বলতে চাই, বর্তমান সময়ে এমন কিছু বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে দা’ঈরা জেলে যাবার ভয়ে কথা বলতে চান না। হিকমাহর সাথে এসব বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে কীভাবে কথা বলা সম্ভব বলে আপনি মনে করেন? …আর যারা এসব ব্যাপারে কথা বলতে ভয় করে তাদের আসলে করণীয় কী?

তারিক মেহান্নার উত্তর:

প্রথমত, আমি এই ব্যাপারে আপনার সাথে দ্বিমত পোষণ করি যে, কেবলমাত্র ভয় পায় বলে এই দা’ঈরা সত্য কথা বলা থেকে বিরত থাকে। কেউ যদি ইসলামের কথা বলতে ভয় পায়, তাহলে সে চুপ করে থাকবে, ব্যস! কিন্তু আমরা যখন দেখি আংকেল টম নীরবতা ভঙ্গ করে ‘অতি উদ্যোগী’ হয়ে ইসলামকে কাটছাঁট করে নখদন্তহীনভাবে মানুষের সামনে উপস্থাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, এবং সেটা সে করছে ইসলামের শত্রুদের সাথে এক টেবিলে বসে, তখন আমরা বুঝতে পারি, নিছক ভয়ের কারণে সে এমনটি করছে না, বরং সমস্যার মূল আরো গভীরে। আপনি খেয়াল করে দেখবেন, ইসলামের উপর আদর্শিক আক্রমণ নতুন কোনো ঘটনা নয়, বরং সেটা হয়ে আসছে বেশ কয়েক শতক জুড়েই, এবং প্রত্যেক আক্রমণের জবাবে আলিমদের কাছ থেকে তিনটি ভিন্ন ধরনের সাড়া মিলেছে।

- প্রথম দল, এরা এই আক্রমণের মুখে কার্যত নতি স্বীকার করেছে। আক্রমণকারী কাফের সভ্যতার চোখ ধাঁধানো চাকচিক্যে এরা বিমুগ্ধ হয়ে নিজেদের আত্মা ও মন পুরোপুরি বিকিয়ে দিয়ে মানসিক দাসে পরিণত হয়েছে। ফলে তারা কাফেরদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইসলামকে বুঝাতে চেষ্টা করেছে এবং কাফেরদের ব্যবহৃত পরিভাষা ব্যবহার করে ইসলামকে ব্যাখ্যা করেছে।
- দ্বিতীয় দল, তারা কিছু বিষয়ে আপস করে, কিছু বিষয়ে করে না ("মানিয়ে চলো" নীতি)।
- তৃতীয় দলে আছেন এমন কিছু 'আলিম, যাদের অবস্থান উপরের দুই দলের মতো নড়বড়ে নয়। তারা কোনোকিছুতে বিন্দুমাত্র ছাড় দেননি। সকল বাধা-বিপত্তি ও চাপের মুখেও তারা অবিচল থেকেছেন।

কাজেই, আংকেল টমের সমস্যাটি ভয়জনিত নয়, বরং মূল সমস্যা হচ্ছে তার পরাজিত মানসিকতা। সে ইসলামের শত্রুদের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং আদর্শিক আক্রমণের সামনে পরাভূত হয়েছে। তাই সে এখন মন থেকেই তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। সে এখন চায় সমাজে যেন তার গ্রহণযোগ্যতা টিকে থাকে এবং বিরোধিতার মুখে পড়তে না হয়। এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে, আংকেল টম একাকী ঘরে বসে যালিমের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে না পারার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট!! না, তার অবস্থা মোটেও এমন নয়! সে মানসিক দাসত্বের বেড়াজালে এতটাই বন্দী যে, সে যালিমকেও আর যালিম মনে করে না, উল্টো যুলুমের জন্য সে নিজেকেই দায়ী করে এবং যালিমের মন যুগিয়ে চলতে চায় (Stockholm syndrome)!

এসব লোকদের করণীয় কী জানতে চেয়ে আপনি যে প্রশ্নটি করেছেন সে প্রশ্নটি তাদের জন্য খাটেই না! আপনি ধরেই নিচ্ছেন তারা কিছু একটা করতে চায়! মনস্তত্ত্বের ভাষায়, বহু আগেই তারা হার মেনে নিয়েছে। যে বিষয়ে প্রশ্ন এবং বাস্তবিক আলোচনার অবকাশ আছে তা হলো, আমরা যারা হার-না-মানা দলের পথ অনুসরণ করতে চাই, যারা উম্মাহকে পুনর্জীবিত করতে চাই, তাদের এ মুহূর্তে কী করণীয়? বিশেষভাবে, আমরা যারা পশ্চিমা দেশে বসবাস করছি, তাদের কী করা উচিত যেখানে ভিনদেশি ও আজিব চেহারার এক ইসলাম পালিত হচ্ছে? যখন ইসলাম থেকে সম্মান আর গৌরবের চাদর খুলে ফেলে ইসলামকেই অপমানিত করা হচ্ছে এমন চরম মুহূর্তে আমাদের কী করণীয়?

কুরআনে কিছু আয়াত আছে যেগুলো আমাদেরকে গভীর চিন্তার খোরাক দেয়। নির্দিষ্ট করে বললে, মূসা ﷺ এবং ফির'আউনের গল্পের দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এই গল্পটি কুরআনে সবচেয়ে বেশিবার বর্ণিত, সবচেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত এবং আমরা যে সময়ে বাস করছি তার সাথে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্যপূর্ণ। আজকে বিশ্বাসী মুসলিম জাতির অবস্থা তৎকালীন বনী ইসরাঈলের মতো। ফির'আউনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আজ মুসলিমদের শোষণ করছে যুলুমবাজ আমেরিকান সরকার। সেদিনের মূসা ﷺ এর মতো আজকে প্রয়োজন একজন মুসলিম নেতার যার দায়িত্ব হবে মুসলিম জাতিকে রক্ষা করা ও তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা দেওয়া, একই সাথে যালিমদের শিক্ষা দেওয়া ইসলাম কী। আসুন আমরা দেখি, আল্লাহর প্রেরিত একজন নবী, একজন সুদক্ষ এবং কুশলী দা'ঈ হিসেবে মূসা ﷺ তার উম্মাহকে নিয়ে এই কঠিন পরিস্থিতি কীভাবে সামাল দিয়েছিলেন।

প্রথমেই লক্ষণীয় বিষয়টি হলো, মূসা ﷺ এর কাছে ইসলামের "ওয়ালা" এবং "বারা" এ দুটো ধারণা ছিল স্ফটিকস্বচ্ছ। ফির'আউন এবং মূসা ﷺ এর সম্পর্কের দিকে লক্ষ্য করুন, কোনো লুকোচুরি বা রাখঢাক নেই, কে কোন পক্ষে আছে - সেটা নিয়ে কোনোরকম অস্পষ্টতা নেই। দুটো দলকে মোটা দাগে পৃথক করা হয়েছে। মূসা ﷺ ফির'আউন এবং ফির'আউনের দলভুক্ত সকলকে বনী ইসরাঈলের স্পষ্ট ও প্রকাশ্য শত্রুরুপে চিহ্নিত করেছেন। বনী ইসরাঈলকে আশ্বস্ত করে মূসা ﷺ বলছেন,

> "হতে পারে তোমাদের প্রভু তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করবেন, আর অচিরেই তোমাদেরকে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন" [সূরা আরাফ, ৭: ১২৯]

ফির'আউনের বিরুদ্ধে করা আগ্রাসী দু'আ থেকে মূসা ﷺ এর বৈরী মনোভাব আরও পরিষ্কার হয়।

> "আর মূসা বললেন – "আমাদের প্রভু! নিশ্চয় তুমি ফিরআউন ও তার পরিষদবর্গকে এই দুনিয়ার জীবনে শোভা-সৌন্দর্য ও ধন- দৌলত প্রদান করেছ, যা দিয়ে, আমাদের প্রভু! তারা তোমার পথ থেকে পথভ্রষ্ট করে। আমাদের প্রভু! বিনষ্ট করে দাও তাদের ধনসম্পত্তি, আর কাঠিন্য এনে দাও তাদের হৃদয়ের উপরে, তারা তো বিশ্বাস করে না যে পর্যন্ত না তারা মর্মন্তুদ শাস্তি প্রত্যক্ষ করে।" [সূরা ইউনুস, ১০: ৮৮]

অথচ মূসা ﷺ এর কাহিনি বর্ণনা করে আল্লাহ বলেছেন,

> “অতঃপর ফির‘আউন পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফির’আউন, হামান, ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল।” [সূরা ক্বাসাস, ২৮: ৮]

ফির’আউনের প্রতি মূসা ﷺ যে ধরনের মনোভাব ও মানসিকতা পোষণ করতেন সেটা বোঝা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ শত্রুর প্রকৃত পরিচয় নিয়ে যদি সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে, তাহলে নিজেকে এবং নিজের উম্মাহকে শত্রুর ষড়যন্ত্রের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সুপরিকল্পিত কোনো কৌশল গ্রহণ করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। এ কারণেই কুরআনে শয়তানের ব্যাপারে আল্লাহ আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন,

> “নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের শত্রু, কাজেই তাকে শত্রু হিসেবে গ্রহণ কর!” [সূরা ফাতির, ৩৫: ৬]

আপনার শত্রু কখনোই আপনাকে তার পরিকল্পনা জানতে দেবে না। সে হবে খুব সূক্ষ্ম, শঠতাপূর্ণ, কূটকৌশলী, স্মিতহাস্য, ধীরস্থির এবং ধূর্ত। আপনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই আপনাকে সে আঘাত করে চুরমার করে দেবে। এমনটা যে কেবল বাস্তব জগতে ঘটবে তা নয়, বরং মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধেই আপনি মনোবল হারিয়ে পরাজয় স্বীকার করতে পারেন। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের একটা সুপ্রসিদ্ধ কৌশল হলো আপনার শত্রু আপনাকে বোঝাবে যে, সে আপনার শত্রু নয় বরং বন্ধু। যেন আপনাকে ব্যবহার করে আপনার বন্ধু অর্থাৎ তার আসল শত্রুকে দমন করতে পারে। এই ফাঁদে পা দেওয়ার অর্থই হলো নিজেদেরকে রক্ষা করার শেষ সুযোগটুকুও হারানো। অধিকন্তু, আপনার ভাই ও বোনদের দিকে বিশ্বস্ততার হাত না বাড়িয়ে সে হাত কাফিরদের সাথে মেলানো হলো মুনাফিক্বদের বৈশিষ্ট্য।

> “এরা (মুনাফিক্বরা) দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নয় ওদিকেও নয়...” [সূরা নিসা, ৪: ১৪৩]

কাজেই নিজে বাঁচতে এবং উম্মাহকে বাঁচাতে সর্বপ্রথম ধাপটি হচ্ছে ওয়ালা’ এবং বারা’ এর ধারণাকে পুনরুজ্জীবিত করা যেন আপনি শত্রুকে বন্ধু ভেবে গুলিয়ে না ফেলেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বর্তমান সময়ে বিশেষ চিন্তার দাবি রাখে।

দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি আমাদের খেয়াল করতে হবে তা হলো, "মৌলবাদ", "চরমপন্থা", "সন্ত্রাসবাদ", "উগ্রবাদ" – যত্রতত্র এসকল শব্দের অসতর্ক ব্যবহার। এই শব্দগুলো ধোকাঁবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। গণমানুষকে বিভ্রান্ত করে রাখাই এসকল শব্দচয়নের উদ্দেশ্য। মূসা ﷺ কে ফির'আউন রুখে দিতে চেয়েছিল "চরমপন্থা দমন" এর নামে!

> "আর ফির'আউনের লোকদের প্রধানরা বললো -"আপনি কি মূসাকে ও তার লোকদের ছেড়ে দেবেন দেশে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে এবং আপনাকে এবং আপনার দেবতাদের পরিত্যাগ করতে?" [সূরা আ'রাফ, ৭: ১২৭]

> "ফির'আউন বলল; তোমরা আমাকে ছাড়, মূসাকে হত্যা করতে দাও, ডাকুক সে তার পালনকর্তাকে! আমি আশংকা করি যে, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা সে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করবে" [সূরা গাফির, ৪০: ২৬]

এবং ফির'আউন নিজেকে প্রগতিশীল, সুশীল এবং উদারপন্থী হিসেবে দাবি করতো !

> "ফির'আউন বলল, আমি যা বুঝি, তোমাদেরকে তাই বোঝাই, আর আমি তোমাদেরকে মঙ্গলের পথই দেখাই।" [সূরা গাফির, ৪০: ২৯]

কিন্তু মূসা ﷺ যেদিকে মানুষকে আহবান করছিলেন সেটিকে বোঝাতেই মূলত ফির'আউন এই শব্দগুলোর (ফিতনাবাজ, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী) অবতারণা করেছিল। কারণ মূসা ﷺ অবস্থান নিয়েছিলেন ফির'আউনের বিরুদ্ধে। যেসব মিশরীয় মূসা ﷺ এর ধর্ম গ্রহণ করেছিল, তাদের কথা থেকে আমরা বুঝতে পারি ফির'আউন কী বুঝাতে চেয়েছিল। তারা বলেছিল:

> "বস্তুতঃ আমাদের সাথে তোমার শত্রুতা তো এ কারণেই যে, আমরা ঈমান এনেছি আমাদের রবের নিদর্শনসমূহের প্রতি যখন তা আমাদের নিকট পৌঁছেছে।" [সূরা আরাফ, ৭: ১২৬]

ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটু থেমে এই আয়াতটি নিয়ে আমাদের গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করা উচিত। ফির'আউন সকলের সামনে মূসার ﷺ এমন একটি

চরিত্র উপস্থাপন করতে চেয়েছিল যাতে মনে হবে মূসা ﷺ একজন রক্তচোষা বিকারগ্রস্ত লোক, যে সমাজে ফিতনা-ফাসাদ করতে চায়! কিন্তু আমরা কুরআনে দেখতে পাচ্ছি এমন কিছু মুসলিম ছিলেন যারা ফির'আউনের এই মিডিয়া ক্যাম্পেইনে প্রলুব্ধ হয়নি। তারা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন মূসা ﷺ সত্য বলছেন, আর ফির'আউন মিথ্যা। তারা জানতেন ফির'আউন মৌলবাদ, ধর্মীয় চরমপন্থা কিংবা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে না, বরং মূসা ﷺ এর আহবান অর্থাৎ ইসলাম থেকে লোকজনকে দূরে সরিয়ে রাখতে এই ধরনের স্পর্শকাতর শব্দ ব্যবহার করছে। কেন? কারণ, মূসা ﷺ যে বার্তাটি মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন তা হলো, আমরা কেবল আল্লাহর কাছে মাথা নত করবো, ফির'আউনের মতো কোনো অত্যাচারী যালিমের কাছে নয়। যে মানুষগুলোকে ফির'আউন এতকাল মানসিক দাসত্বের বেড়াজালে বন্দী করে রেখেছিল তাদের মনে মূসার ﷺ এই কথাগুলো গৌরব, মর্যাদা এবং আত্মসম্মানের একটি চেতনা সৃষ্টি করে।

আর আজকেও আমরা দেখছি ইসলামের যেসব ভাবনা মানুষের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করবে, ইসলামের যেসব চেতনা ও উপলব্ধি মানুষের সামনে মুক্তির দুয়ার উন্মোচিত করবে, সেইসব বিষয়গুলোর সাথে খুব অপ্রীতিকর লেবেল জুড়ে দিয়ে নেতিবাচকভাবে গণমানুষের সামনে উপস্থাপন করা হয়। তাই 'ওয়ালা এবং বারা' হয়ে যায় 'মৌলবাদ', আত্মরক্ষার জন্য জিহাদের নাম হয় 'সন্ত্রাসবাদ' বা 'জঙ্গিবাদ', আর শরী'আহকে অপবাদ দেওয়া হয় 'চরমপন্থা' বলে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আপনি দেখবেন আমজনতাও কোনো চিন্তাভাবনা না করেই এসব সংজ্ঞা অবলীলায় গ্রহণ করছে। এমনকি অনেক আলিম এবং দা'ঈ পর্যন্ত তাদের কথায় এবং লেখায় কাফিরদের সাথে তাল মিলিয়ে এসব 'পরিভাষা' ব্যবহার করছেন।

লেখার শুরুতে আদর্শিক আক্রমণের জবাবে কার অবস্থান কেমন হয় সেটি আলোচনা করেছিলাম। উপরে যাদের কথা বলেছি তারাই হলো সেই প্রথম দল। এরা দাসসুলভ মানসিকতা বহন করে। এই শ্রেণির 'আলিমরা আজকে তাগুত সরকার আয়োজিত "Counter-radicalism conference" এ গর্বের সাথে যোগ দিচ্ছে! আপনি কী কল্পনা করতে পারেন, মূসা ﷺ ফির'আউনের কাছে গিয়ে আর্তি জানাচ্ছেন যেন বনী ইসরাঈলকে সুশীল করে গড়ে তোলা হয়, যেন তাদের মধ্য থেকে মৌলবাদের বীজ নির্মূল করা হয়! কিংবা আমাদের রাসূল ﷺ স্পেশাল এজেন্ট আবু জেহেলকে দাওয়াত করে এনেছেন দারুল আরকামে সাহাবিদেরকে ﷺ "চরমপন্থা দমনে কী করণীয়" তা নিয়ে লেকচার দেওয়ার জন্য? অবশ্যই না!

কাজেই আপনাকে মূসা ﷺ এর অনুসারীদের মতো সাবধান থাকতে হবে। এ ধরনের শব্দের উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারে প্রতারিত না হয়ে এই শব্দগুলোর ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকুন।

আরো একটি ব্যাপার নিয়ে চিন্তার অবকাশ রয়েছে। তা হলো, হিকমাহ প্রয়োগ করা এবং নমনীয় হওয়া। আপনি আপনার প্রশ্নে হিকমাহ এর ব্যাপারে জানতে চেয়েছেন। আপনি হয়তো খেয়াল করবেন, এই হিকমাহ গ্রহণ করতে গিয়ে একদল বাড়াবাড়ি করছে, আবার আরেকদল হিকমাহ বর্জন করতে গিয়ে বাড়াবাড়ি করছে। একদল লোক আছে শ্রোতার মেজাজ-মর্জির দিকে থোড়াই কেয়ার করে। শ্রোতার জ্ঞানের মাত্রার প্রতি খেয়াল না রেখে কোনো রাখ-ঢাক ছাড়াই কথা বলতে থাকে। আবার অনেকে হিকমাহ খাটাতে গিয়ে সত্যকেই গোপন করে বসে যার ফলে ইসলামের মর্মকথার নির্যাসটুকুই নষ্ট হয়ে যায় এবং বিকৃত হয়ে যায়। মূসা ﷺ এর দিকে দেখুন। এ দুটোর কোনোটিই তিনি করেননি। আমাদের মতো তিনিও ছিলেন সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের মতো তাঁরও দুনিয়াবী শক্তির ক্ষেত্রে দুর্বলতা ছিল। আমাদের মতো তাঁকেও এক কঠিন পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়েছিল। আর আমাদের মতো, তাঁকে বিশেষভাবে আদেশ করা হয়েছিল যেন তিনি উম্মাহর ব্যাপারে নমনীয়তা অবলম্বন করে।

> "তোমরা উভয়ে ফেরআউনের কাছে যাও সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে. অতঃপর তোমরা তাকে নম্র কথা বল, হয়তো সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে" [সূরা ত্ব-হা, ২০: ৪৩-৪৪]

আবার আপনি যখন অন্য আয়াতগুলোর দিকে তাকাবেন, তখন আপনি মূসা ﷺ এর দা'ওয়াহ এর মধ্যে প্রজ্ঞার ছাপ দেখবেন। দা'ওয়াহ এর ক্ষেত্রে নমনীয়তা অবলম্বনের রীতিকে ঢাল বা সেন্সরবোর্ড রূপে ব্যবহার করে মূসা ﷺ কখনোই সত্যকে অস্পষ্ট রাখেননি।

> "আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সত্য এসেছে, তার ব্যতিক্রম কিছু না বলার ব্যাপারে আমি সুদৃঢ়..." [সূরা আরাফ, ৭: ১০৫]

শুধু তাই নয়, নমনীয়তা অবলম্বনের মানে এই নয় যে, যুলুম-নির্যাতনের মুখে ভীরু এবং নরম-সরম হয়ে থাকতে হবে।

> "অতএব তোমরা তার কাছে যাও এবং বল: আমরা উভয়েই তোমার পালনকর্তার প্রেরিত রসূল, অতএব আমাদের সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দাও এবং তাদেরকে নিপীড়ন করো না। আমরা তোমার পালনকর্তার কাছ থেকে নিদর্শন নিয়ে তোমার কাছে আগমন করেছি। এবং যে সৎপথ অনুসরণ করে, তার প্রতি শান্ত। আমরা ওহী লাভ করেছি যে, যে ব্যক্তি মিথ্যারোপ করে এবং মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার উপর আযাব পড়বে"। [সূরা ত্ব-হা, ২০: ৪৭-৪৮]

আসুন আমরা এক মিনিটের জন্য থামি এবং এই আয়াতগুলোর দিকে মনোযোগ দিই। এখানে আমরা দেখছি মূসা ﷺ একজন নবী, যিনি কোনো ক্ষমতাশালী ব্যক্তি নন, বরং তিনি ছিলেন নিপীড়িত মানুষদের একজন। তিনি ছিলেন সংখ্যালঘু। বিশ্বের তৎকালীন পরাশক্তির সাথে নম্রতা অবলম্বন করতে আদেশপ্রাপ্ত মূসা ﷺ তাঁর সংকটাপন্ন উম্মাহকে উদ্ধার করতে তিনটি পদক্ষেপ নিলেন:

- তিনি ফির'আউনের অপকর্মের কথা খুব পরিষ্কারভাবে উপস্থাপন করলেন তার জাতির সামনে।
- তিনি খুব দৃঢ়তার সাথে দাবি করলেন যে, ফির'আউনকে অবশ্যই তার দুষ্কর্মের ইতি টানতে হবে।
- তিনি ফির'আউনকে তার দৌরাত্ম্যের জন্য তার অশুভ পরিণামের ব্যাপারে হুমকি দিলেন।

আপনি দেখবেন, মূসা ﷺ আত্মপক্ষসমর্থন করার চেষ্টা করেননি, কোনো কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করেননি। তাঁর মধ্যে কোনো পরাজিত মানসিকতা ছিল না। তাঁর কথায় কোনো অস্পষ্টতা ছিল না। তাঁর মধ্যে ভীরুতা ছিল না। দুনিয়াবী শক্তির অভাব তাঁর নৈতিক মনোবলে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরং তিনি তা-ই বলেছিলেন, যা বলা উচিত, যেভাবে বলা উচিত, এবং যখন বলা উচিত। ইমাম ইবনুল কায়্যিম رحمه الله হিকমাহকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন এভাবেই, *"হিকমাহ হচ্ছে উচিত সময়ে, উচিত ভঙ্গিতে, উচিত কথাটি বলা"* (মাদারিজ আস-সালিকিন, ২/৪৭৯)।

মূসা ﷺ মিনমিন করে কথা বলেননি। তাঁর কথায় দৃঢ়তা ছিল। তাঁর মধ্যে আত্মমর্যাদার ছাপ ছিল সুস্পষ্ট এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী। ফির'আউনের প্রতিক্রিয়া দেখেই আমরা তা বুঝতে পারি। সে

মূসাকে ﷺ 'সন্ত্রাসবাদ' বা 'মৌলবাদ'-বিরোধী কনফারেন্সে আমন্ত্রণ করেনি কিংবা মূসাকে ﷺ তার সরকারের 'সন্ত্রাসবাদ দমন বিশেষজ্ঞ' হিসেবে যোগ দিতে অনুরোধ করেনি। অথচ আজকে আমেরিকা কিছু স্বেচ্ছায় বিকিয়ে যাওয়া মুসলিম দা'ঈকে তার সাহায্যকারী হিসেবে পাচ্ছে! বরং ফির'আউন চেয়েছে মূসাকে ﷺ হত্যা করতে, যেমন করে যুগে যুগে এই ফির'আউনদের অপকীর্তি প্রকাশ করে দেওয়ার কারণে মানবাধিকার এবং মুক্তিকামী নেতাদের যুগ যুগ ধরে গুপ্তহত্যা করা হয়েছে। এবং সেই একই ঘটনা ঘটে চলেছে আজ অবধি ...

আমাদের অধিকাংশই ভীতু। আমরা যেকোনো মূল্যে দুশ্চিন্তা পরিহার করে চলতে চাই। লোকের বিরোধিতার মুখে পড়তে চাই না। আমরা চাই সবাই আমাদের পছন্দ করুক। যদিওবা আমরা কখনো বুঝতে পারি যে, একটা সাহসী পদক্ষেপ নেয়া খুব জরুরি, আমরা সেটা নিতে চাই না, কারণ সেটার ফলাফল নিয়ে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত থাকি। লোকে আমাদেরকে কী ভাববে এবং মিডিয়া আঙ্গুল তাক করবে - এই দুশ্চিন্তায় আমরা কেটে পড়ি। হ্যাঁ, আমরা আমাদের ভীরুতাকে "হিকমাহ" কিংবা "বিচক্ষণতা" বলে চালিয়ে দিতে পারি, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে এটা স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমাদের মধ্যে যে ভয় আছে তা আমাদের নিজেদের হাতে গড়ে নেওয়া অভ্যাস, এটা সহজাত নয়। নিজেকে দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচাবার জন্য আমরা এর আশ্রয় নিই। ভয়কে নিজের জীবন থেকে উপড়ে ফেলুন এবং সাহস দিয়ে একে প্রতিস্থাপিত করুন। ভীরুতার দরুন আপনাকে যে মূল্য দিতে হবে তা সাহসের জন্য দেওয়া মূল্য থেকে অনেক বেশি চড়া।

আপনার কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকতে পারে, সুফিয়ান আস-সাওরী رحمه الله, সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধ করতে গিয়ে মুখ ফুটে কিছু বলতে ব্যর্থ হলে চরম হতাশার চোটে রক্ত প্রস্রাব করতেন। কাজেই, যখন আপনি কিছু বলার সুযোগ পাবেন তখন চুপ করে থাকবেন না। দ্ব্যর্থকতার আড়ালে নিজেকে নিরাপদ অবস্থানে লুকিয়ে রাখবেন না। এতে আপনার কোনোই উপকার হবে না। মূসা ﷺ কে অনুসরণ করুন। ধরে ধরে সুনির্দিষ্ট করে নামগুলো উচ্চারণ করুন। আমেরিকান সরকারের নাম বলুন। তুলে ধরুন প্যালেস্টাইন, ইরাক আর আফগানিস্তানের কথা। বলুন বোন আফিয়া সিদ্দিকির কথা। এমন প্রতিটি বিষয় তুলে ধরুন যেন যালেমরা জানতে পারে তাদের কাজকর্ম নিয়ে আমরা কী ভাবছি। এটাকে চরমপন্থা কিংবা মৌলবাদ অথবা উগ্রবাদ বলে না, এটা হচ্ছে সত্যকে কোনো কাটছাঁট না করে যেমন-আছে-তেমন-ভাবে প্রকাশ করে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।

হিকমাহ মানে নিজেদের দ্বীনকে মানুষের কাছে লুকিয়ে রাখা নয়। আর এই কারণে তো নয়ই যে, দ্বীন ইসলামের কোনো একটি অংশ সমাজের চোখে অপছন্দনীয়, উচ্চারণের অযোগ্য কিংবা অযাচিত বলে ঠেকে। ইসলামি দা'ওয়াহ এর মূল কথাই হলো সত্যকে প্রকাশিত করা, তাকে গোপন করে রাখা নয়।

> "আর আল্লাহ যখন আহলে কিতাবদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন যে, তা মানুষের নিকট বর্ণনা করবে এবং গোপন করবে না" [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৮৭]

> "নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হিদায়াতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহর অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও।" [সূরা বাকারা, ২: ১৫৯]

যারা কোনো প্রশ্নের উত্তর জানার পরেও নিশ্চুপ থাকাকে শ্রেয় মনে করে, আল্লাহর রাসূল ﷺ তাদের জন্য একটি কঠোর সতর্কবাণী রেখে গেছেন: "যে ব্যক্তি ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হওয়ার পরে জানা সত্ত্বেও তা গোপন করেছে, ক্বিয়ামতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেওয়া হবে।" হোক সে ব্যাপারটি আমাদের দ্বীনের 'বিতর্কিত' এবং সমাজের চোখে অযাচিত, অপছন্দনীয়, অনাহূত বিষয়গুলোর একটি। যেমন ধরা যাক জিহাদ। "আমার হাত-পা বাঁধা, আমার কিছু করার নেই" এরকম ভাব করে থাকবেন না। ইসলামে জিহাদের প্রকৃত ধারণাটি কেমন সেটা ব্যাখ্যা করে দিলেই তো পারেন, এমন তো নয় আপনাকে কেউ বলছে খাপখোলা তলোয়ার হাতে রাস্তায় নেমে পড়তে হবে!

যারা জানতে চায় তাদেরকে শুধু জানিয়ে দিন: ইসলামের মূলধারার, সর্বজনস্বীকৃত, প্রসিদ্ধ চারটি মাযহাব জিহাদের ব্যাপারে কী বলছে। আপনি যদি সেই তথাকথিত "বাকস্বাধীনতার দেশ" এ পড়ে থাকেন আর এ কথা বলতে ভয় করেন যে, ইসলাম আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার শিক্ষা দেয়, সেক্ষেত্রে আপনার উচিত সেই দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও হিজরতের চিন্তা করা, যেখানে অন্তত এই মৌলিক মানবাধিকারের কথা বলার কারণে আপনাকে জেলে ছুঁড়ে ফেলা হবে না। আমাদের এই দ্বীনে এমন কিচ্ছু নেই, কুরআন বা হাদীসে একটা অক্ষরও খুঁজে পাওয়া যাবে না যার জন্য আমাকে বা আপনাকে বিব্রত হতে হবে, লজ্জিত হতে হবে, কিংবা মানুষের কাছে ব্যাখ্যা করতে ভয় পেতে হবে। সবকিছু

বাদই দিলাম, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে আমেরিকানরা যে বিপ্লব করেছিল, যুদ্ধ করেছিল সেটা জিহাদ নয়তো কী? নাৎসি বাহিনীর বিরুদ্ধে ফ্রেঞ্চরা যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল সেটাকে জিহাদ ছাড়া আর কী-ই বা বলা যায়? আর আজকে মুসলিমরা যখন আমেরিকার বিরুদ্ধে লড়ছে সেটাকে জিহাদ বলতে এত বাধছে কেন?

সবশেষে যে ব্যাপারটি আসে তা হলো দা'ওয়াহ এর জন্য কষ্ট এবং যন্ত্রণা ভোগ। এই অজুহাতটি সকলে দিয়ে পার পাওয়ার চেষ্টা করে এবং যেকোনো কিছুকে জায়েয করে ফেলে। হ্যাঁ, মূসা ﷺ ও বনী ইসরাঈলও একটি আতঙ্কময় পরিস্থিতিতে অবস্থান করছিল এবং সে সময়টা ছিল আমাদের সময় থেকে আরো বেশি ভয়ঙ্কর। মূসা ﷺ এবং হারুন ﷺ আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানালেন,

> "তারা বলল: হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা আশঙ্কা করি যে, সে আমাদের প্রতি যুলুম করবে কিংবা সীমাজ্ঞন করবে" [সূরা ত্ব-হা, ২০: ৪৫]

> "কিন্তু তাঁর সম্প্রদায়ের সন্তানসন্ততি ব্যতীত আর কেউ মূসার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি ফিরআউন ও তাদের পরিষদবর্গের ভয়ে পাছে তারা তাদের নির্যাতন করে..." [সূরা ইউনুস, ১০: ৮৩]

> "অতঃপর মূসা মনে মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করলেন" [সুরা ত্ব-হা, ২০: ৬৭]

তারা কারাবন্দী হওয়ার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন।

> "ফির'আউন বলল, তুমি যদি আমার পরিবর্তে অন্যকে উপাস্যরূপে গ্রহণ কর তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব" [সূরা শু'আরা, ২৬: ২৯]

তারা অত্যাচারিত হওয়ার আশঙ্কা করছিলেন,

> "ফির'আউন বলল: ... আমি অবশ্যই তোমাদের হাত-পা বিপরীত দিক থেকে কেটে ফেলবো এবং আমি তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে শূলে চড়াব ..." [সূরা ত্ব-হা, ২০: ৭১]

তাদের মধ্যে মৃত্যুভয় ছিল,

> “নিঃসন্দেহে ফির‘আউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র-সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত ...” [সূরা কাসাস, ২৮: ৪]

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। FBI কিংবা M15 এর মতো গোয়েন্দাসংস্থাগুলো আজ যা করে বেড়াচ্ছে সেগুলোর প্রত্যেকটি কাজের হুমকি আগেও ছিল, এখনো আছে, তবে সত্যি বলতে কি আমাদের সময়টা তুলনামূলক সহজ। চরম আতঙ্কের পরিস্থিতিতে, ফির‘আউনের হাতে ভীষণভাবে অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমরা মূসা ﷺ কে যালিমের গড়া ত্রাসের দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে আসতে দেখেছি। তাঁর সাথে আজকের আংকেল টমদের পার্থক্য এই যে, তিনি তাঁর ভয়কে জয় করার জন্য মনঃস্থির করেছিলেন, আল্লাহর সাহায্যের উপর নির্ভর করেছিলেন এবং তাঁর সাধ্যে যা ছিল তা করেছিলেন। তাই আল্লাহও ﷻ তাঁর জন্য সমুদ্রকে দু’ভাগ করে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন।

তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে ছিলেন দৃঢ়। তাঁর মতো যারা ছিলেন তাদের জন্যও অন্ধকার সমুদ্র সেদিন দু’ভাগ হয়ে গিয়েছিল। *সিয়ার আ’লাম আল-নুবালা* (১০/২৫৭) এ বর্ণিত আছে, নিজের দ্বীন বিক্রি করতে অস্বীকৃতি জানানোর ‘অপরাধে’ কারাবন্দী ইমাম আহমদের رحمه الله সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন আল-মাওয়ারদি। আল-মাওয়ারদি ইমাম আহমদকে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে অনুরোধ করেন। ইমাম আহমদ তাকে বললেন কারাগার থেকে বের হয়ে অমুক জায়গায় যাও এবং ফিরে এসে আমাকে জানাও তুমি কী দেখেছ। আল-মাওয়ারদি সেখানে গেলেন এবং দেখলেন, সেখানে যেন এক সাগর পরিমাণ মানুষ কাগজ-কলম হাতে বসে আছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন তোমরা কী করছো? তারা উত্তর দিল, আমরা ইমাম আহমদ رحمه الله কী বলেন সেটা শুনার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি যা বলবেন আমরা সেগুলো লিখে রাখবো। আল-মাওয়ারদি ফিরে এলেন এবং তিনি যা দেখে এসেছেন তা ইমাম আহমদকে জানালেন। ইমাম আহমদ কারাগারে তাঁর কক্ষ থেকে মুখ ঘুরিয়ে বললেন, তুমি কি চাও আমি এই লোকগুলোকে বিপথে পরিচালিত করি? তিন বছর কারাগারে থাকার পর ইমাম আহমদকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।

যিনি সত্যিকারের একজন ‘আলিম, একজন মু’মিন, তিনি তার ব্যক্তিগত আরাম-আয়েশের উপরে সত্যকে অগ্রাধিকার দেন। যখন রাসূল ﷺ আবু বকর رضي الله عنه কে সাথে নিয়ে গুহাতে বন্দী ছিলেন, আপনাদের কি মনে আছে তিনি আবু বকরকে কী বলেছিলেন? তিনি বলেননি, আবু বকর ভয় কোরো না। বরং তিনি বলেছিলেন, “আবু বকর, মন খারাপ কোরো না”, কারণ আবু বকর তার নিজ জীবনের ভয় করেননি। বরং তিনি দেখছিলেন যদি তারা মুশরিকদের হাতে মারা যান তবে ইসলামের এই আহবান, ইসলামের এই দা’ওয়াহ্ থেমে যেতে পারে। আবু বকর খুব ভালো করে জানতেন, ইসলামের দিকে আহবান করলে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারে। এ দুটো ব্যাপার অবিচ্ছেদ্য।

ইসলামী দা’ওয়াহর এটিই একমাত্র পথ। কেউ যদি কোনো প্রকার কাটা-ছেঁড়া ব্যতিরেকে নবীদের দা’ওয়াহকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার ব্যাপারে আন্তরিকভাবে আগ্রহী হয় এবং একইসাথে সে একটা উপভোগ্য ও নির্বিঘ্ন জীবনের স্বপ্ন দেখে, তাহলে সে ভ্রান্তির জগতে বসবাস করছে। আপনাকে মানসিকভাবে শক্ত হতে হবে। আরাম-আয়েশের গণ্ডি থেকে বের হয়ে আসতে হবে, যত যাই কিছুর মুখোমুখি হতে হোক না কেন। ইতস্তত বোধ করবেন না। ভয় যেন আপনাকে পেছনে টেনে না রাখে।

আশা করবো, উপরের আয়াতগুলো নিয়ে খুব মন দিয়ে আপনারা চিন্তা ভাবনা করবেন এবং আয়াতের শিক্ষাগুলোকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করবেন। আমাদের কথায় ও লেখায় যেন আমরা মাথা উঁচু করে নিজেদের প্রকাশ করতে পারি।

যে আফিয়া সিদ্দিক্বীকে আমি দেখেছি...

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

'আফিয়া সিদ্দিক্বীর ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে একটা কথা জানাতে চাই। যারা এই মহিলাকে কাছ থেকে দেখেছেন, ইসলামের জন্য তার ভালোবাসা ও উৎসর্গের গল্পগাঁথা জানেন, তারা এও জানেন যে, ইসলামের জন্য আফিয়া খুব সহজে এবং অনায়াসে যে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও খুব অল্প কিছু মানুষই এমন ত্যাগ স্বীকার করার সৎসাহস দেখায়।'

"নিরাপত্তার জন্য আফিয়া বিরাট হুমকিস্বরূপ"

সহকারী ইউএস এটর্নি ক্রিস্টোফার লাভিন, অগাস্টের ১১ তারিখে বিচারককে উদ্দেশ্যে করে এই কথাটি বলেন। আফিয়াকে তার গুলিবিদ্ধ ক্ষতস্থানের চিকিৎসা থেকে বিরত রাখার জন্য এই কথাটি বলা হয়েছিল।

রাসূল ﷺ এর যুগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছিল, তাদেরকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একদলে ছিল সেসব মুসলিম যারা ইসলাম গ্রহণের পর নিজ দেশ বা সমাজের মানুষদের সাথে থেকে যায়, এবং তাদের ধর্মচর্চা দ্বীনের মৌলিক বিষয়াদি অর্থাৎ নামায, রোযা, কালেমা ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। অন্য দলটি ইসলাম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হয় নি বরং তারা দ্বীনের খাতিরে হিজরত করেছিল এবং রাসূল ﷺ এর সাথে সামরিক মহড়া ও যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল। একাধিক হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাই, রাসূল ﷺ এই দু'ধরনের মুসলিমদের সমান সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা দেননি। যেমন, মুসলিম এবং আত-তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ কোনো বাহিনীর নেতা বা আমীর নির্বাচন করার সময় শত্রুদের মধ্যে যারা ইসলাম গ্রহণ করে মুসলিম হয়েছে তাদের সাথে কী রূপ আচরণ করতে হবে এ ব্যাপারে তাদেরকে দিকনির্দেশনা প্রদান করতেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে এভাবে,

> **"... তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাও যেন তারা তাদের দেশ (ভূমি) ছেড়ে মুহাজিরীনদের ভূমিতে হিজরত করে চলে আসে, এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও, যদি তারা এমনটি করে, তাহলে তারা মুহাজিরিনদের সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত হবে। যদি তারা**

> **হিজরত করতে সম্মত না হয়, তাহলে তাদেরকে বলে দিও যে, সেক্ষেত্রে তারা বেদুইনদের সমমর্যাদা লাভ করবে, আর তাদের উপর আল্লাহ তা'আলার সেইসব হুকুমগুলো প্রযোজ্য হবে যেগুলো অন্য মুসলিমদের উপরেও প্রযোজ্য হয়..."।**

এই পার্থক্যকরণটি খুব সুস্পষ্ট। কারণ এখানে একটি দল নিজেদের কাঁধে নির্দিষ্ট কিছু দায়িত্ব তুলে নিতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে। অপরদিকে অন্য দলটি ইসলামের ব্যক্তিগত, বাধাধরা এবং ঝুঁকিমুক্ত কাজগুলোর মধ্যে আবদ্ধ থেকেছে। মূলকথা হলো, রাসূল ﷺ তৎকালীন মুসলিমদের ইসলামচর্চাকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন: মুহাজিরিনদের দ্বীন বা দ্বীন আল-মুহাজিরীন, যারা দ্বীনকে সহায়তা ও দ্বীনকে বিজয়ী করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন এবং বেদুইনদের দ্বীন বা দ্বীন আল-'আরব, যারা কেবল দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলো মেনে চলতেন।

যদিও এ বাস্তবতা হাজার বছর আগের, তথাপি এটাই চিরন্তন বাস্তবতা যে মুসলিমদের মধ্যে এ দুটি শ্রেণি বিরাজমান থাকবে। কাজেই, যে কেউ লক্ষ করলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ইসলাম-পালন-করা-মুসলিমদের(practicing Muslims) মাঝেও এ পার্থক্যটি আবিষ্কার করবে। অতীতের সেই দ্বীন আল-'আরাবকে সে ইসলামের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যে ইসলামচর্চা গতানুগতিক সেই পাঁচটি স্তম্ভ অর্থাৎ কালেমা-নামায-রোযা-যাকাত-হাজ্জ, হালালভাবে জবেহকৃত পশু খাওয়া আর স্থানীয় মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা-এসবের মাঝে সীমিত। এ ধরনের মুসলিমই যখন পশ্চিমা দেশে খুঁজে পাওয়া দায়, তখন আপনি যদি পশ্চিমা দেশে এমন কারো দেখা পান, যিনি গতানুগতিক ধারার ইসলামকে ছাড়িয়ে এক ধাপ এগিয়ে আছেন এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সম্পৃক্ত হয়ে নিজেকে দ্বীন আল-মুহাজিরীনের অনুসারীদের দলে ঠাঁই করে নিয়েছেন, তাকে দেখে কি আনন্দে আপনার চোখে জল আসবে না? ভেবে দেখুন কত চমৎকার একজন মুসলিম হলে পশ্চিমা দেশে থেকে কেবল ব্যক্তিগত ইবাদাত নয়, বরং চিন্তার জগত পুরো উম্মাহকে জুড়ে বিস্তৃত হয়! এই অগ্রপথিকেরা অন্যান্যদের এগিয়ে এসে উম্মাহর সক্রিয় সদস্য হতে উৎসাহিত করেন এবং রাতদিন সাধ্যের সবটুকু ঢেলে দিয়ে আল্লাহর আরোপিত দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে যান। শত ব্যস্ততার ভীড়েও তারা ক্ষান্ত হন না। বরং তাদের হৃদয় স্পন্দিত হয় তার মুসলিম ভাইবোনদের সাথে ঐকতানে। তারা মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে জানে এবং তাদের পরোয়া করে না যারা কেবল খায় আর গবাদিপশুর মতো বেঁচে থাকে। তাই বলা হয়ে থাকে,

هكذاالاحرارفيدنياالعبيد

"দাসত্বের এই দুনিয়ায় তারাই হলো মুক্ত স্বাধীন ..."

এমনই এক মানুষকে ঘিরে সারা বিশ্বজুড়ে তোলপাড় চলছে। সেই মানুষটি একইসাথে একজন ছাত্রী, স্ত্রী ও তিন সন্তানের মা। ক্ষীণকায়, ছোটখাট সেই মানুষটির নাম আফিয়া সিদ্দিকী।

আমি খুব করে চাই এ মানুষটির গল্প আপনারা শুনুন! তার গল্প আমার হৃদয়ে নাড়া দিয়েছে, তাই আমি চাই আপনারাও উপলব্ধি করুন কেন এই মানুষটির গল্প আমাকে প্রভাবিত করেছে। যারা তাকে চেনেন তারা জানেন, ইসলামের জন্য আফিয়া খুব সহজভাবে এবং অনায়াসে যে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও খুব অল্প কিছু মানুষই এমন ত্যাগ স্বীকার করার সৎসাহস দেখায়।

আফিয়া ছিলেন ছোটখাট, শান্ত, ভদ্র এবং লাজুক এক নারী। হৈ-হুল্লোড় কিংবা সভাসমাবেশে খুব কমই তিনি মানুষের চোখে ধরা দিতেন। কিন্তু, প্রয়োজনের সময় তিনি ঠিকই সাড়া দিতেন, আর যে কথাগুলো বলা প্রয়োজন সেগুলোই সবাইকে বলতেন। একবার বসনিয়ার এতিম শিশুদের জন্য তহবিল সংগ্রহের দরকার পড়ল, সেখানে স্থানীয় এক মসজিদে আফিয়া তার বক্তৃতায় কড়া ভাষায় পুরুষদের তিরস্কার করলেন। পুরুষ হয়ে কেন তারা বসে আছে আর নারী হয়ে আফিয়াকে তহবিল সংগ্রহের কাজ করতে হচ্ছে? তিনি সবার কাছে আর্তি জানালেন, "পুরুষরা কোথায়? আমাকে আজকে কেন একা দাঁড়িয়ে এসব কাজ করতে হচ্ছে?" তিনি ঠিকই বলেছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে একজন মা, স্ত্রী এবং ছাত্রী। আর তার চারপাশে ছিল এমন সব পুরুষ, ইসলামের কাজের কথা উঠলেই যাদের আর দেখা পাওয়া যেত না।

MIT'র ছাত্রী থাকাকালীন সময়ে আফিয়া স্থানীয় মুসলিম কারাবন্দীদের কাছে কুরআনের কপি ও ইসলামী বইপত্র গাড়িতে করে পৌঁছাবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি স্থানীয় মসজিদে বইগুলোকে আনিয়ে নিতেন। তারপর ভারি বইগুলো বাক্সবন্দী করে মসজিদের খাড়া সিঁড়ি ভেঙে পুরো তিনতলা পাড়ি দিয়ে নিজ হাতে সেগুলো জেলে জেলে পৌঁছে দিতেন। সুবহানআল্লাহ, আল্লাহর কি ক্বাদার: যেই মানুষটি মুসলিম কারাবন্দীদের সাহায্য করতে নিজে এত সময় আর

শ্রম ব্যয় করেছেন সেই তিনি নিজেই আজ একজন কারাবন্দী (আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করি যেন তিনি মুক্ত হতে পারেন)!

ইসলামের প্রতি তার একনিষ্ঠতা ক্যাম্পাসেও স্পষ্টভাবে চোখে পড়ত। বোস্টন ম্যাগাজিনের ২০০৪ সালের একটি প্রবন্ধ উল্লেখ করেছে, "... যারা মানুষকে ইসলামের শিক্ষা দেয়, তাদের জন্য আফিয়া তিনটি গাইড লিখেছেন। গ্রুপের ওয়েবসাইটে তিনি শিক্ষা দিতেন কীভাবে একটি দা'ওয়াহ টেবিল পরিচালনা করতে হয়, কীভাবে স্কুলের ইনফরমেশন বুথগুলোকে কাজে লাগিয়ে মানুষকে ইসলামের শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তাদেরকে ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা যায়।" সেই প্রবন্ধটি আফিয়ার গাইডের কিছু কথা উদ্ধৃত করেছে। তিনি সেখানে লিখেছিলেন,

> *"ভেবে দেখুন! আমাদের এই বিনম্র কিন্তু আন্তরিক দা'ওয়াহর প্রচেষ্টা থেকেই একটি সুবিশাল দা'ওয়াহ আন্দোলন জন্ম নিতে পারে! একটু ভেবে দেখুন! আর এই আন্দোলনের হাত ধরে যারা ইসলাম গ্রহণ করবে, তাদের সকলের পুরস্কার আমাদের খাতাতেও জমা হবে! বৃহৎ পরিসরে চিন্তা করুন এবং বড় পরিকল্পনা হাতে নিন। আল্লাহ ﷻ যেন আমাদেরকে শক্তিশালী করেন এবং কাজে আন্তরিকতা ঢেলে দেন যাতে করে আমাদের এই বিনম্র প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে, এবং ছড়িয়ে পড়তে থাকে যতদিন না এই আমেরিকা একটি মুসলিম দেশে পরিণত হয়।"*

আল্লাহু আকবর... তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা দেখুন! ... তার আকাশ-ছোঁয়া আশা আর পাহাড়সম স্বপ্ন! পুরুষ হয়ে যদি এক নারীর কাছে এমন স্বপ্ন দেখা শিখতে হয় তবে তো আমাদের লজ্জা পাওয়া উচিত।

তিনি প্রত্যেক সপ্তাহে রবিবারে তার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়তেন স্থানীয় মুসলিম শিশুদের ক্লাস নিতে। এক বোন থেকে জানতে পারি, প্রতি সপ্তাহে আফিয়া গাড়ি নিয়ে বের হতেন এবং নও মুসলিমদের একটি ছোট্ট দলকে তিনি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির উপর শিক্ষা দিতেন। আফিয়ার ক্লাস করতেন এমন এক বোন বলেন, "তিনি নিজে যেমন, তেমনই থাকতেন, বিশেষ কিছু করে কারো নজরে আসতে চাইতেন না বা বিশেষ কারো সাথে বন্ধুত্ব পাতানোর ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন না। তিনি স্রেফ আমাদের কাছে আসতেন এবং আল্লাহ সম্পর্কে আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন। অথচ ইংরেজি তার মাতৃভাষাও ছিল না!"

আফিয়ার হালাক্বায় (ক্লাস) অংশ নিতেন এমন আরেক বোন বলেন, “আফিয়া আমাদেরকে বলতেন, মুসলিম পরিচয় নিয়ে আমাদের লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই। তিনি বলেছিলেন, “দুর্বলদের প্রতি আমেরিকানদের কোনো সম্মান নেই। যদি আমরা উঠে দাঁড়াই এবং শক্তিশালী হই, তখন তারা আমাদেরকে ঠিকই সম্মান দেখাবে”।”

আল্লাহু আকবর ... হে আল্লাহ, আমাদেরকে এই বোনকে মুক্ত কর!

কিন্তু এসব কিছুর মাঝেও আফিয়ার সবচেয়ে বেশি অনুরাগ কাজ করত বিশ্বের নানা প্রান্তের শোষিত ও নিপীড়িত মুসলিমদের প্রতি। বসনিয়ায় যখন যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ল, তিনি তখন পায়ের উপর পা তুলে বসে থাকেননি। বরং, তিনি তৎক্ষণাৎ হাতের কাছে যা পেয়েছেন তা নিয়ে সাধ্যের মধ্যে কিছু একটা করার চেষ্টা করেছিলেন। সারাদিন ঘরে বসে বসনিয়া গিয়ে ব্যাপক ত্রাণ কার্যক্রম চালাবার মতো আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখার মানুষ আফিয়া ছিলেন না। বরং তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং তাই করলেন যা তার সাধ্যে আছে: মানুষের সাথে কথাবার্তা বলে তাদেরকে বসনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলেন, ডোনেশন যোগাড় করলেন, ই-মেইল করলেন, স্লাইডশো-তে বসনিয়ার অবস্থা উপস্থাপন করে সবার মাঝে সচেতনতা তৈরি করার চেষ্টা করলেন। আমি যেটা বলতে চাচ্ছি তা হলো, আফিয়া চোখে আঙ্গুল দিয়ে সবাইকে একটা জিনিষ দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে, যদি আমরা আমাদের নিপীড়িত ভাই-বোনদের জন্য কিছু একটা করতে চাই, আমাদের কিছু-না-কিছু অবশ্যই করার থাকবে। নিদেনপক্ষে, যারা অজ্ঞ, তাদের মধ্যে আমরা সারা বিশ্বের মুসলিম ভাই-বোনদের উপর কী ঘটে চলেছে সে ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারি।

হাত গুটিয়ে পেছনে পড়ে থাকা কোনো কাজের কথা নয়। একবার আফিয়া স্থানীয় মসজিদে বসনিয়ার এতিম শিশুদের জন্য সাহায্য চেয়ে বক্তব্য রাখছিলেন। তার কথা শুনে শ্রোতাদের তেমন কোনো ভাবাবেগ হলো না, তারা তার কথা শুনে স্রেফ বসেই ছিল। তখন আফিয়া জিজ্ঞেস করলেন: “এইরুমে যতজন মানুষ আছে, তাদের ক’জনের একজোড়ার বেশি জুতো আছে?” রুমের প্রায় অর্ধেক মানুষ হাত তুলল। তিনি বললেন, “তো আপনারা এগিয়ে আসুন বসনিয়ার শিশুদের জন্য! যারা একটি কঠিন শীত পার করতে যাচ্ছে!” তার আর্তি এতটাই জোরালো ছিল যে, মসজিদের ইমাম পর্যন্ত তার জুতোজোড়া খুলে দান করে দেন!

ইসলামের জন্য এ নারীর তীব্র আবেগ আর ভালোবাসার গল্পের আরো অনেকটুকু আছে। তবে আফিয়া কেমন ছিলেন তা বোঝার জন্য উপরের উদাহরণগুলোই যথেষ্ট এবং আশা করি নারী হিসেবে তার ত্যাগের যে গল্প তা বোনদের আগে ভাইদেরকে নাড়া দেবে, তাদেরকে ইসলামের সেবায় যা-কিছু-আছে তাই নিয়ে নেমে পড়তে অনুপ্রেরণা যোগাবে। মনে রাখবেন, তিনি তার সব কিছু ঢেলে দিয়েছিলেন এমন একটা সময়ে, যখন তিনি ছিলেন একজন মা এবং একজন পিএইচডি ছাত্রী। আর আমাদের হাতে আরো বেশি সময় থাকা সত্ত্বেও তার কাছাকাছিও কিছু করছি না।

আফিয়ার এ প্রতিচ্ছবিকে মনের মধ্যে গেঁথে যখন আমি আদালতের শুনানিতে আফিয়াকে দেখতে পেলাম তখন আমি হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। আদালতকক্ষের সামনের বামের দরজাটা হালকা করে খুলে যাওয়ার পর নীল হুইলচেয়ারে বসা দুর্বল, নিস্তেজ, প্রবল-পরিশ্রান্ত এক নারী আমাদের সবার সামনে উপস্থিত হলো। তিনি তার মাথাটি সোজা করে ধরেও রাখতে পারছিলেন না। তার পরনে ছিল গুয়ানতানামো ধাঁচের কমলা কারাপোশাক, আর তার মাথা মোড়ানো সাদা হিজাবে, যেটা দিয়ে তার অস্থিসার হাতদুটো ঢাকা (কারাগারের ইউনিফর্মে হাতাকাটা থাকে)। তার উকিল দ্রুত তাঁর কাছে গিয়ে বসার পর জামিনের জন্য শুনানি শুরু হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের কুশলি, সহকারী ইউএস এটর্নি ক্রিস্টোফার লাভিন, তিন-চারজন এফবিআই এজেন্টকে সাথে নিয়ে হেঁটে আসলেন। তাদের মধ্যে এক মহিলা ছিল যাকে পাকিস্তানীর মতো দেখাচ্ছিল (আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক এই দালালের প্রতি)। আত্মপক্ষ সমর্থন করে বিবাদী উকিল বললেন, জামিনের আবেদনের শুনানি দেরি হবার কারণ হলো আফিয়ার শরীরের করুণ হাল। আফিয়ার উকিল মূলত বলতে চাইলেন, আফিয়ার এ মুমূর্ষু অবস্থায় জামিন নয়, বরং সবকিছুর আগে তাকে ডাক্তার দেখানোর ব্যবস্থা করা হোক। লাভিন উঠে দাঁড়িয়ে আপত্তি জানাল, বলল আফিয়া আমেরিকা নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ। বিচারক সে কথা খুব একটা আমলে নিলেন মনে হলো না। ফলে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলে চললেন, "এ এমন এক নারী যে বন্দী অবস্থায় বোমা ফাটিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে"। একথা শুনেই আমি আফিয়াকে দেখলাম এবং লক্ষ করলাম আফিয়া খুব হতাশা আর কষ্ট নিয়ে মাথা ঝাঁকাচ্ছেন, যেন সমস্ত পৃথিবী তার বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, আফিয়া ছিলেন খুব ছোটখাট আর তিনি এতটাই নুয়ে পড়েছিলেন, আমি কেবল তাকে পেছন থেকে হুইলচেয়ারে বসে থাকা অবস্থায় সামান্যই দেখতে পাচ্ছিলাম। আমি শুধু এতটুকুই দেখেছি তার

মাথা বাম দিকে ঝুঁকে পড়েছে, হিজাবে তার মাথা মোড়ানো এবং ডান হাত বের হয়ে আছে।

তিনি কেন এতটা মনোকষ্টে জর্জরিত আর বিষাদগ্রস্ত ছিলেন তা আমি বুঝতে পেরেছি যখন তার উকিল তার শারীরিক অবস্থা বিশদভাবে তুলে ধরলেন:

- আমেরিকার তত্ত্বাবধানে থাকাকালীন সময় থেকে তার ব্রেইন ড্যামেজ হয়েছে।
- আমেরিকান সরকারের অধীনে থাকাকালীন সময়ে তার একটি কিডনী সরিয়ে ফেলা হয়েছে।
- তিনি খেতে পারছেন না কেননা অপারেশনের সময় তার অন্ত্রের কিছু অংশ সরিয়ে ফেলা হয়েছে, এটিও ঘটেছে আমেরিকান প্রহরায়।
- গুলিবিদ্ধ স্থানের সার্জারি করতে গিয়ে তার শরীরে প্রলেপের পর প্রলেপ জুড়ে সেলাই করা হয়েছে।
- তার শরীরে বুক থেকে শুরু করে পুরো ধড় জুড়ে অস্ত্রোপচারের বিশাল ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে।

এ সব যন্ত্রণা নিয়ে আমেরিকায় কারারুদ্ধকালীন পুরো সময়জুড়ে তাকে একবারও ডাক্তার দেখানোর সুযোগ দেওয়া হয়নি। আফগানিস্তানে তার অযত্ন-অবহেলায় অপারেশনের পর তার পেটে অবিরত অসহ্য ব্যথা হওয়ার পরেও না। বরং এই ব্যথার জন্য তাকে দেওয়া হয়েছে আইবোপ্রোফেন নামের একটি ব্যথানাশক ঔষধ, যেটা কিনা লোকে খায় মাথাব্যথার জন্য!

এসব কিছুর পরেও, সরকারপক্ষের আইনজীবী বেহায়া এবং নির্লজ্জের মতো তাকে ডাক্তার দেখানোর সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখার আস্পর্ধা দেখিয়ে গেলেন, যুক্তি দেখিয়ে চললেন আফিয়া নাকি "নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ"। যখন বিচারক তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন আফিয়াকে এভাবে একদম প্রাথমিক চিকিৎসা থেকেও বঞ্চিত রাখা হলো, তখন এটর্নি সাহেব তোতলাতে শুরু করলেন এবং বললেন, "আসলে তখন পরিস্থিতি খুব জটিল আকার ধারণ করেছিল", এবং নিজেদের দোষ ঢাকার জন্য প্রত্যাশিতভাবেই অত্যন্ত সস্তা একটা কুযুক্তি ধার করলেন, "এটি আফিয়ার নিজের সিদ্ধান্ত যে তিনি পুরুষ ডাক্তারের কাছে নিজেকে দেখাতে চাননি"। আইনজীবী যখনই একথা বললেন, আফিয়া তাঁর জীর্ণশীর্ণ হাত তুলে অতিকষ্টে ডানে-বামে নেড়ে যেন বিচারককে বলতে চাইলেন, "না! সে মিথ্যে বলছে!"। আমার খুব কষ্ট লাগলো।

চোখের সামনে এভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ঝুরি ঝুরি মিথ্যা বলতে দেখে আফিয়ার চেহারায় প্রচণ্ড হতাশার ছাপ দেখা দেয়। তার আইনজীবী তখন তার কাছে গিয়ে তার হাতটি ধরে পায়ের উপর বসিয়ে দিলেন এবং হাত বুলিয়ে তাকে শান্ত করলেন।

শুনানি যখন শেষ হলো, আমার তখন ইবন আল-কায়্যিমের ﷺ একটি সুগভীর উক্তি বারবার মনে পড়তে লাগল, তিনি বলেছিলেন, একজন বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করবে না ততক্ষণ, যতক্ষণ না, *"...শেষ প্রতিবন্ধকটি অবশিষ্ট থাকবে যা থেকে শয়তান তাকে তাড়া করে এবং বান্দাকে অবশ্যই এই প্রতিবন্ধকের মোকাবেলা করতে হবে। যদি কেউ এই বাধা থেকে রক্ষা পায় তাহলে তারা হলেন আল্লাহর নবী এবং রাসূলগণ, যারা সৃষ্টির সেরা। এটি হলো শয়তানের সেই প্রতিবন্ধকতা যেখানে শয়তানের বাহিনী মু'মিন বান্দার উপর চড়াও হবে এবং বিভিন্ন প্রকারে তার ক্ষতিসাধন করে: হাত, জিহবা এবং অন্তর দ্বারা। ঈমানের মাত্রা অনুযায়ী এই পরীক্ষার মাত্রাও ভিন্ন হবে। বান্দার ঈমান যত বেশি হবে, শত্রু তত বেশি করে তার বাহিনীকে বান্দার বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে ও পৃষ্ঠপোষকতা করবে। শয়তান তার অনুসারী ও মিত্রদের সহযোগিতায় বান্দাকে গুড়িয়ে দিতে চাইবে। এই বাধাকে এড়িয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, কেননা আল্লাহর দিকে আহবানে সে যত দৃঢ়তার পরিচয় দিবে এবং আল্লাহর অর্পিত আদেশ পালনে ব্রতী হবে, শয়তান ততবেশি করে মূর্খলোকদের মাধ্যমে তাকে ধোঁকা দিতে তৎপর হবে। কাজেই, যে বান্দা তার শরীর ঈমানের বর্মে আচ্ছাদিত করে আল্লাহর রাহে, আল্লাহর নামে শত্রুকে মোকাবেলা করার দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিল, তার এই ইবাদাতই হলো, সকল ইবাদাতের মাঝে শ্রেষ্ঠ ইবাদত"।*

ইবন আল-কায়্যিম এর এই কথাগুলো আদালতের সেই দৃশ্যে পরিষ্কারভাবে আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে। আদালতে আফিয়ার শরীরে দুর্বলতা আর নাজুকতার ভাব থাকলেও, সারাটা সময় জুড়ে আমি তার মধ্যে সুস্পষ্ট সম্মান ও শক্তির একটি ছাপ দেখতে পাচ্ছিলাম। আদালতে তার সবকিছু, আইনজীবীর মিথ্যা অভিযোগে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ;যে হিজাবের কথা এ ধরনের ভয়ানক পরিস্থিতিতে বেশিরভাগ মানুষের মনেই থাকার কথা না, আদালতকক্ষে সে হিজাবে নিজেকে আবৃত রাখার প্রতি তীক্ষ্ণ মনোযোগ;আদালত কক্ষে এফবিআই এজেন্ট, ইউএস মার্শাল, রিপোর্টার, অফিসিয়াল-সকলের এই নুয়েপড়া-দুর্বল-ছোটখাট-শান্তদর্শন এই মহিলার দিকে ভয়ার্ত চোখে চেয়ে থাকা - এ সব কিছু একটা জিনিস নির্দেশ করে, আর তা হলো এদের সবাই আফিয়ার একটি

জিনিসকে নিয়েই শঙ্কিত আর ভীতসন্ত্রস্ত আর সেটি হলো আমাদের এই বোনের ঈমান।

এই হলো আমাদের প্রিয় বোনের অবস্থা, কুফফারদের হাতে বন্দি এক মুসলিম নারী ... কী বলার আছে আমার ...?

মুসলিম বন্দী মুক্ত করার ওয়াজিব দায়িত্বের কথা বলে আমি আমার এ লেখা শেষ করব না। আমি খলিফা আল-মু'তাসিমের উদাহরণ টেনে এনে বলব না দেখুন তিনি কেবল একজন মুসলিম নারীকে উদ্ধার করার জন্য একটা শহর ধসিয়ে দিয়েছিলেন। আমি সালাহ্ আদ-দীন কিংবা 'উমার বিন 'আবদ আল-'আযীয এর কথা আপনাদেরকে শোনাব না যারা কিনা হাজার হাজার মুসলিম বন্দীদের উদ্ধার করেছিলেন। এ চমৎকার গল্পগুলো আপনাদের সামনে বলার লোভ আজকে আমাকে সংবরণ করতে হবে। কেন জানেন? কারণ, দুঃখের কথা এই নয় যে আফিয়া বন্দী। বরং দুঃখের কথা হলো, পাঁচ লক্ষ মুসলিমের শহরে মাত্র অল্প কিছু মুসলিমও আফিয়ার শুনানির দিনে উপস্থিত থাকার কাজটাকে ঝামেলার ব্যাপার মনে করে নিজের গা বাঁচাতেই বেশি আগ্রহী। দুঃখ হলো এই, পুরো আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একটি মুসলিম সংগঠন এই বোনটির পক্ষে এগিয়ে আসল না, তার পক্ষে একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। ইবন আল-কায়্যিম ঠিকই বলেছিলেন,

> *"যদি গীরাহ (উম্মাহকে আগলে রাখার প্রবল ঈর্ষা) মানুষের হৃদয় ত্যাগ করে চলে যায়, তবে সে হৃদয় থেকে ঈমানও হারিয়ে যায়।"*

দুর্ভাগ্যজনকভাবে এমন একটা সময়ে যখন আমাদের বেশিরভাগই *দ্বীন আল-'আরবের* অনুসারী হয়ে কেবল নামায-রোযা নিয়েই পড়ে আছে, তখন আফিয়া সিদ্দিকীকে কিভাবে সাহায্য করা যেতে পারে, সে শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে উপযুক্ত শিক্ষক হতে পারতেন একমাত্র আফিয়া নিজেই।

এবং আল্লাহই উত্তম সাহায্যকারী।

তারিক মেহান্না

"IUGULA, VERBERA, URE!"

ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও প্রভাবশালী সমাজ হচ্ছে প্রাচীন রোম। এমনকি এর পতনের ১৬ শতক পরেও এর আইন, সাহিত্য ও দর্শনের প্রভাব বিশ্বের অধিকাংশ অঞ্চলেই এখনো বিদ্যমান।

এই রোমান সাম্রাজ্যও গড়ে উঠেছিল "বল প্রয়োগে ধ্বংস করো"- এই মতবাদের ভিত্তিতে। প্রাচীন রোমানরা তাদের নিজেদের হাতে অন্যদের নিপীড়নের মাঝে কোনো রকম বর্বরতা দেখতে পেত না। বরং এই বর্বরতা তাদের জন্য ছিল আনন্দ ও উপভোগের উৎস! বিখ্যাত রোমান কলোসিয়ামে একসাথে ৫০, ০০০-এরও বেশি মানুষ একসাথে বসে নিয়মিতভাবে munus iustum atque legitumum (ল্যাটিন; ইংরেজিতে A Proper and Legitimate Gladiator Show বা একটি সুষ্ঠু ও বৈধ গ্লাডিয়েটর প্রদর্শনী) নামক একটি প্রদর্শনী উপভোগ করতে আসতো। সারাদিন ধরে চলা এই "খেলা"গুলোকে তিনটি অংশে ভাগ করা হতো।

প্রথম অংশকে বলা হতো Venatio (বন্য প্রাণী শিকার বা "Wild Beast Hunt")। এটা সারা সকালজুড়ে চলতো। সাম্রাজ্যের সকল প্রান্ত থেকে বন্য জীবজন্তুদের রণক্ষেত্রে জড়ো করা হতো, এক এক বার একসাথে কয়েকটি করে পশু ময়দানে ছাড়া হতো। তারপর কোনো অভিজ্ঞ শিকারী এগুলোকে হত্যা করতো। কখনো কখনো পশুগুলোকেই একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে মরার জন্য ছেড়ে দেওয়া হতো। হাতি, গণ্ডার, জিরাফ, ভালুক, সিংহ, চিতা, এমনকি উটপাখি ও সারসও এনে হত্যা করা হতো। আর এসবের উদ্দেশ্য ছিল শুধুমাত্র মানুষের মনোরঞ্জন। চিত্তবিনোদনের খোরাক হিসেবে গড়ে ১০, ০০০ প্রাণী প্রতিবছর এভাবে জীবন দিত।

দিনের প্রথম অংশে বন্য পশু হত্যার পর শুরু হতো দ্বিতীয় অংশ "The Ludi Meridiani" (মধ্যপ্রহরের খেলা("Midday Games"))। পশুর বদলে এই পর্বে যেত মানুষের জীবন। অপরাধী বা যুদ্ধবন্দীদের দর্শকদের সামনে ময়দানে এনে ছেড়ে দেওয়া হতো। আর দর্শকরা উল্লসিত হয়ে তাদের মরতে দেখতো। কখনো কখনো তাদেরকে আমৃত্যু একে অপরের সাথে তলোয়ার দিয়ে লড়াই করে মরতে বাধ্য করা হতো। তবে অধিকাংশ সময় তাদের সিংহ বা ভালুকের সাথে ময়দানে ছেড়ে দেয়া হতো। সেই সিংহ আর ভালুকগুলো তাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করে

ফেলত। এই খেলাগুলোর একজন সাক্ষী ও রোমান কবি, মার্শাল এমন এক বন্দীর কথা লিখেছিলেন। সেই বন্দীকে কলোসিয়ামে এনে উল্লসিত দর্শকদের সামনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

শেষ অংশটা ছিল মূল আকর্ষণ: দি গ্ল্যাডিয়েটরস। দুইজন মানুষকে আনা হতো যারা ছোরা বা তরবারির (Gladiator শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ 'Gladius, ' থেকে যার অর্থ তরবারি) সাহায্যে একে অপরের সাথে লড়াই করতো। পরাজিত জন তার বাম হাতের তর্জনী উঁচিয়ে হার স্বীকার করে নিত। দর্শকরা তখন তার ভাগ্য নির্ধারণ করতো হয় "Missus!" (বের করে দাও! (Dismissal)) কিংবা "Lugula, Verbera, Ure!" (কাটো! মারো! পুড়িয়ে দাও! (Slit his throat, beat him, and burn him)) বলে। অধিকাংশ গ্ল্যাডিয়েটররা ছিল দাস তবে রোমান ঐতিহাসিক Suetonius লিখেছেন যে, যেসব কর্মীরা অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে থাকতো তারা কোনো ভুল করলেও সম্রাট তাদের ময়দানে নেমে আমৃত্যু লড়তে বাধ্য করতেন।

জীবনের প্রতি তাদের বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই এইরকম পাশবিকতা আর সংজ্ঞাহীন বর্বরতা প্রাচীন রোমের নাগরিকদের আনন্দের একটি উৎস ছিল। এটি এখনো আধুনিক পশ্চিমা (আমেরিকান ও ইউরোপিয়ান) সংস্কৃতির ভিত্তি বলে বিবেচিত হয়। কারণ তারাও জীবনকে শুধুই একটা ভোগের বিষয় হিসেবে দেখে। তারা কোনোরকম আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের ধার ধারে না। এই মানসিকতা পশ্চিমা সমাজ আজও ধরে রেখেছে। গত শতাব্দী থেকে তা প্রকাশ পায় তাদের উত্তরোত্তর নিষ্ঠুরতর হওয়া পররাষ্ট্রনীতির মাধ্যমে। এই নীতির মূল বিষয়বস্তু হলো অপরের শোষণ ও অত্যাচার। আর এ দুটিই সমান গতিতে চলে।

রোমানদের উত্তরাধিকারী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও খুব একটা ভিন্ন ছিল না। ব্রিটিশরা তাদের নব নব সংযুক্ত উপনিবেশগুলোকে কাজে লাগিয়ে এদের বসবাসকারীদের শোষণ এবং ক্ষতিসাধনের মাধ্যমে নিজেদের ঠাঁটবাট বজায় রাখতো। উদাহরণ হিসেবে ইন্ডিয়াকেই দেখা যাক; ব্রিটিশরা একে ছেড়ে যাবার সময় এটা অনেকটা বিবর্ণ লাশের মতো অবস্থায় ছিল। একগাদা মানুষ ও অর্থনৈতিক ধ্বংসাবশেষের বোঝায় ন্যুব্জ একটি ভূখণ্ড। এমনকি স্বাধীনতার আগমুহূর্তেও চার্চিল গান্ধীকে একজন "naked little fakir" [fakir: ফকির বলতে মুসলিম (বা ক্ষেত্রবিশেষে হিন্দু) ধর্মীয় তপস্বী বোঝায় যে শুধুই দান-দক্ষিণায় চলে] বলে সম্বোধন করার ঔদ্ধত্য দেখায়। অথচ তখনও গান্ধী ইংরেজদের জেলে বন্দী ছিলেন।

পশ্চিমা ঔপনিবেশিকতার অন্যান্য স্থপতিদের ক্ষেত্রেও একই কথা সত্য। স্প্যানিশ, পর্তুগীজ, বেলজিয়ান, ফ্রেঞ্চ বা ইটালিয়ান – সবার সাম্রাজ্যই প্রসারিত হয়েছিল শোষণ এবং হত্যার মাধ্যমে। ক্ষমতা ধরে রাখতেও তারা একই কাজ করতে থাকে। লিবিয়ায় প্রাচীন রোমানদের সরাসরি বংশধর ইতালির দখলদারিত্বের সময় দেশটির জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ মানুষ মারা যায়। ইতালিয়ানরা গ্রামের বয়স্কদের ধরে নিয়ে গিয়ে প্লেনে তুলে প্লেন আকাশে ওড়ার পর ওপর থেকে ফেলে দিত। (পরবর্তী সময়ে আমেরিকানরা ভিয়েতনাম যুদ্ধে এবং রাশিয়ানরা আফগানিস্তানে একই কাজ করেছিল)।

আমি এই কথাগুলো লিখছি ম্যাসাচুসেটস রাজ্যের প্লাইমাউথ শহরে বসে। এই শহরটি কিন্তু সবসময় শুধু ইংরেজিভাষী সাদা চামড়াধারীদের দ্বারা শাসিত হয়নি।

একই কথা প্রযোজ্য এই রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে যাকে মারটিন লুথার কিং জুনিয়র "পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতার সবচেয়ে বড় কাণ্ডারী" বলে সম্বোধন করেছেন। আমেরিকা, যার যুদ্ধাস্ত্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অনিয়মিতভাবে লাখ লাখ নিরীহ ও নিষ্পাপ মানবজীবনের অবসান ঘটিয়ে চলেছে – জাপান, ভিয়েতনাম, ইরাক, পানামা, আফগানিস্তান বা অন্য কোথাও – সবই করেছে সে তার বৈশ্বিক আধিপত্য বজায় রাখার জন্য (দুঃখিত, বলা উচিত স্বাধীনতা ছড়ানোর জন্য!)।

প্রাচীন রোমের পররাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি ও নাগরিকদের চর্চিত মানসিকতার সরাসরি সম্পর্ক ছিল। কলোসিয়ামে হওয়া এই খেলাগুলো শুধুই অপরিকল্পিত বিনোদন ছিল না, প্রত্যেকটা খেলা দর্শকদের জন্য এক একটি প্রতীকী অর্থ ধারণ করতো। Venatio-তে বন্য জন্তু হত্যা প্রতিনিধিত্ব করতো কীভাবে রোম দূরবর্তী বন্য এলাকাসমূহ জয় করেছে; রাষ্ট্রবিরোধী শক্তি হিসেবে পরিচিত জনগোষ্ঠীর প্রতি সংঘটিত নিষ্ঠুরতাকে LudiMeridiani-তে মানুষ হত্যার মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো। অন্যভাবে বলতে গেলে স্টেডিয়ামটা তাদের সমগ্র সাম্রাজ্যেরই একটা Microcosm বা সংক্ষিপ্ত রূপ ছিল। একটি যেন আর একটির দর্পণ প্রতিবিম্ব। কেউ একজন ক'দিন আগে আমাকে লিখা এক চিঠিতে তার পর্যবেক্ষণ থেকে লিখেছিল, অন্যের ক্ষতি করে নিজের উন্নয়ন আমেরিকান সমাজের একটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য। স্কুলগুলোতে *বুলিইং* (Bullying: অপেক্ষাকৃত উচ্ছৃঙ্খল ছাত্র/ছাত্রীদের দ্বারা অহেতুক নিরীহ/দুর্বল ছাত্রছাত্রীদের হেনস্থা করা) এর মাত্রা, খেলাধুলার নামে বর্বরতা/নির্মমতাকে উৎসাহ প্রদান, টিভিতে রিয়েলিটি শো গুলোর মাধ্যমে মিথ্যা, প্রতারণা ও চুরিকে মহিমান্বিত করার চর্চার মধ্যেই এই বৈশিষ্ট্যটি প্রকট। আইন ব্যবস্থার অসৎ প্রকৃতির দিকে তাকান যা মানুষের

জীবনকে শুধু আইনের সাথে সংশ্লিষ্টদের পদোন্নতি ও ক্রমবর্ধমান আইন প্রয়োগকারী বাজেট বানানোর উপকরণে পরিণত করেছে। ওয়াল স্ট্রীটের দুর্নীতি দেখুন;ফ্রেডি ম্যাক এর মতো কত বন্ধকের দালাল নিজেদের ক্লায়েন্টদের ক্ষতি করার জন্যই বিনিয়োগ করেছে। সেনাবাহিনীর দিকে তাকান;এইতো কয়েকদিন আগে পেন্টাগন এর পরিসংখ্যানে এসেছে যে, পুরুষ সৈন্যদের দ্বারা নিজ সেনাবাহিনীরই মহিলা সৈন্য ধর্ষিত হবার ঘটনা ৩০% বৃদ্ধি পেয়েছে। নিজেদের সহযোদ্ধাদের দ্বারাই! তারা নিজেদের সাথেই যদি এমন আচরণ করে তো আবির জানাবিদের সাথে কীরকম আচরণ করেছিল তা সহজেই অনুমেয়। এমনকি একজনের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পথেও অন্যকে আক্রমণ ও অনিষ্ট সাধন জড়িয়ে থাকে–এক একজন প্রার্থী টিভিতে বিজ্ঞাপনের পিছে কোটি কোটি ডলার খরচ করে শুধু তার প্রতিপক্ষকে লাঞ্ছিত করে প্রতিদ্বন্দ্বীর মর্যাদাহানি করার জন্য। এই যদি হয় তাদের নিজেদের মধ্যেই একে অপরের প্রতি আচরণ তাহলে চিন্তা করুন ‘অন্য’দের প্রতি কেমন হবে তাদের আচরণ!

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তাদের এই মানসিকতার প্রতি খেয়াল করুন। দেখতে পাবেন যে, উভয় ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি সাধারণ যোগসূত্র রয়েছে। আর এই সাধারণ মূলনীতিটি হচ্ছে: ব্যক্তিগত স্বার্থোদ্ধারের জন্য যা প্রয়োজন তা-ই করুন, যদি তা অন্যের ক্ষতি করা বোঝায় তবে তাই। প্রাচীন রোমের সেই কলোসিয়াম ছিল সমস্ত রোমান সাম্রাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত রূপ। আর বর্তমান যুগে তাদের উত্তরসূরীদের জন্য সতর্কবার্তা এই যে সমাজের সর্বস্তরে এই বস্তুবাদী মানসিকতা ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতাই ছিল তাদের সাম্রাজ্যের পতনের মূল কারণ।

তারিক মেহান্না
বৃহস্পতিবার, ৯ রবিউল আউয়াল ১৪৩৩
ফেব্রুয়ারি ২, ২০১২

১০ মুহাররাম: একটি সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতা

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

দেয়ালে ঝুলে থাকা হিজরি ক্যালেন্ডারটি মনে করিয়ে দিচ্ছে আজকে মুহাররামের দশ তারিখ। হিজরি ১৪৩৪ সাল।

ইতিহাসের পাতায় ভর করে চলে গেলাম ১৪৩৩ বছর আগের ঠিক এই দিনে। মদীনাতে সেদিন একটি ছোট কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ কথোপকথন হয়। বিখ্যাত সাহাবা এবং 'আলিম আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﵁ বর্ণনা করেন যে, তাঁর চাচাতো ভাই অর্থাৎ শেষ নবী ও আল্লাহ কর্তৃক মানবজাতির কাছে প্রেরিত শেষ রাসূল, মুহাম্মাদ ﷺ একদল ইহুদির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা ঐদিন রোযা পালন করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের কাছে জানতে চান তারা কেন রোযা পালন করছিল। তারা উত্তরে জানালো, "এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ একটা দিন। এই দিনে আল্লাহ ﷿ তাঁর নবী মূসা ﵇ ও তাঁর সম্প্রদায়কে ফির'আউন ও তার লোকজনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাই মূসা ﵇ আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এই দিনে রোযা রাখতেন। তাই আমরাও এইদিনে রোযা রাখি।"

অন্য বর্ণনায় এসেছে, "এই দিনে আল্লাহ মূসা ﵇ ও বনী ইসরাঈলকে ফির'আউনের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, **"মূসা ﵇ এর ওপর তোমাদের চাইতে আমরা বেশি হক্বদার।"**

এই সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতাটি ভালো-বনাম-মন্দ, ঈমান-বনাম-কুফরের চিরায়ত দ্বন্দ্বের দিকে নির্দেশ করে। আজকের এই দিনে পৃথিবীর সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমার উপলব্ধি হলো, এ লড়াইয়ের এখনও শেষ হয়নি। আমার মাথায় কিছু ভাবনার জন্ম হলো, সেগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরছি:

ক. ইতিহাসের বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটে:

প্রায় হাজার বছর আগে বনী ইসরাঈল ছিলো এক অত্যাচারিত, নিপীড়িত জাতি। তারা পৃথিবীর সবচাইতে শক্তিশালী স্বৈরশাসকের অধীনে বাস করত। তাদেরকে এই দাসত্ব থেকে মুক্ত করে মুক্তির দিকে ধাবিত করার লক্ষ্যে আল্লাহ মূসা ﵇ কে পাঠান। আল্লাহ ﷿ হাজার হাজার নবী দুনিয়ার বুকে প্রেরণ করেছেন, মূসা ﵇

ছিলেন তাদেরই একজন। আল্লাহ নবীদেরকে পাঠিয়েছেন মূলত তিনটি বিষয়ের উপর শিক্ষা দিতে।

- মহাবিশ্ব এবং এতে যা কিছু আছে সব কিছুর একমাত্র সৃষ্টিকর্তা হলেন আল্লাহ ﷻ ।
- সুতরাং আমরা কেবলমাত্র তাঁরই কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করতে বাধ্য এবং আমাদের কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে। (অর্থাৎ তাওহীদ)
- তাওহীদ সঠিকভাবে প্রয়োগের পন্থা একমাত্র নবীদের শিক্ষার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়। (অর্থাৎ ইসলামে)

এজন্যই হিজরতের পর মূসা ﷺ এর সর্বপ্রথম দায়িত্ব ছিল বনী ইসরাঈলীদের কাছ থেকে এ বিষয়গুলো মেনে চলার প্রতিশ্রুতি নেওয়া। বনী ইসরাঈলের যে ছোট্ট দলটি এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিল তাদেরকে নিয়েই মূসার ﷺ যুগের মুসলিম সমাজটি গড়ে উঠে। তারা তাওহীদভিত্তিক আক্বীদার ছাঁচে নিজেদের জীবনকে গড়ে তুলতে সংকল্পবদ্ধ হয়। মূসা ﷺ তার অনুসারীদের যে তাওহীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন তা টেন কমান্ডমেন্টস (Ten Commandments) নামে পরিচিত। তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নবী-রাসূলগণ মূলত একই নীতি শিক্ষা দিয়েছিলেন। এই নবী-রাসূলদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন নূহ ﷺ, ইব্রাহিম ﷺ ও ঈসা ﷺ আর মুহাম্মাদ ﷺ ছিলেন এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ সংযোজন। তাদের সকলের শিক্ষার মূলকথা ছিল এক। যারা এই শিক্ষাকে গ্রহণ করবে, তারাই নবীগণের প্রকৃত অনুসারী। আর তাই আজকে যারা রাসূলুল্লাহকে ﷺ অনুসরণ করছে অর্থাৎ মুসলিম জাতিই এই আক্বীদা-বিশ্বাসের প্রকৃত দাবিদার, উত্তরসূরী এবং সংরক্ষক। অন্য সকল জাতি (ইহুদী, খ্রিষ্টান) এই শিক্ষাকে হয় বিকৃত করে ফেলেছে নয়তো পুরোপুরি অস্বীকার করছে। তাই আমরা মুসলিমরাই মূসা ﷺ এর যোগ্যতর উত্তরসূরী এবং সব জাতি থেকে মূসা ﷺ এর প্রতি আমাদের হক্বই বেশি। তাই রাসূল ﷺ মদীনার ইহুদীদের উদ্দেশ্যে বলেন, **"মূসা ﷺ এর ওপর তোমাদের চাইতে আমাদের হক্ব বেশি।"**

কিন্তু বনী ইসরাঈলীরা কী করেছে? তাদের উত্তরসূরীরা কেবল তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গই করেনি, তারা তাদের আসমানী কিতাবকেও বিকৃত করেছে। তারা পরবর্তী নবীদের অস্বীকার করে ক্ষান্ত হয়নি, বরং তারা নিজেরাই ফির'আউনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। মূসা ﷺ এর প্রকৃত শিক্ষার অনুসারীদের ওপরেই তারা ফির'আউনি কায়দায় নিপীড়ন চালাচ্ছে, অথচ তাদের পূর্ববর্তীদেরকে মূসা ﷺ

এই একই শিক্ষায় দীক্ষিত করে যুলুমের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। তাদের অন্যায়-অবিচারের নির্মমতা আমরা এখন প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি ফিলিস্তিন এবং অন্যান্য জায়গায়।

সুতরাং ঈমান এবং কুফরের মধ্যকার এ চিরন্তন লড়াইয়ে সকল নবী রাসূলই অংশগ্রহণ করেছেন। ইতিহাসজুড়ে খুব কম সংখ্যক মানুষই নবী-রাসূলদের পক্ষ অবলম্বন করেছে এবং তাদের আক্বীদা-বিশ্বাসকে গ্রহণ করেছিল। এই লড়াইয়ের চরিত্রগুলোই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হয়, মূল লড়াই এর গতিপ্রকৃতি একই থাকে।

খ. এই সংক্ষিপ্ত আলাপচারিতা কেবল এ সংঘাতের ইতিহাসকেই তুলে ধরে না বরং এর অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ধারণা দেয়।

বনী ইসরাঈলের প্রতি মূসা عليه السلام এর প্রতিশ্রুতিকে আল্লাহ عز وجل কুরআনে তুলে ধরেছেন এভাবে,

> "মূসা তার ক্বওমকে বললেন, সাহায্য প্রার্থনা কর আল্লাহর নিকট এবং ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই এ পৃথিবী আল্লাহর। তিনি নিজের বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এর উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেন এবং শেষ কল্যাণ মুত্তাকীদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে। তারা বলল, আমাদের কষ্ট ছিল তোমার আসার পূর্বে এবং তোমার আসার পরে। তিনি বললেন, তোমাদের রব শীঘ্রই তোমাদের শত্রুদের ধ্বংস করে দেবেন এবং তোমাদেরকে দেশে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন। তারপর দেখবেন, তোমরা কেমন কাজ কর।" [সূরা আ'রাফ, ৭: ১২৮-১২৯]

এরপর আল্লাহ বর্ণনা করেন কীভাবে তিনি যালিমদের ধ্বংসের সূচনা করেন এবং এই ধ্বংসের প্রতিশ্রুতি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করেন। তাদের ধ্বংসের সূচনা হয়েছিল অর্থনৈতিক মন্দার মাধ্যমে:

> "তারপর আমি পাকড়াও করেছি-ফির'আউনের অনুসারীদেরকে দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে এবং ফল ফসলের ক্ষয়-ক্ষতির মাধ্যমে যাতে করে তারা উপদেশ গ্রহণ করে" [সূরা আরাফ, ৭: ১৩০]

কিন্তু তারা উপদেশ গ্রহণ করেনি। বরং,

> “তারা আরও বলতে লাগল, আমাদের উপর জাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শনই নিয়ে আস না কেন আমরা কিন্তু তোমার উপর ঈমান আনছি না।” [সূরা আরাফ, ৭: ১৩২]

তারা যে শুধু উদ্ধত আচরণ করল তাই নয়, উপরন্তু তাদের সেনাবাহিনীর দৌরাত্ম্য কেবল বৃদ্ধিই পেল।

> “ফির‘আউন ও তার বাহিনী অন্যায়ভাবে পৃথিবীতে অহংকার করতে লাগল এবং তারা মনে করল যে, তারা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না।” [সূরা ক্বসাস, ২৮: ৩৯]

এবার আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ তাদেরকে তাদের রাজত্বের অবশ্যম্ভাবী পতনের দিকে নির্দেশ করে আরো পাঁচটি সতর্ককারী নিদর্শন দিয়ে জবাব দিলেন। মজার ব্যাপার হলো এই নিদর্শনগুলোর প্রথমটি ছিলো একটি বন্যা।

> “সুতরাং আমি তাদের উপর পাঠিয়ে দিলাম বন্যা ...” [সূরা আল-আরাফ, ৭: ১৩৩]

কিন্তু এরপরও তাদের অবিশ্বাস এবং ঔদ্ধত্য অব্যাহত রইল। অবশেষে একসময় তাদের অত্যাচারী শাসন শেষ হলো, মদীনার ইহুদীদের ভাষায়, “আল্লাহ তাঁর নবী মূসা ও তাঁর সম্প্রদায়কে ফিরআউন ও তার লোকজনের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন এবং ফিরআউন ও তার লোকজনকে ডুবিয়ে মেরেছিলেন।” আল্লাহ নিজেও এই ঘটনা কুরআনে বর্ণনা করেছেন,

> “সুতরাং আমি তাদের কাছে থেকে বদলা নিয়ে নিলাম-বস্তুতঃ তাদেরকে সাগরে ডুবিয়ে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং তার প্রতি অনীহা প্রদর্শন করেছিল। আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা হতো তাদেরকেও আমি উত্তরাধিকার দান করেছি এ ভুখণ্ডের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের যাতে আমি বরকত সন্নিহিত রেখেছি এবং পরিপূর্ণ হয়ে গেছে তোমার পালনকর্তার প্রতিশ্রুত কল্যাণ বনী-ইসরাঈলদের জন্য তাদের ধৈর্যধারণের দরুন। আর ধ্বংস করে দিয়েছে সে সবকিছু যা তৈরী করেছিল ফির‘আউন ও তার সম্প্রদায় এবং ধ্বংস করেছি যা কিছু তারা সুউচ্চ নির্মাণ করেছিল।” [সূরা আরাফ, ৭: ১৩৬-১৩৭]

প্রতাপশালী ফির'আউন এককালে নিজেকে পৃথিবীতে ইলাহ হিসেবে দাবী করতো। কিন্তু শেষকালে তার সাম্রাজ্যের পতন, রোমান সাম্রাজ্যের ব্যাপারে আর্থার ফেরিলের সেই তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যটি মনে করিয়ে দেয়:

"রোমান সাম্রাজ্য সম্পর্কে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এটাই যে রোমান সাম্রাজ্য অধঃপতিত হতে হতে একসময় ধ্বংস হয়ে যায়।"

এটি এক কালোত্তীর্ণ সত্য। তাওহীদের অস্বীকারকারী এবং তাওহীদবাদীদের বিরোধিতাকারী প্রতিটি জাতি, সমাজ এবং ব্যক্তির ক্ষেত্রেই তথ্যটি প্রযোজ্য। সাম্প্রতিক সময়ে এরূপ অশনিসংকেতবহ ঘটনার মধ্যে রয়েছে আমেরিকায় স্যান্ডি নামক ঘূর্ণিঝড়ের আঘাত এবং জেনারেল পেট্রাউস, আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়ে শেষকালে পরকীয়ার অভিযোগে চাকরিচ্যুতি। এ খেলায় অংশগ্রহণকারী চরিত্রগুলোর প্রত্যেকের পরিণতি আমাদের সামনে উন্মুক্ত।

গ. হাজারো ফিরআউনীয় কারাগারের একটির অসংখ্য সেলের একটি সেলের টেবিলে বসে এই লেখাটি যখন আমি লিখছি তখন অতীতের সাথে বর্তমানকে মিলিয়ে নিতে গিয়ে আরেকটি বিষয় আমার মাথায় এসেছে।

আমি চোখ বন্ধ করে বনী ইসরাঈলের একজন মুসলিমের জায়গায় নিজেকে কল্পনা করার চেষ্টা করলাম।

সারা রাত ধরে হেঁটে চলেছি। দীর্ঘ রাতের শেষে সূর্যোদয়ের সময় হয়ে এলো প্রায়। অবশেষে সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছলাম। সামনে আদিগন্ত জলরাশি। হঠাৎ পিছন ফিরে তাকাতেই মেরুদন্ডে ভয়ের শীতল স্রোত বয়ে গেল। ফির'আউনের স্পেশাল এলিট ফোর্স আমাদের পাকড়াও করতে ছুটে আসছে, আছে ফির'আউন নিজেও। আমি অস্থির হয়ে ডানে-বামে তাকালাম। আমার সহযাত্রী ভাই-বোনেরাও প্রযুক্তিগতভাবে যোজনে-যোজনে এগিয়ে থাকা এক শত্রুবাহিনীর দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে আছে। ফেরআউনের বাহিনী দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছে। তারা কি আমাদের ধরে ফেলবে? নাকি তার আগেই আমরা সমুদ্রে ডুবে আত্মহত্যা করব? কি করব কিছুই বুঝতে পারছি না। একজন আর্তনাদ করে মূসা ﷺ কে বলল, **"আমরা যে ধরা পড়ে গেলাম!" [সূরা শু'আরা, ২৬: ৬১]**

মূসা ﷺ বলে উঠলেন, **"কখনই নয়, আমার সাথে আছেন আমার পালনকর্তা। তিনি আমাকে পথ বলে দেবেন।" [সূরা শুআরা, ২৬: ৬২]** হঠাৎ তিনি হাতের

লাঠিটি দিয়ে সমুদ্রের পানিতে আঘাত করলেন আর সাথে সাথেই সমুদ্রের পানি দু'ভাগ হয়ে উঁচু পর্বতের চূড়ার মতো আকার ধারণ করল। মাঝখানে তৈরি হওয়া পথ দিয়ে আমরা সমুদ্র অতিক্রম করলাম। যেতে যেতে পিছু ফিরে ফির'আউন আর তার বাহিনীকে একনজর দেখার চেষ্টা করলাম। কুফর, অহংকার আর অত্যাচারের মূর্ত প্রতীক সেই বাহিনীকে সমুদ্রে ডুবে যেতে দেখলাম। অথচ এই কিছুক্ষণ আগেও আমরা নিজেদের জীবনের ভয় করছিলাম। ফির'আউন ও তার বাহিনী ভেবেছিল শীঘ্রই তারা আমাদের ধরে ফেলবে। আমরাও ভেবেছিলাম এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম! কিন্তু যখন তারা নিজেদের সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান মনে করছিল আর আমরা নিজেদের সবচেয়ে বেশি অসহায় মনে করছিলাম ঠিক তখনই চোখের পলকে পাশার দান উল্টে গেল।

ঈমান আর কুফরের এই যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি এমনই হয়।

অতঃপর আমি পবিত্র কুরআনের সূরা ক্বামারে এলাম। এখানেও চল্লিশ নং আয়াতে এসে আবার ফিরআউনের উল্লেখ পেলাম,

> "আমি কোরআনকে বোঝবার জন্যে সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? ফির'আউন সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারীগণ আগমন করেছিল। তারা আমার সকল নিদর্শনের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর আমি পরাভূতকারী, পরাক্রমশালীর ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তোমাদের মধ্যকার কাফেররা কি তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ? না তোমাদের মুক্তির সনদপত্র রয়েছে কিতাবসমূহে? না তারা বলে যে, আমরা এক অপরাজেয় দল? এ দল তো সত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে।" [সূরা আল ক্বামার, ৫৪: ৪০-৪৪]

এই আয়াতের ব্যাপারে খুব সুন্দর একটি মন্তব্যের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল মক্কায়। তখনকার মুসলিমদের অবস্থা ছিল মুসা ﷺ এর সময়ের বনী ইসরাঈলীদের মতো অত্যাচারিত। কোনো আশার আলো দেখতে পাচ্ছিল না তারা। আজকের অনেক মুসলিমও এর মাঝে নিজেদের সাদৃশ্য খুঁজে পেতে পারে। সুন্দর সেই মন্তব্যটি করেছিলেন স্বয়ং উমার বিন আল খাত্তাব ﵁। তিনি বলেছিলেন, "যখন সূরা ক্বামারের এই আয়াতগুলো নাযিল হয়, তখন আমি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম, কারা পরাজিত হবে? কাদের পাকড়াও করা হবে?"

কারণ উমার ﷺ যা শুনছেন তার সাথে বাস্তব পরিস্থিতির মিল খুঁজে পাচ্ছিলেন না। কেননা এই ৪৪নং আয়াতে বলা হচ্ছে, কাফেরদের দলটি শীঘ্রই পরাজিত হবে, অথচ মুসলিমরাই কিনা তখন কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিনাতিপাত করছে! যাই হোক, অল্প কয়েক বছর পরেই দৃশ্যপট বদলে গেল। উমার ﷺ এবং তাঁর সাথীরা মক্কার তপ্ত রোদের মাঝে নয় বরং শত শত মাইল দূরে বদরের প্রান্তরে নিজেদের আবিষ্কার করলেন। সেখানে তারা অত্যাচারী সরকারের হাতে বন্দী নন, বরং একটি যুদ্ধের ময়দানে সেই অত্যাচারী নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আর আমরা জানি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধটিতে মুসলিমরা ত্বরিত জয়লাভ করে আর পৌত্তলিক কুরাইশদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। উমার ﷺ বললেন, "যখন বদরের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বর্ম পরিধান করছিলেন এবং বারবার বলছিলেন, "এই দলতো শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে ", ঠিক তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম এই আয়াতটি আসলে কোন দলের কথা বলছে, তার আগে নয়।" আল্লাহ ﷻ চাইলে মুহূর্তের মাঝেই পরিস্থিতিকে সম্পূর্ণ বদলে দিতে পারেন।

সূর্য ডুবছে। আমার ইফতারের সময় হয়ে এল।

তারিক মেহান্না
আশুরার দিনে অর্থাৎ মুহাররামের ১০ তারিখ, ১৪৩৪ (২৪ নভেম্বর ২০১২)
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল প্রিজন থেকে।

পতাকা তুলে নাও

জীবনে চলার পথে আমরা নানান ধরনের মানুষের সাথে পরিচিত হই।তবে আমরা আমাদের পছন্দসই শ্রেণির সাথেই বন্ধুত্ব গড়ে তুলি। তাদেরকে নিয়ে, তাদেরকে ঘিরে আমাদের জীবন সাজাই। তাই কুরআন খুললে আপনি দেখতে পাবেন আল্লাহ্ আপনাকে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। আমরা যেন এইসব শ্রেণীর কার্যক্রম এবং পরিণতি দেখে সঠিক শ্রেণিটির অংশ হওয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারি সেজন্য কুরআনে আল্লাহ্ عَزَّوَجَلَّ বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন স্বভাবের মানুষের বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।এর উদাহরণ হিসাবে আমরা দেখতে পাই:

মু'মিনরা 'অর্থহীন বিষয়ে লিপ্ত হয় না' (২৩:৩) আর **'অর্থহীন অপ্রয়োজনীয় বিষয়াদি তাদের সামনে উপস্থিত হলে তারা নিজেদের সম্মান সমুন্নত রেখে বিনয়ের সাথে সেসব বিষয় এড়িয়ে যায়'** (২৫:৭২)। অন্যদিকে **'এমন মানুষও আছে যারা অর্থহীন কথাবার্তায় নিমজ্জিত থাকে'** (৩১:৬)।

এই দুই শ্রেণীর সাথে পরিচিত হওয়ার পর আপনি নিজেকে প্রশ্ন করুন আপনি কোন দলের অংশ হতে চান। তারপর সিদ্ধান্ত নিন।

সামনে এগোলে আল্লাহ্ আপনাকে অন্য এক শ্রেণির সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন। এরা **'অসহায়দের খাবার দিতে উৎসাহিত করে না'**(৮৯:১৮) এবং **'নিজেদের ধন-সম্পদ গভীরভাবে ভালোবাসে'**(৮৯:২০)। একই সাথে তিনি এদের বিপরীত শ্রেণির সাথেও পরিচয় করিয়ে দেন যারা **''অন্যদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং দারিদ্র্যের হুমকির সম্মুখীন হয়েও নিজেদের উপর অন্যের কল্যাণকে প্রাধান্য দেয়'। (৫৯:৯)**

আপনি পরিচিত হবেন তাদের সাথে **'যারা নিতান্ত অলসভাবে এবং লোক দেখানোর জন্য সালাতে দাঁড়ায় আর আল্লাহকে কদাচিৎ স্মরণ করে।'** (৪:১৪২) এবং তাদের সাথেও **'যারা নিজেদের সালাতে বিনয়ী এবং একাগ্রচিত্ত'** (২৩:২)।

এমন মানুষও আপনার জীবনে আসবে যারা শুধুই **'ভোগ বিলাসে মত্ত থাকে আর চতুষ্পদ জন্তুর মতো খাওয়া-দাওয়া করে'**(৪৭:১২) আবার সেই সমস্ত চিন্তাশীল

লোকেরা আপনাকে নাড়া দিয়ে যাবে যারা **‘আকাশ এবং পৃথিবীর সৃষ্টি নৈপুণ্য নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে’ (৩:১৯১)।**

‘নিজের প্রবৃত্তিকেই রবের আসনে বসিয়ে নিয়েছে’ (৪৫:২৩) এমন মানুষের পাশাপাশি **‘অন্যান্য সব কিছুর চেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসে’ (২:১৬৫)** এমন মানুষও আপনি দেখতে পাবেন।

এমনকি আপনি অবাক হয়ে আবিষ্কার করবেন যে, ১৪০০ বছরের পুরোনো কুরআন কি অবিকলভাবে আজকের এই পৃথিবীর গল্প আপনাকে শোনাচ্ছে! কুরআন যেন আমাদের সময়ের নেতৃবর্গ আর সরকারসমূহের কথাই বলছে **‘যারা পৃথিবীর বুকে অত্যাচারের নেতৃত্ব দেয় এবং পৃথিবীর মানুষকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে অনুগত করে রাখে আর তাদের মাঝেই এক দলের সন্তানদের হত্যা করে তাদের উপর অত্যাচার চালায়’ (২৮:৪)** আর **‘যারা অনুগত হতে অস্বীকার করে তাদের জেলে বন্দী করে রাখার ভয় দেখায়।’(২৬:২৯)** এই শাসকেরা **‘মুসলিম নারী শিশুদের আগুনের মুখে ঠেলে দেয়’ (৮৫:৫) ‘শুধু এই কারণে যে তারা আল্লাহ্‌র উপর ঈমান এনেছে।’ (৮৫:৮)** অথচ এই অত্যাচারীরাই নিজেদেরকে **অর্থবিত্ত ও প্রযুক্তিতে অগ্রগামী এবং সভ্য সমাজের মুখপাত্র দাবী করে। (২৮:৭৬)** আর এতেই কেউ কেউ ধোঁকা খেয়ে তাদের কুফর এবং অন্যদের উপর তাদের অত্যাচারকে বেমালুম ভুলে গিয়ে বিস্ময়ভরা চোখে তাদের সমাজ- সংস্কৃতিতে মুগ্ধ হয়ে মনে মনে ভাবে, **যদি তাদের মতো হতে পারতাম!(২৮:৭৯) কিছু সত্যনিষ্ঠ আলেম মানুষকে সচেতন করতে উঠে দাঁড়ায়(২৮:৮০)।** এর ফলে **কিছু মুসলিম জেগে ওঠে এবং শত্রুর ভূমিতে নিগৃহীত হওয়ার পর ইসলামের ভূমিতে হিজরত করে (১৬:১১০)** এবং কেউ কেউ **বিশ্বের বিভিন্ন অংশে নির্যাতিত নারী-পুরুষ এবং শিশুদের রক্ষার্থে আল্লাহ্‌র রাস্তায় লড়াই করে (৪:৭৫)।** তবে অধিকাংশ মানুষই দিনের পর দিন অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে তোলা এসব **শত্রুর ভূমিতে থাকাটাই পছন্দ করে(৪:৯৭)।** শুধু তাই নয় বরং গৃহপালিত দাসের মতো ‘বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, **যদি তারা আমাদের কথা শুনত, তবে নিহত হত না’(৩:১৬৮)** এটুকুও যেন যথেষ্ট নয়। যেই অত্যাচারীরা –

- **পরিষ্কারভাবে ‘একে অপরের সহযোগী’(৮:৭৩, ৪৫:১৯),**
- **যারা চায় আমরা যেন ইসলামকে নির্বিষ তত্ত্বকথায় পরিণত করি, (৬৮:৯)**

- **আমরা ইসলাম পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে তাদের অনুসরণ করলেই শুধু যারা আমাদের উপর সন্তুষ্ট হবে, (২:১২০)**

সেই অত্যাচারী কাফির গোষ্ঠীকে দুনিয়ার মোহে আবিষ্ট কিছু মুসলিম মিত্র হিসাবে গ্রহণ করে। তারা আত্মবিশ্বাসের সাথে তাদের সেই মিত্রদের আশ্বাস দিয়ে বলে, "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে" **আমরা শেষ পর্যন্ত তোমাদের সাথে আছি।'(৫৯:১১)** কিন্তু যেহেতু **'এরা দোদুল্যমান অবস্থায় ঝুলন্ত; এদিকেও নয় ওদিকেও নয়' (৪:১৪৩),** তাই তারা **মু'মিনদেরকেও আশ্বস্ত করে বলে যে আমরা তো বিশ্বাসী (২:১৪)** আর আমরাও তো ইয়ে...মানে... আসলে উম্মাহর বিজয়ই চাই। আর তাই **'যারা পরীক্ষায় পড়লেই পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়' (২২:১১)** এমন মানুষদের সাথে আপনাকে মানিয়ে নিতে হবে। তবে আপনি এমন মানুষের দেখা পাওয়ার সৌভাগ্যও লাভ করবেন **'যারা আল্লাহ্‌র সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে' এবং 'যাদের সংকল্প বিন্দুমাত্রও পরিবর্তিত হয়নি' (৩৩:২৩)**

আর এভাবেই কুরআন পড়ার সময় মানবজাতির সর্বোত্তম থেকে শুরু করে সর্বনিকৃষ্ট পর্যন্ত নানান বৈচিত্র্যময় চরিত্রের মানুষ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য আপনার সামনে উপস্থাপিত হয়। আল-হাসান আল-বাসরি (র) বলেন, *"তোমাদের আগে যারা এসেছিল তারা কুরআনকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আগত বার্তার সংকলন হিসাবে দেখত। তারা রাতের বেলায় এগুলো নিয়ে চিন্তা করত আর দিনের বেলায় সেগুলোকে কাজে পরিণত করত।"*

সুতরাং এবার নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, 'আমি এদের মধ্যে কোন দলটির অংশ হতে চাই? আমি কী সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি?'

কুরআন আপনার সামনে ঠিক এই চ্যালেঞ্জটাই ছুঁড়ে দেয়।

একটি নিয়ম

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

এখানে আসার পরপরই আমাকে 'ইনমেইট হ্যান্ডবুক (Inmate Handbook)' নামে একটা বই ধরিয়ে দেওয়া হয়। এটা মূলত এই জেলের নিয়মকানুন নিয়ে পঞ্চাশ পৃষ্ঠার একটা বই। বইটির মধ্যে একটি নিয়ম ছিল এমন:

"পরিষ্কার ও টানটান করে বিছানা গোছাতে হবে। বিছানার চাদর কুঁচকে থাকা চলবে না। মাথার দিক থেকে মোটামোটি ১৬ ইঞ্চি পর্যন্ত চাদর বিছিয়ে বাকিটুকু গুটিয়ে রাখতে হবে। সব বিছানা সকাল ৭.৩০ মিনিটের মধ্যে গুছিয়ে পর্যবেক্ষণের জন্য প্রস্তুত রাখতে হবে।"

এটা পড়ামাত্রই সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি বিশেষ দিকের কথা আমার মনে পড়ে গেল। আলস্যকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে: "কাজ, সক্রিয়তা বা প্রচেষ্টার প্রতি অনীহা"। আর এই আলস্যকে সালাফগণ তীব্রভাবে ঘৃণা করতেন।

* উমার ইবনুল খাত্তাব ﵁ বলেন, *"দরকারি কিছু না করে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোকে আমি ঘৃণা করি।"*

* ইবন মাস'উদ ﵁ বলেন, *"এই দুনিয়া বা পরবর্তী জীবনের জন্য কাজ না করে অলস বসে থাকে এমন ব্যক্তিকে আমি ঘৃণা করি।"*

স্বয়ং আল্লাহ্‌র রাসূল ﷺ প্রতিদিন আল্লাহ্‌র কাছে এই দুআর মাধ্যমে দিন শুরু করতেন, **"... আমি আলস্য থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাই..."**। আসলে অলসতা সুন্নাহর এতটাই বিপরীতধর্মী একটা বিষয় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনে একবারও হাই তোলেননি। ইবন হাজার ﵀ উল্লেখ করেন: *"নবীজির ﷺ অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি ছিল এই যে, তিনি ﷺ কক্ষণো হাই তোলেননি। ইয়াজিদ বিন আল-আসামের মুরসাল থেকে ইবনু আবি শায়বাহ এবং আল-বুখারি তাঁর তারিখ গ্রন্থে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন।"*

তাই, জেলখানার নিয়ম হলেও এটা আসলে একটা ভালো নিয়ম। নানান রকম মানুষের সাথে বছরের পর বছর কাছাকাছি থাকার ফলে আমি নিশ্চিতভাবে জানি

যে, যত সকালসকাল ঘুম থেকে উঠে দিন শুরু করা যায় দিনভর আলস্য ততোই কম হয়। ‘উমার ﷺ একবার শামে পৌঁছে দেখেন যে, মুয়াবিয়া ﷺ কিছুটা শ্লথ এবং মন্থর হয়ে পড়েছেন। তাই মুয়াবিয়াকে দেখে ‘উমারের প্রথম প্রশ্নটিই ছিল: “কী ব্যাপার মুয়াবিয়া? তুমি কি দুহার (সকালের শেষভাগ) সময় ঘুমোও?” সালাফদের দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করলে এটাই স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তারা সকলেই বেশি ঘুমানোর অভ্যাসকে ঘৃণার চোখে দেখতেন - বিশেষ করে দিনের প্রথম ভাগে।

* সাখর আল-ঘামিদির সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, **“হে আল্লাহ্! আমার উম্মাহর ভোরের পাখিদের উপর তুমি রহম করো।”** কোনো অভিযান বা সেনাবাহিনী পাঠানোর সময় তিনি ﷺ সবসময় দিনের শুরুতেই তাদের প্রেরণ করতেন। সাখর নিজে একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তিনি ভোরবেলাতেই তাঁর ব্যবসায়িক কাজকর্ম শুরু করতেন। ফলে, একসময় তিনি অস্বাভাবিক রকমের ধনী ব্যক্তিতে পরিণত হন।

* আলি ইবনে আবু তালিব ﷺ বলেন, *“সকালবেলা ঘুমানো অজ্ঞতার লক্ষণ।”*

* একবার একদল লোক ফজরের সালাতের পর ইবন মাস‘উদের ﷺ সাথে দেখা করতে আসে। ঘরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার পরও তারা ইবন মাস‘উদের ﷺ ঘরে প্রবেশ করতে ইতস্তত করতে থাকে। ইবন মাস‘উদ ﷺ তাদের এই অস্বস্তির কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তরে বলে যে, তারা এই ভেবে অস্বস্তিবোধ করছে যে হয়তো ওনার স্ত্রী এই সময় ঘরে ঘুমিয়ে আছেন। ইবন মাস‘উদ প্রত্যুত্তরে বলেন, *“আপনারা কী মনে করেন আমার স্ত্রী এতটাই অলস?”* (ইবন মুফলিহ আল-হাম্বালি এই ঘটনার উপর মন্তব্য করে বলেন: *“এই ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, সকালবেলার এই সময়টুকু অবহেলা করা উচিত না এবং এই সময়ে ঘুমোনোকে নিরুৎসাহিত করা হয়।”*) বুখারি এবং মুসলিম উভয়েই এই ঘটনাটি তাঁদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন।

* ইব্ন আব্বাস ﷺ একদিন তাঁর এক ছেলেকে সকালে ঘুমুতে দেখে বলেন: *“উঠো! তুমি কি এমন সময় ঘুমাচ্ছ যখন রিযক বণ্টন হচ্ছে?”*

* একজন তাবি’ই বলেন, *“কোনো আলিমকে ফজরের পর ঘুমোতে দেখলে পৃথিবী দুঃখে কেঁদে ওঠে।”*

* পূর্ববর্তী নবীগণও এমন মনোভাব পোষণ করতেন। নবী দাউদ ﷺ সুলাইমানকে ﷺ বলেছিলেন: *"অতিরিক্ত ঘুমানোর ব্যাপারে সতর্ক হও। অন্যরা যখন কাজ করে তখন এই অভ্যাস তোমাকে দরিদ্র করে দিবে।"*

* 'ঈসা ইবন মারইয়াম ﷺ বলেছেন, *"দুটি স্বভাবকে আমি ঘৃণা করি:*

১) রাতে জেগে না থাকা সত্ত্বেও দিনের বেলায় ঘুমানো,

২) কোনো কারণে আনন্দিত হওয়া ছাড়াই উচ্চস্বরে হাসা।"

* একজন কবি বলেন: "নিশ্চয়ই সকালবেলার ঘুম মানুষকে সন্দেহ-সংশয়ে ফেলে দেয়। আর বিকেলবেলায় ঘুমুনো তো পাগলামির নামান্তর।"

ইবন মুফলিহ উপরোক্ত বাণীগুলোর উপর মন্তব্য করে বলেন, *"সুতরাং দিনের বেলা ঘুমানো স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। কারণ এটা প্রাণোচ্ছলতা শুষে নেয় এবং শরীরের পেশিগুলোকে ধ্বংস করে দেয়। তাই শারীরিক সক্রিয়তার মাধ্যমে পেশিগুলোকে সচল রাখা উচিত।"*

কয়েক মাস আগে আমাকে CMU, Terre Haute থেকে এই জেলে (Marion CMU) নিয়ে আসা হয়। এই ধরনের জেল বদল সাধারণত কোনোরকম পূর্বাভাস ছাড়াই করা হয়। এক ভোরে হঠাৎ ৫টার সময় একজন প্রহরী আমার সেলের তালা খুলে আমাকে অন্য এক জেলে স্থানান্তর করার খবর দিল। আরো বলল যে, আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নেওয়ার জন্য আমার হাতে এক ঘন্টারও কম সময় আছে। আমি বুঝতে পারলাম, এই জেলের ভাইদের সাথে হয়তো আর কখনো দেখা হবে না। তাই সিএমইউর নিকষ কালো অন্ধকার করিডোর ধরে হেঁটে হেঁটে আমি অন্যান্য সেলে থাকা ভাইদের সালাম দিয়ে বিদায় জানিয়ে আসতে গেলাম। এই সময়ে বেশিরভাগ কয়েদিরাই ঘুমিয়ে থাকে।

কিন্তু বেশ কয়েকটা সেলে আমি আলো জ্বলতে দেখতে পাই। পা টিপে টিপে আলোকিত সেলগুলোর কাছে গিয়ে আমি কুরআন তিলাওয়াতের মৃদু গুনগুন শুনতে পাই। সেলের দরজা গলে চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেলাম প্রতিটি সেলেই আমার ভাইয়েরা কিয়ামুল-লাইলে মগ্ন হয়ে আছে।

* আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, **"জেনে রাখো, একজন মু'মিনের সম্মান হচ্ছে তাঁর কিয়ামুল লাইল।"**

* তিনি ﷺ আরো বলেন, **"রাতের শেষ ভাগে বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়, যদি তুমি সে সময়ে আল্লাহর যিকিরকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারো, তাহলে তাদের অন্তর্ভুক্ত হও।"**

* তিনি ﷺ বলেন, **"আমাদের রব প্রতি রাতে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন, যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ বাকি থাকে। অতঃপর তিনি বলেন: কে আমাকে আহ্বান করবে, আমি যার ডাকে সাড়া দেব? কে আমার নিকট প্রার্থনা করবে, আমি যাকে প্রদান করব? কে আমার নিকট ইস্তেগফার করবে, আমি যাকে ক্ষমা করব? ফজর উদিত হওয়া পর্যন্ত অনুরূপ বলতে থাকেন"**

* রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, **"তোমরা রাতের সালাত আঁকড়ে ধর, কারণ এটা তোমাদের পূর্বের নেককার লোকদের অভ্যাস এবং তোমাদের রবের নৈকট্য দানকারী, গুনাহের কাফফারা ও পাপ মোচনকারী। এটা শরীর থেকে রোগ-বালাই দূর করে দেয়।"** (ইবন রজব রহিমাহুল্লাহ এই হাদিসের ব্যাপারে মন্তব্য করেন, *"এই হাদিসের একটি অন্যতম শিক্ষা হলো, কিয়ামুল লাইল এর ফলে সুস্বাস্থ্য লাভ করা যায়। এটি শরীরকে নীরোগ করে।"*)

* তিনি ﷺ বলেন, **"এমনভাবে ইবাদাত করো যেন তুমি আল্লাহকে দেখছো। সেটা না পারলে জেনে রাখো যে তিনি তোমাকে দেখছেন। আর এটাই হচ্ছে ইহসান।"**

কিয়ামুল-লাইল এর মাধ্যমে মানুষের কাছে সুনাম কুড়ানোর কোনো উপায় নেই। রাতের গভীরে জেলখানার সেলে বন্দী অবস্থায় কাউকে দেখিয়ে দেখিয়ে ইবাদাত করার কোনো উপায় নেই। তাই এই ইবাদাতে কোনোরকম কোনো পার্থিব ফললাভের আশা নেই। আর কিয়ামুল-লাইল তো বাধ্যতামূলকও নয়। বরং হাসান আল-বসরী বলেছেন, এটি হচ্ছে 'সবচেয়ে কঠিন এবং প্রগাঢ়' ইবাদাত। তাহলে বলুন, কী মানুষকে স্বেচ্ছায় এবং খুশিমনে শীতকালের প্রবল শীতের রাতে বিছানা ছেড়ে নেমে এসে বরফশীতল পানি দিয়ে ওযু করে এমন এক সত্তার ইবাদাত করতে প্রেরণা যোগায় যাকে সে দেখতেও পায় না?

* আবু সুলাইমান আদ-দারানি বলেন, *"যারা বিনোদনে প্রমত্ত হয়ে রাত কাটায় তাদের চেয়ে যারা কিয়াম করে তারাই নিজেদের রাতগুলোকে বেশি উপভোগ করে। যদি রাত না থাকতো তাহলে আমি এই পৃথিবীতে থাকতে চাইতাম না।"*

* আল-ফুদাইল বিন 'ইয়াদ বলেন, *"রাতে কিয়াম আর দিনে সিয়াম পালন করতে না পারলে বুঝে নিও যে তোমার পাপকাজ তোমাকে বেঁধে রেখে বঞ্চিত করছে।"*

* সালাফদের একজন বলেছেন, *"চল্লিশ বছর ধরে সূর্যোদয় ছাড়া অন্য কিছু আমাকে বিষণ্ণ করতে পারেনি। (কারণ সূর্যোদয়ের মাধ্যমেই কিয়াম এর সময় শেষ হয়ে যায়)"*

তারা সকলেই কিয়ামুল-লাইলকে অত্যন্ত কঠিন কাজ বলে স্বীকার করেছেন কিন্তু তাদের ঈমান এই কঠিন কাজকেই তাদের বিশেষত্ব-তে পরিণত করেছে। কপটতা, স্বার্থপরতা আর বস্তুবাদিতায় ডুবে থাকা পশ্চিমা সমাজের কাছে এমন চিন্তাধারা সম্পূর্ণ অপরিচিত। যা-ই হোক, প্রবন্ধের মূল বিষয়বস্তুতে ফিরে আসি। এই হাদিসটি নিয়ে ভাবুন:

> **"ঘুমানোর সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথার শেষাংশে শয়তান তিনটি গিঁট দেয়। প্রত্যেক গিঁটের স্থানে সে মোহর এঁটে দিয়ে বলে: তোমার রাত এখনো অনেক বাকি, অতএব ঘুমাও। যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর যিকর করে তখন একটি গিঁট খুলে যায়। যদি সে ওযু করে তো আরেকটি গিঁট খুলে যায়। যদি সে সালাত আদায় করে, তো তার সবকটি গিঁটই খুলে যায়, ফলে সে ভোরবেলায় প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল থাকে। অন্যথায় সে অবসাদ ও আলস্য অনুভব করে।"**

এই হাদিসটির ব্যাপারে ইবন হাজার বলেন, *"এই হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মেজাজ ভালো রাখার গোপন চাবিকাঠি কিয়ামুল-লাইল এর মাঝে লুকিয়ে আছে।"* বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে লিপিবদ্ধ বিভিন্ন ঘটনা থেকে এই বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে সব বর্ণনা বলে শেষ করা যাবে না, তবে নিচের ঘটনাগুলো নিয়ে একটু ভাবুন:

* 'আইশাহ ﵂ বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্র রাসূল ﷺ কক্ষণো কিয়ামুল-লাইল ত্যাগ করতেন না। অসুস্থ বা ক্লান্ত হলেও তিনি বসে বসে তা আদায় করতেন। অথচ কিয়ামুল-লাইল এর কারণে তিনি কখনো ক্লান্ত হননি বরং এর প্রভাব এমন ছিল যে তিনি ﷺ কখনো হাই পর্যন্ত তোলেননি। রাতভর কিয়ামুল-লাইলের পরেও দিনের প্রথম প্রহরেই যুদ্ধের জন্য বেরিয়ে পড়তে তাঁর উদ্যমের অভাব হতো না।

* ইবরাহিম বিন শাম্মাস বলেন, *“আমি আহমাদ ইবন হাম্বালকে ছোটবেলা থেকেই চিনি। সে কৈশোর থেকেই সারারাত কিয়ামুল-লাইল করতো।”* জীবনের এই সময়ের কথা বলতে গিয়েই ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন যে, তিনি কত আগে আগে তাঁর দিন শুরু করতেন। তিনি বলেন, *“আমি হাদিস শুনার জন্য তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়তে চাইতাম। তখন আমার মা আমার জামা টেনে ধরে বলতেন, ‘অন্তত ফজরের আযান হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আগে মানুষজন ঘুম থেকে উঠুক’।”*

[দ্রষ্টব্য: যুহর এবং আসরের মধ্যবর্তী সময়ে একটু ঘুমিয়ে নেওয়াটা *(কাইলুলা)* সুন্নাহর অংশ। একারণেই ইমাম আহমাদ কিয়াম এর জন্য উঠতে পারতেন। তাঁর ছেলে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, “শীত-গ্রীষ্ম সবসময়েই আমার বাবা দুপুরবেলায় একটু ঘুমিয়ে নিতেন। তিনি কখনো এটা ছাড়তেন না এবং আমাকেও এই অভ্যাস রপ্ত করতে উৎসাহিত করতেন। তিনি উমার ইবনুল খাত্তাবের ﵁ উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, *“কাইলুলা অর্থাৎ দুপুরবেলা একটু ঘুমিয়ে নাও কারণ, শয়তানরা তা করে না”*। আনাস, ইবন আব্বাস প্রমুখ সাহাবিরাও ﵃ এ ব্যাপারে উৎসাহ দিয়েছেন। কিয়াম এর জন্য সহায়ক আরেকটি অভ্যাস রয়েছে। তা হলো 'ইশার সালাতের আগে না ঘুমানো এবং ‘ইশার পর কথা না বলা এবং জেগে না থাকা। কারণ হাদিসে এসেছে যে, “নবীজি ﷺ ‘ইশার আগে ঘুমানো অপছন্দ করতেন এবং ‘ইশার পর জেগে থেকে কথা বলাও অপছন্দ করতেন।”

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কিয়ামুল-লাইল এর মানে এই নয় যে সারারাত কিংবা রাতের একটা নির্দিষ্ট সময় জেগে থাকতে হবে। বরং, সুবহে সাদিকের আধাঘন্টা আগে জেগে উঠে দুই রাকাত সালাত আদায় করলে সেটাও কিয়ামুল-লাইল বলে গণ্য হবে।]

আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাইদের সাথে থেকেছি। তাদের মাঝে যারা কিয়ামুল-লাইল এর ব্যাপারে নিয়মিত ছিল তাদেরকেই আমি সবচেয়ে মনোযোগী এবং সময়ের সদ্ব্যবহারকারী হিসাবে পেয়েছি। তারা কদাচিৎ হাই তুলতো, সতর্কতার সাথে তাঁদের শব্দ চয়ন করতো এবং জেলের জীবনযাত্রার মানদণ্ডেও তাঁদের পার্থিব সম্পদ ছিল সবচেয়ে কম। তাঁদের চিন্তা-চেতনা সর্বদা সুন্দরতম বিষয়গুলো ঘিরে আবর্তিত হতো।

এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোই অতীতের মুজাহিদদেরকে ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দিতে সাহায্য করেছিল। “বিদায়াহ ওয়ান-নিহায়াহ” গ্রন্থে ইবনে কাসীর ﵀

ইয়ারমুকের যুদ্ধের বিবরণে ইতি টানার সময় একটি বিশেষ মুহূর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। তখন লাঞ্ছিত অপদস্থ রোমান সৈন্যদের অবশিষ্টাংশ যুদ্ধের বিবৃতি দিতে অ্যান্টিয়কে তাদের সম্রাট হিরাক্লিয়াসের কাছে ফিরে গিয়েছিল। তারা যুদ্ধক্ষেত্রে খালিদ বিন ওয়ালিদের সেনাবাহিনীর হাতে চূড়ান্তভাবে অপদস্থ হওয়ার কথা হিরাক্লিয়াসকে জানায়।

তা শুনে হিরাক্লিয়াস বলে উঠলো: লানত তোমাদের ওপর! যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেছে, তাদের সম্পর্কে আমাকে বলো। তারা কি তোমাদের মতোই মানুষ নয়?

তারা জবাব দিলো: হ্যাঁ।

হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলো: তোমাদের সংখ্যা বেশি, নাকি তাদের?

তারা উত্তরে বললো: বরং আমরা তো প্রতিটি যুদ্ধেই সংখ্যার দিক থেকে তাদেরকে বহুগুণে ছাড়িয়ে গেছি।

হিরাক্লিয়াস প্রশ্ন ছুঁড়লো: তাহলে, কেন তারা তোমাদের পরাজিত করলো?

তখন তাদের এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললো: কারণ তারা রাতে জেগে উঠে নামাজ পড়ে, দিনের বেলায় রোজা রাখে, ওয়াদা পূরণ করে, সৎ কাজে উৎসাহ দেয়, মন্দ কাজে বাধা দেয়, এবং তারা একে-অপরের সাথে উত্তম ব্যবহার করে। অন্যদিকে আমরা মদ খাই, ব্যভিচার করি, নিষিদ্ধ কাজে মত্ত হই, চুক্তি ভঙ্গ করি, অন্যায় ও অত্যাচার করি, আমাদের রবকে রাগান্বিত করে এমন কাজে উৎসাহ দিই, আর যা তাকে সন্তুষ্ট করে তাতে বাধা প্রদান করি এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় ছড়িয়ে বেড়াই।

হিরাক্লিয়াস বললো: তুমি সত্য বলেছো।

তারিক মেহান্না
শুক্রবার, ৩ রজব, ১৪৩৫ (২ মে, ২০১৪)
ম্যারিয়ন, সি এম ইউ

ফল হাতে প্রবেশ নিষেধ!

কিছুদিন আগে একটা চিঠি পেলাম। লেখক চিঠিতে নিজের জীবনে যেসব দুঃখ-দুর্দশার মুখোমুখি হচ্ছেন, এবং যেগুলো তার কাছে মনে হচ্ছে অন্তহীন, সেগুলো নিয়ে তার অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। চিঠিতে একটা লাইন ছিল:

"আমি ক্রুদ্ধ ... কেন আল্লাহ্ আমার দু'আ শুনছেন না? কেন?"

তার চিঠিটা পড়ার পর, সিদ্ধান্ত নিলাম তার জবাব হিসেবে এই লেখাটা লেখার। দুঃখজনক হলেও সত্যি এধরনের প্রতিক্রিয়া আমাদের মধ্যে খুবই প্রচলিত। এরকম হওয়ার কারণ হলো, দু'আ (আল্লাহ্র কাছে কোন কিছু চাওয়া) কীভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কে আমাদের মারাত্মক ভুল ধারণা রয়েছে।

আমরা দু'আকে যেকোনো বিপদের সময়, কঠিন মুহূর্তে প্যানিক বাটনের মতো ব্যবহার করার চেষ্টা করি। আপনি একটা কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন, আল্লাহ্ বারবার কুরআনে বলেছেন যে দরকারের সময় তাঁকে ডাকবে তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দেবেন। সুতরাং, আপনি মনে করলেন যদি ঠিকঠাক মতো দু'আ করতে পারেন (রাতের শেষ তৃতীয়াংশে, মনোযোগের সাথে ইত্যাদি) তাহলে ঠিক পরদিন সকালেই আপনি আপনার দু'আর "জবাব" পেয়ে যাবেন। আর যদি না পান, তাহলেই আপনি ভিতরে ভিতরে আল্লাহ্র অঙ্গীকারকে সন্দেহ করা শুরু করবেন!

আল্লাহর রাসূল ﷺ একটি হাদীসে এই বিষয়ে বলেছেন। যদিও বুখারী ও মুসলিম - দু জায়গাতেই এই হাদীসটি আছে, তবে আমাদের আলোচনার জন্য মুসলিমের বর্ণনাটি অধিকতর উপযুক্ত:

> **"একজন ব্যক্তির দু'আর জবাব দেওয়া হতে থাকে - যদি সে অন্যায় অথবা হারাম কিছুর জন্য দু'আ না করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন না করে – এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাড়াহুড়া না করে এবং অধৈর্য না হয়"।**

রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো -"কীসের দ্বারা ব্যক্তি অধৈর্য হয়ে যাবে?"

রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন – **“সে বলবে আমি দু’আ করছি এবং করতেই থাকছি কিন্তু আমি দেখছি আমার দু’আর কোনো জবাব দেওয়া হচ্ছে না। এভাবে সে আশা হারিয়ে ফেলবে এবং আল্লাহ্-কে স্মরণ করা ছেড়ে দেবে।”**

এই হাদীসটি বেশ কৌতূহল উদ্দীপক এবং আমরা যদি গভীরভাবে হাদীসটি বুঝার চেষ্টা করি, তাহলে কীভাবে দু’আ কাজ করে এবং কীভাবে কাজ করে না – সে বিষয়ে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারবো। একটু খেয়াল করুন রাসূলুল্লাহ ﷺ কী ধরনের শব্দ এখানে ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন: **“... তাঁর দু’আর জবাব দেওয়া হতে থাকবে”**। একবার অধৈর্য ব্যক্তির অভিযোগের সাথে তুলনা করুন তো “আমি দেখছি আমার দু’আর কোনো জবাব দেওয়া হচ্ছে না।” আপাত দৃষ্টিতে এই ব্যাপার দু’টো পরস্পর সাংঘর্ষিক মনে হতে পারে। এটা কীভাবে সম্ভব যে একজন ব্যক্তির দু’আর জবাব দেওয়া হচ্ছে কিন্তু তাঁর কাছে মনে হচ্ছে সে কোনো ফল পাচ্ছে না? দু’আর উত্তর কোথায়?

ব্যাপারটা হলো, অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের দু’আর জবাব একসাথে না এসে, ধাপে ধাপে আমাদের কাছে আসে। যেমন এমন কিছু হয়তো ঘটবে যার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে আপনি আপনার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। কিন্তু আপনার কাছে মনে হচ্ছে আপনার দু’আর জবাব আসছে না।

মনে করুন আপনি একটা কক্ষে বন্দী। মুক্তির একমাত্র উপায় জানালা ভেঙে বের হওয়া। কিন্তু আপনার সম্বল শুধুমাত্র ছোট কিছু পাথরের টুকরো। আপনি জানালায় একটা ছোট পাথর ছুঁড়লেন। তাতে জানালো ভাঙলো না, কিন্তু খুব সূক্ষ্ম একটা ফাটল ধরলো। আপনি আরেকটা পাথর ছুঁড়লেন। আরেকটি ছোট ফাটল। আপনি আবার একটা পাথর ছুঁড়ে দিলেন, তারপর আরেকটি। তারপর আরেকটি। যতক্ষণ না পর্যন্ত পুরো জানালা অসংখ্য সূক্ষ্ম ফাটলে ভরে গেল।

শেষবারের মতো আপনি একটা পাথর ছুঁড়ে দিলেন এবং জানালার কাঁচ ভেঙে গেল। ফলে আপনি বন্দিত্ব থেকে মুক্তি পেলেন। দু’আও এভাবেই কাজ করে। আপনি প্রতিটি দু’আর মাধ্যমে আংশিক জবাব পেতে থাকেন এবং আপনি ধৈর্য ও অবিচলতার সাথে একই দু’আ বারবার করার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে শেষ পর্যন্ত দু’আর পরিপূর্ণ জবাব পাবেন।

এজন্যই গুহায় আটকে পড়া তিনজন ব্যক্তিকে নিয়ে যে অতি পরিচিত হাদিসটি আছে, সেখানে আমরা দেখতে পাই যে, প্রথম ব্যক্তির দু’আর ফলে গুহামুখের

পাথরটি সামান্যই সরেছিল। দ্বিতীয় ব্যক্তির দু'আর পর পাথরটি আর একটু সরলো। এবং তৃতীয় ব্যক্তির দু'আর পরই তাঁরা তিনজন তাঁদের কাঙ্ক্ষিত ফল পেলেন - পাথরটি ওই পরিমাণে সরলো যার ফলে তাঁরা গুহা থেকে মুক্তি পেলেন।

মনে রাখবেন প্রথম পাথরটি শুধু একটি ফাটলই ধরাবে। কিন্তু যদি আপনি পাথর ছুঁড়তে থাকেন তাহলে এক সময় জানালা ভেঙে যাবে এবং আপনি মুক্ত হবেন। এর জন্য সময়ের প্রয়োজন। এই জন্যই হাদিসটিতে আমাদের বলা হচ্ছে - "...যতক্ষণ পর্যন্ত সে অধৈর্য না হচ্ছে"

আপনি যখন কোনো চারাগাছে পানি দেন, তখন নিশ্চয় আপনি একসাথে ত্রিশ গ্যালন পানি ঢেলে দিয়ে, কেন মাটি থেকে বিশাল বটবৃক্ষ বের হচ্ছে না সেটা নিয়ে চিন্তা করতে বসেন না। বরং আপনি ধৈর্য সহকারে প্রতিদিন একটু একটু করে পানি দিতে থাকেন এটা জেনে যে, যত সময়ই লাগুক না কেন, শেষ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত ফুলটি পাবেন।

একইভাবে আপনি জানেন, আল্লাহ্ আপনার প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করবেন এবং আপনার দু'আর জবাব দেবেন - এটা সত্য। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে অলৌকিকভাবে দু'আর উত্তর পাওয়া নিয়মের ব্যতিক্রম, নিয়ম না। নিয়ম হলো আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাওয়া এবং তাঁর কাছ থেকে এর উত্তর পাওয়ার প্রক্রিয়া সময় ও ধৈর্যের উপর নির্ভরশীল।

যেমনটি ইবনে আল জাওযী, সাইদ আল খাতির গ্রন্থে বলেছেন:

> *"কষ্ট-দুঃখ-দুর্দশা শেষ হওয়ার একটি নির্ধারিত সময় আছে যা শুধু আল্লাহ্ জানেন। তাই যে ব্যক্তি দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাকে ধৈর্যশীল হতে হবে। আল্লাহ্র নির্ধারিত সময় আসার আগে ধৈর্য হারিয়ে ফেলা কোনো কাজে লাগবে না। ধৈর্য আবশ্যক কিন্তু দু'আ ছাড়া ধৈর্য অর্থহীন। যেই ব্যক্তি আল্লাহর কাছে দু'আ করে তাঁর কাছে সাহায্য চাইছে তাঁর উচিত অধৈর্য না হওয়া। বরং তাঁর উচিত ধৈর্য, সালাহ এবং দু'আর মাধ্যমে সর্বজ্ঞানী আল্লাহর ইবাদাতে নিয়োজিত হওয়া।*
>
> *অধৈর্য ব্যক্তি তাঁর ধৈর্য হারানোর মাধ্যমে আল্লাহ্র পরিকল্পনা লঙ্ঘন করার চেষ্টা করছে এবং এটা আল্লাহ্র সামনে একজন গোলাম ও বান্দার উপযুক্ত আচরণ কিংবা অবস্থান নয়। আল্লাহর বান্দা হিসেবে আমাদের জন্য শ্রেষ্ঠ অবস্থান হলো, আল্লাহর কাছ থেকে আসা তাকদীরকে মেনে*

নেওয়া। এজন্য প্রয়োজন ধৈর্য। এর সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হলো সালাহর মাধ্যমে ক্রমাগত আল্লাহ্-র কাছে ভিক্ষা চাওয়া।

আল্লাহর কাছ থেকে আসা তাকদীরের বিরোধিতা করা হারাম এবং এটা আল্লাহর পরিকল্পনা লঙ্ঘনের চেষ্টার মধ্যে পড়ে। তাই এই বিষয়গুলো অনুধাবন করো এবং তোমার জন্য তোমার দুঃখ-কষ্ট-দুর্দশা সহ্য করা অনেক সহজ হবে।"

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, আল্লাহ্ যদি মুহূর্তের মাঝেই যেকোনো কিছু পরিবর্তন করতে পারেন, তাহলে আমাদের দু'আর জবাব দেওয়ার সময় কেন তিনি অপেক্ষা করেন?

এর কারণ হলো, একমাত্র প্রতিকূলতার সাথে দীর্ঘদিনের সংগ্রামের মাধ্যমেই আমরা আমাদের দুর্বলতাগুলো চিনতে পারি এবং সেগুলোকে উপড়ে ফেলে সেখানে আমাদের শক্তি সামর্থ প্রতিস্থাপিত করতে পারি। ব্যাপারটা তেতো ওষুধের মতো। একারণেই মক্কায় নিদারুণ অত্যাচারের শিকার সাহাবা ﵃ যখন কা'বার পাশে উপবিষ্ট রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে আবেদন করেছিলেন -

"ইয়া রাসূলুল্লাহ ﷺ, আপনি কি আমাদের বিজয়ের জন্য দু'আ করবেন না? আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করবেন না?" রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দিয়েছিলেন - **"...কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়ো করছো"**।

ব্যাপারটা কিন্তু এমন ছিলো না যে, আল্লাহ্ ঐ মুহূর্তেই পৃথিবী থেকে কুরাইশদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে সক্ষম ছিলেন না বরং ওই মুহূর্তে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন এবং আল্লাহ্ সেটা কবুল করতেন তাহলে যে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে সাহাবা ﵃ বঞ্চিত হতেন, সেটা সম্পর্কে প্রশ্নকর্তা ছিলেন অজ্ঞ।

শেষ পর্যন্ত মক্কায় তের বছর, অতঃপর মদীনায় দশ বছর – মোট তেইশ বছরের সংগ্রামের পরই আল্লাহ্ তাঁর সবচেয়ে প্রিয় উম্মাহর প্রতি তাঁর অঙ্গীকার পূরণ করেছিলেন এবং এই সুদীর্ঘ তেইশ বছরে সাহাবারাও ﵃ উপলব্ধি করলেন যে, অন্য কোনো উপায়ে এই বিজয় আসা বাঞ্ছনীয় ছিল না। মনে রাখবেন ফুল ফুটবেই, কিন্তু সেটা একরাতে না। দিনের পর দিন আপনাকে পানি দিয়েই যেতে হবে। অবশেষে এই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন যে, আপনার দু'আর উত্তর আল্লাহ্র তৈরি প্রাকৃতিক নিয়মের কাঠামোর ভেতর থেকেই আসবে। এই

কাঠামোর ভেতর যা ঘটে আল্লাহ্ সেটা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং এই কাঠামোর মাধ্যমেই তিনি আপনার দু'আর উত্তর দেন। আবারো বলছি, অবশ্যই অলৌকিক ঘটনা, কারামাহ ঘটে, কিন্তু সেগুলো হলো নিয়মের ব্যতিক্রম।

একজন কুমারী নারী, যিনি সন্তানের জন্য দু'আ করছেন তিনি অলৌকিকভাবে মারিয়াম ﷺ – এর মতো কুমারী অবস্থাতেই গর্ভবতী হয়ে পড়বেন, তার সম্ভাবনা খুবই কম! আবার একজন শতবর্ষী নারী, ইব্রাহীম ﷺ – এর স্ত্রী সারাহ – এর মতো একশো বছর বয়সে গর্ভবতী হবেন সে সম্ভাবনাও কম। বরং দু'আ করার সময়ই আপনি জানেন, আপনি যখন সন্তান চেয়ে আল্লাহ-র কাছে দু'আ করছেন তখন সন্তান জন্মের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই আপনার দু'আর উত্তর আসবে। বিয়ে, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক, গর্ভধারণ এবং তারপরেই সন্তানপ্রসব। শেষ পর্যন্ত আপনার দু'আর উত্তর এসেছে, কিন্তু তা এসেছে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই। এমন একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেটা শুধু আল্লাহ্ নিয়ন্ত্রণ করেন এবং এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একমাত্র তিনিই আপনার দু'আর উত্তর দিয়েছেন এবং দেওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

ইউসুফ ﷺ তাঁর শৈশবে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যেখানে আল্লাহ্ অঙ্গীকার করেছিলেন, তিনি ইউসুফ ﷺ কে মিশরের উপর ক্ষমতাসীন করবেন এবং আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকার পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট ঘটনাবলি ও ঘটনাপ্রবাহের মাধ্যমেই "ক" বিন্দু থেকে "খ" বিন্দু তে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

প্রথমে ইউসুফের ﷺ ভাইয়েরা তাদের সাথে তাঁকে নিয়ে গেলো – তাঁকে কুয়ায় নিক্ষেপ করা হলো – তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করে দেওয়া হলো – তিনি অন্যান্য বন্দীদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন – বাদশা তাঁর ব্যাখ্যা শুনে চমৎকৃত হলেন – এবং অতঃপর ইউসুফ ﷺ মিশরের অর্থমন্ত্রী পদে আসীন হলেন। শৈশবে তাঁর কাছে করা অঙ্গীকার পূর্ণ করা হলো, কিন্তু সেটা হলো আপাতদৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনাবলির মধ্য দিয়ে। মিশরের আরেকটি গল্প দিয়ে শেষ করছি।

ষাটের দশকের শেষ দিকে যখন সাইদ কুতুব কে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলো, সেই একই সময় তাঁর ভাই মুহাম্মাদ ও বোন হামিদা কুতুবও একই জেলে বন্দী ছিলেন। কিন্তু একই কারাগারে থাকা সত্ত্বেও তাঁদের একে অপরের সাথে দেখা করার কোনো উপায় ছিলো না। কারণ কারাকর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী এটা ছিল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শারাওয়ী জুমা আরেকটি আইন করেছিলেন যে, কোনো ইসলামপন্থী কয়েদীকে তাঁদের দর্শনার্থীর কাছ থেকে কোনো ফল বা খাবার নিতে দেওয়া হবে না। বেশ কয়েক বছর কেটে যাওয়ার পর মুহাম্মাদ কুতুব তাঁর বোনের সাথে দেখা করার সুযোগ চেয়ে কারা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানালেন।

শারাওয়ী জুমা উত্তর পাঠালো: "জীবিত বা মৃত কোনো অবস্থাতেই তুমি তোমার বোনকে দেখতে পাবে না"।

এক বছরের মতো পার হবার পর নতুন এক সরকার ক্ষমতায় এলো এবং ক্ষমতাসীন হওয়া মাত্র তাঁরা পূর্ববর্তী সরকারের সব সদস্যকে জেলে ছুঁড়ে দিল। হঠাৎ করেই মুহাম্মাদ এবং হামিদা কুতুব আবিষ্কার করলেন তারা এখন মুক্ত। আর শারাওয়ী জুমা নিজেকে আবিষ্কার করলো চার দেওয়ালের মাঝে বন্দী। সেই একই কারাগারে।

এরই মাঝে একদিন তাঁর স্ত্রী এক ঝুড়ি ফল নিয়ে তাকে দেখতে আসলো। কারারক্ষী নিয়ম মতো তাঁর তল্লাশী করলো এবং ঝুড়ি ভর্তি ফলও দেখতে পেলো। কারারক্ষী জিজ্ঞেস করলো এই ফল কার জন্য? জবাবে মহিলা বললেন: " আমার স্বামী শারাওয়ী জুমার জন্য"। মুচকি হেসে প্রহরী জবাব দিল: "দুঃখিত, আমি নিয়ম মানতে বাধ্য। ফল হাতে প্রবেশ নিষেধ!"

এভাবে দু'আ কাজ করে। দু'আ কোনো প্যানিক বাটন না যা মুহূর্তের মধ্যে অলৌকিক সমাধানের গ্যারান্টি দেবে। বরং এর জন্য প্রয়োজন সময় ও গভীরতা। এর জন্য দরকার অবিচলতা, অধ্যবসায়, ধৈর্য, পুনরাবৃত্তি এবং অন্তর্দৃষ্টি।

সর্বোপরি এটি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার কেন্দ্রে আছে এই সত্যটিই যে, প্রতি দিনের প্রতিটি মুহূর্তে এই দুনিয়া এবং এর মাঝে সবকিছু ও সবার উপর আল্লাহ্-র রয়েছে একচ্ছত্র আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ।

তারিক মেহান্না
২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০১২
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট-সেল #১০৭

কুরআন এবং আপনি

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০১)

সূরা বাকারার শুরুতে মুত্তাকীনদের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য হিসাবে আল্লাহ্ উল্লেখ করেছেন "আল গায়েব" অর্থাৎ অদৃশ্য জগতের উপর তাদের বিশ্বাসকে। এই বিশ্বাসের সাধারণ ধারণাটির বাইরেও একজন মুসলিমের জীবনে এর আরও কিছু কার্যকরী তাৎপর্য রয়েছে।

প্রথমত, হে মুওয়াহহিদ – আপনি যা বিশ্বাস করেন, তা এই জন্যে বিশ্বাস করেন না যে, তা জনপ্রিয়, সহজলভ্য, আকর্ষণীয় কিংবা আরামদায়ক। আপনি আশেপাশের মানুষগুলোর প্রতিক্রিয়া দেখে সত্য-মিথ্যা, ঠিক-ভুল, গ্রহণীয়-বর্জনীয় এসবের মানদণ্ড নির্ধারণ করেন না। বস্তুতঃ এইসব পারিপার্শ্বিক ব্যাপারগুলো আপনার কাছে অর্থহীন। যদি এই পৃথিবীর ছয়শ কোটি মানুষ কোনো কিছুতে বিশ্বাস করে, সেটা আপনার বিশ্বাসকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারে না। বরং মাস না যেতেই পাল্টে যাওয়ার প্রবণতায় নিমজ্জিত নিয়ত পরিবর্তনশীল এই জগতে আপনার বিশ্বাসের ভিত্তি হলো এক অপরিবর্তনীয় জগৎ। সেই জগতের ঠিক আর ভুলের মানদণ্ড কখনো বদলায় না। সেই জগৎ অপার্থিব সুখ আর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির। জান্নাত আর জাহান্নামের। ফেরেশতা আর শয়তানের অদেখা সেই জগতে ভালো-খারাপ আর সত্য-মিথ্যার মানদণ্ড সৃষ্টির শুরু থেকে আজ পর্যন্ত অপরিবর্তিত আছে এবং শেষ সময় পর্যন্ত এমনই থাকবে। এই শাশ্বত মানদণ্ডের নথিপত্র, আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সেই-না-দেখা জগত থেকে। এই নথিপত্র তার মানদন্ড নির্ধারণে মানুষ কী মনে করে, তাদের কাছে নন্দিত বা নিন্দিত হওয়া কিংবা দুনিয়ার পরিবর্তনশীল ধারার গতিপ্রকৃতির মতো অকিঞ্চিৎকর বিষয়গুলোকে মোটেই আমলে নেয় না।

আমার ভাই ও বোনেরা, এই জন্যই কুরআনে বর্ণিত তাওহীদের মানদণ্ডকে আঁকড়ে ধরতে পেরে আপনি নিজেকে সবচেয়ে সফল মনে করেন। এই যুগেও সেই আদর্শের আল ওয়ালা ওয়াল বারা-এর বাহক হতে পারাটাকে আপনি সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কাজ হিসাবে গণ্য করেন। আর এই আদর্শই আপনাকে তাগুতের সাথে আপস করা অথবা তাগুতের সামনে মাথা নত করাকে এই পৃথিবীর হীনতম অপমান হিসেবে চিনতে শেখায়। আপনার হৃদয় জনপ্রিয়তা আর বৈষয়িক স্বাচ্ছন্দ্যের পরোয়া না করেই এই আদর্শের উপর অটুট থাকে। কেন? কারণ আপনি যে আদর্শের উপর চলেন তা এমন এক জগৎ থেকে আগত যেখানে

মূল্যবোধ কখনো পরিবর্তিত হয় না। তাই গায়েব তথা অদৃশ্য জগতের উপর বিশ্বাস আপনাকে সেই অপরিবর্তনীয় মানদণ্ডের মতোই দৃঢ়পদ রাখবে। রাতারাতি ধর্মত্যাগ করা যে সমাজে আধুনিকতায় পরিণত হয়েছে, আজকের সেই সমাজে সূরা বাকারার এই আয়াতগুলো যেন আরও অর্থবহ হয়ে উঠেছে।

গায়েবের উপর দৃঢ় বিশ্বাস একজন মুসলিমকে সাহসী করে তোলে। সত্যকে সমুন্নত রাখতে সে যেকোনো ঝুঁকি নিতেও প্রস্তুত থাকে। এর উজ্জ্বল উদাহরণ হচ্ছে বদর যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সেই দু'আ-

"হে আল্লাহ্! এই ক্ষুদ্র দল যদি আজ পরাজিত হয় তবে এই দুনিয়ায় আপনার ইবাদাত করার আর কেউ থাকবে না।"

ভেবে দেখুন সেই দিন মুসলিমদের বিপক্ষে প্রতিকূলতা এত তীব্র ছিল – ব্যর্থতা আর বিলুপ্তির শঙ্কা এত বেশি ছিল যে ইসলাম চিরতরে মুছে যাওয়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। অথচ এসব কিছু শুধু তাঁদের সংকল্পকেই আরও দৃঢ় করে তুলেছিল। অতঃপর তাঁরা নিঃশঙ্ক চিত্তে অগ্রসর হয়েছিল। নিজেকে জিজ্ঞেস করুন, কী তাঁদেরকে এতটা ঝুঁকি নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিল? কী তাঁদের মনে সাহস সঞ্চার করেছিল? কীভাবে তাঁদের অন্তর এতটা দৃঢ়তা লাভ করেছিল? আপনি অনুধাবন করবেন যে, এই পৃথিবীতে ক্রিয়াশীল শক্তিগুলো সম্পর্কে তাঁদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি ছিল। তাঁরা জানতেন যে গায়েবের জগত থেকে এমন শক্তি উন্মোচিত হতে পারে এবং হবে যা মানুষের পক্ষে কখনো কল্পনাও করা সম্ভব না। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সেই শক্তির মাধ্যমে সাহায্য কখন আসবে তা তারা নির্দিষ্টভাবে না জানলেও তারা এটা জানতেন যে, তা আসবেই। আর তা এসেছিলও। হেবা দাবাগ (Heba Dabbagh) তার '*Just Five Minutes*' গ্রন্থে (পৃ: ৪৮-৪৯) তার মায়ের কারাবন্দী জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। কারাগারে ওনাকে ওনার ছেলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। হেবার মা এর উত্তরে বলেছিলেন: "আমি কেবল এতটুকু জানি যে, আমি তাকে ঘর থেকে মসজিদ আর মসজিদ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার অভ্যাস করিয়ে বড় করেছি।" পরবর্তীতে কারাকর্মকর্তা জিজ্ঞাসাবাদকারীকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, "একে নির্যাতন করার ব্যবস্থা কর।" হেবার মা জবাবে বলেন যে, "কী আশ্চর্য! আমি তোমার মা'র বয়েসী আর তুমি আমাকে মারতে চাও!" এরপর ওনাকে একাকী বন্দী অবস্থায় রাখা হয়। তখন তিনি অকারণে তাকে আটকে রাখার ব্যাপারে কারাগারের ওয়ার্ডেনের কাছে অভিযোগ করেন। তিনি বলেন: "আমাকে কাগজ–কলম দিন।

আমি এই পুরো ডিভিশনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করব।" অফিসার উত্তরে বলে, "এটার অনুমতি নেই। আপনার অভিযোগ কখনো কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছবে না। আর এটা আইনের পরিপন্থী।" পরে হেবার মা বলেন, "তবে আমি একমাত্র আল্লাহ্'র কাছে আমার অভিযোগ তুলে ধরবো। তিনিই সর্বোত্তম বিচারক। আল্লাহ্ চান তো একদিন তুমি আমার অবস্থানে থাকবে কিন্তু আমার মতো ধৈর্য তোমার থাকবে না।" বোন হেবা পরে উল্লেখ করেন যে: "একমাস বা দুইমাস পর আমরা সেই অফিসারের মৃত্যু সংবাদ পাই। সে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যায়। গাড়ির স্টিয়ারিং তার পেটে ঢুকে গিয়েছিল।"

সুতরাং, অনুধাবন করুন যে, অদৃশ্য জগৎ আমাদের এই দৃশ্যমান পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু এর বিপরীত কখনও হয় না। এই বিশ্বাস আপনাকে আরও দৃঢ়পদ করে তুলবে। দুনিয়ার কোনো শক্তিই আপনার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কারণ আপনি এর চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী সত্তার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। আর এই বাস্তবতায় আমাদেরকে শতভাগ বিশ্বাসী হতে হবে।

গায়েবে বিশ্বাসী হিসাবে আপনি আপাতদৃষ্ট যেকোনো ক্ষতিকে গ্রহণ করতে সক্ষম। বরং ক্ষতিটাকে আপনি প্রাপ্তি বলে মনে করেন। আপনার লাভ ক্ষতির হিসাব আপনার আশেপাশের মানুষদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তারা লাভ ক্ষতির হিসাব করে টাকা আর সুস্থতার মুদ্রায়। আর আপনি লাভ ক্ষতি পরিমাপ করেন দৃঢ়তা আর আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির ভিত্তিতে। আপনি যতক্ষণ আপনার নীতির প্রতি সৎ থাকছেন আর আল্লাহ্'র সন্তুষ্টির সবগুলো শর্ত যথাযথভাবে পালন করছেন, ততক্ষণ আসলে আপনার ক্ষতি বলতে কিছুই নেই। নীতির ক্ষেত্রে দুর্বলতা আর শরী'আহ লঙ্ঘনই আপনার নিকট সবচেয়ে বড় ক্ষতি। বাহ্যিকভাবে উহূদ যুদ্ধ মুসলিমদের জন্য পরাজয় মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে তা যে একটি বিজয় ছিল সে বিষয়ে ইমাম ইবন আল-কায়্যিম তার '*যাদ-উল-মা'আদ*' গ্রন্থে প্রায় আট পৃষ্ঠাব্যাপী বিশদ আলোচনা করেছেন। মুসলিমদের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে যারা পরিষ্কার ধারণা লাভ করতে চান, তাদের উচিত এই লেখাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করা। আমরা যদি গায়েবের আদর্শের মানদণ্ড আমাদের লাভ–ক্ষতি নির্ধারণ করি তবে এই দুনিয়ার কোনো ক্ষতিই আর আমাদের কাছে ক্ষতি বলে মনে হবে না, তা সে যত বড়ই হোক না কেন। আমাদের ধর্মকে আক্রমণ করা হবে, আমরা জেলে বন্দী হব, আমাদের ভূমি আক্রান্ত হবে, লুট করা হবে। কিন্তু এসব আমাদের পরাজিত করতে পারে না কারণ এসবই এই দুনিয়ার লেনদেন। কিন্তু সেই অদৃশ্য জগতে আমাদের

পুরস্কারের খতিয়ান প্রস্তুতি, জান্নাতে আমাদের জন্য নির্মাণাধীন প্রাসাদসহ অন্যান্য কর্মচাঞ্চল্য জয়-পরাজয়ের এক ভিন্ন চিত্র অংকন করে।

এই চিন্তাধারার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছেন আমাদের বোন আফিয়া সিদ্দিকীর মা। বোন আফিয়া সিদ্দিকী বছরের পর বছর এমন মানুষদের কাছে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন যারা নারী অধিকার নিয়ে আমাদের দিনরাত বক্তৃতা দেয়। তাকে প্রথমে অপহরণ করা হয়। পরে আমেরিকার গোপন কারাগারে আটকে রাখা হয়। সন্তানদের কাছ থেকে আলাদা করা হয়। তার প্রতি কৃত অত্যাচারের প্রমাণগুলোকে তার সাথেই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার আশায় তাকে তলপেটে দুইবার গুলি করা হয়। আরও অনেক অবর্ণনীয় অত্যাচারের শিকার হয়েছেন আমাদের এই বোন। আর সবশেষে তার বিরুদ্ধে এমন এক অবাস্তব অভিযোগ আনা হয় যা তার শারীরিক অবস্থার আলোকে চরম হাস্যকর। এই নারীর প্রতি চালানো নির্যাতন আমাদের হৃদয়ের অনুভূতিগুলোকে নির্বাক করে দেয়। এতদসত্ত্বেও তার সাহসী মায়ের চিন্তাধারা গায়েবের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের এক নিখুঁত উদাহরণ। আর এই বিশ্বাসই তাকে আপাতদৃষ্টির এই দুরবস্থাকে বিজয় হিসাবে গ্রহণ করার শক্তি যুগিয়েছে। তিনি তার কন্যার প্রতি আনীত অভিযোগ শুনে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এইভাবে:

> *“এতদিন আমি খুবই অসুস্থ ছিলাম। বিছানা থেকে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু আমার মেয়ের বিচারের রায় শুনে আমি যেন নতুন জীবন পেয়েছি। যদি বিচারকরা মনে করে থাকে যে আফিয়ার পরিবারের জন্য আজকের দিনটি একটি অন্ধকার দিন, তার মা রায় শুনে অজ্ঞান হয়ে যাবে, তবে তারা জেনে রাখুক আজকের চেয়ে খুশির দিন আমার জীবনে আর আসেনি। আল্লাহ্‌ এক আফিয়ার পরিবর্তে আজ আমাকে হাজারটা পুত্র সন্তান দিয়েছেন যারা প্রতিদিন আমাকে সাহায্য করার জন্য আমার দরজায় অপেক্ষা করে।”*

সবশেষে তিনি বলেন: *“একজন মু’মিনের লক্ষণ এটাই যে সে আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারও সামনে মাথা নত করে না। যেইদিন আমরা আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে কোনো সৃষ্ট জীব অথবা বস্তুর করুণা ভিক্ষা করব, সেইদিন আমরা ধ্বংস হয়ে যাবো।”*

এটাই লাভ-ক্ষতির প্রকৃত অর্থ। আর এটা গায়েবের মানদণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত। এটি এই নশ্বর স্পৃশ্য জগতের উপর নির্ভর করে না। তাই গায়েবের উপর বিশ্বাস মুসলিম হিসেবে আমাদের জীবনে অত্যন্ত গভীর আর শক্তিশালী তাৎপর্য বহন করে।

শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর।

তারিক মেহান্না,
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি, আইসোলেশন ইউনিট, সেল #১০৮,
ফজরের পূর্ব মুহূর্তে লিখিত,
শুক্রবার, ২৭ শে সফর, ১৪৩১/১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০১০।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০২)

সূরা বাকারা আয়াত ২১-২২ এ আল্লাহ্ বলেন:

> "হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের সেই পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী (ধর্মভীরু) হও। যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদস্বরূপ স্থাপন করেছেন।"

আপনি এই আয়াতগুলো থেকে যে ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন তা হলো, আপনার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়লে দ্রুত তা শক্তিশালী করার উপায় হলো দুটো জিনিসের দিকে মনোনিবেশ করা: আপনি এবং আপনার চারপাশ। বেশি নয়, প্রতিদিন কেবল ১৫ মিনিট মনোযোগ দিয়ে নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকিয়ে একটু ভাবুন। আপনি দেখবেন আপনার দিনের বাকিটা আল্লাহ্‌র কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে করতে কেটে যাবে।

অতিক্ষুদ্র একটি শুক্রাণু আর একটি ডিম্বাণুর সম্মিলনে আমার আপনার এত বড় দেহ গঠিত হয়েছে। সেই ক্ষুদ্র বস্তু থেকে আমাদের হাড়, শিরা-উপশিরা, রক্ত-কণিকা, মাংস, ত্বক ইত্যাদি অস্তিত্ব লাভ করেছে। দেহের ভিতরের অথবা বাইরের প্রত্যেকটি অঙ্গের স্ব-স্ব কাজ সম্পাদনের জন্যে প্রত্যেকের আলাদা আকৃতি, মাপ আর অবস্থান রয়েছে।

যেমন আপনার দেহের কংকালের কথাই ভাবুন। এটি শক্ত হাড় দিয়ে গঠিত যার উৎপত্তিস্থল ছিল সেই জমাট বাধা শুক্রাণু। আর দেখুন কীভাবে এটি এখন আপনার দেহের ভারবহন করে আছে। এর প্রত্যেকটি হাড়ের গঠন ও কাজ আলাদা। এদের কোনোটি বড়, কোনোটি ছোট। কোনোটি লম্বা, কোনোটি আবার খাটো। কিছু হাড় গোল, কিছু আছে ফাঁপা। কিছু চওড়া, আবার কতগুলি সরু। কোনোটি ভারী আবার কিছু আছে হালকা। চিন্তা করুন যদি আপনার কংকাল কেবল একটি একক হাড় দ্বারা গঠিত হতো তবে আপনি নড়াচড়া করতে পারতেন না। তার বদলে কয়েকশ হাড়ের সুসংগঠিত সমষ্টি দিয়ে আল্লাহ্ আপনার এই কংকাল বানিয়েছেন। এর প্রত্যেকটি হাড় একটি সুক্ষ্ম সংযোগের মাধ্যমে একটি

আরেকটির সাথে লেগে আছে। আর আপনার চলাফেরায় প্রতিটি হাড় নিজ নিজ ভূমিকা পালন করছে।

আপনি আপনার দেহের শত শত পেশীগুলোর কথাই একবার ভাবুন। এর প্রত্যেকটিতে আছে মাংস, শিরা-উপশিরা আর পেশীবন্ধ। এদের প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত। এদের রয়েছে নির্দিষ্ট কাজ। দুই ডজন এরও বেশি পেশী কেবল চোখের পাতা খোলা আর বন্ধের কাজে নিয়োজিত আছে। যদি এর থেকে একটিও পেশী কম থাকত তবে আমরা আর কখনও আমাদের চোখের পাতা খুলতে পারতাম না। তেমনি দেহের প্রত্যেকটি পেশী কোনো না কোনোও অঙ্গের ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। কোনো একটি পেশীর অনুপস্থিতি হয়তো সেই অঙ্গটাকেই অকেজো করে ফেলত। চোখের পাতা তো একটি বিস্ময়, কী নিঁখুতভাবে এটিকে বসানো হয়েছে আর তা আমাদের চোখকে ময়লা আর অতিরিক্ত আলো থেকে রক্ষা করছে।

চোখের কথাই ভেবে দেখুন – রেটিনা, ফোভিয়া-সেন্ট্রালিস, অপটিক নার্ভ, স্ক্লেরা, ভিট্রিয়াস হিউমার, লেন্স, আইরিস এবং কর্নিয়া নিয়ে আমদের একটি চোখ গঠিত। এসব কিছু একসাথে কাজ করছে বিধায় আপনি এই লেখাগুলো পড়তে পারছেন, আকাশ দেখছেন, তারা উপভোগ করছেন, মেঘ, রঙ, গাছপালা, প্রাণীজগৎ আরও কত কী সুন্দরভাবে দেখতে পারছেন। আর এই সবকিছুই হচ্ছে আমাদের চিন্তা আর চেষ্টা ছাড়াই।

আপনার কানের কথাও ভেবে দেখুন। কীভাবে এটিকে সুচারুরূপে নকশা করা হয়েছে। যে কোনো আওয়াজ এসে আপনার কানের ছিদ্রে প্রবেশ করলে আপনার কানের পর্দা পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর আপনি তা স্পষ্ট শুনতে পান।

জিহ্বার প্রতি খেয়াল করুন, একটি পেশী যা আপনার চিন্তা ও অনুভূতিকে ভাষায় প্রকাশ করতে সাহায্য করে। দেখুন কী সুশৃঙ্খলভাবে আপনার দাঁতগুলো একটি আরেকটির পাশে বসে আপনার মুখের সৌন্দর্যবর্ধন করছে। এই দাঁতগুলোর কোনোটি কামড় দেয়, কোনোটি চিবোয়, কোনোটি আবার গুড়ো করে। প্রত্যেকটি দাঁতেরও ভিন্ন ভিন্ন কাজ এবং উদ্দেশ্য ভাগ করে দেওয়া আছে। আপনার ঠোঁট আপনার মুখকে আটকে রাখে, একে রঙ দান করে আর আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণে সহায়তা করে। আল্লাহ্ আপনার স্বরযন্ত্রকে এমন ভাবে বানিয়েছেন যে আপনার কন্ঠ নিঃসৃত প্রত্যেকটি শব্দ সেই ধ্বনি বহন করে যা দুনিয়াতে অনন্য। আর কারও সাথেই তা মিলে না। শ্রোতা শুনামাত্রই

বুঝতে পারে সে কার কথা শুনছে। এসবের মাঝে আছে এক জটিল ও দীর্ঘ পদ্ধতি আর বিস্ময় যা এখানে আলোচনা করে শেষ করা যাবে না।

আপনার হাতের দিকে মনোনিবেশ করুন আর ভাবুন কীভাবে এটি কাজ করে। আপনার হাতের তালু, পাঁচটি আঙ্গুল যাদের চারটি একদিকে আর একটি অন্য দিকে। বৃদ্ধাঙ্গুলি অন্য দিকে হওয়াতে এটি সব আঙ্গুলে স্পর্শ করতে পারে। অন্য আর কোনো উপায়ে বানালে হাত আমরা এইভাবে ব্যবহার করতে পারতাম না। কল্পনা করুন যদি পাঁচটি আঙ্গুল একই পাশে থাকত! তবে আপনার পক্ষে একটি বাক্যও লেখা সম্ভবপর হতো না।

তারপর আপনার নখের মতো তুচ্ছ একটি জিনিসের দিকে নজর দিন। এটি আপনার আঙ্গুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। আপনাকে অনেক কিছু ধরতে সহায়তা করে যা আপনি অন্যভাবে ধরতে পারতেন না। এত সামান্য একটি জিনিস নখ যা হয়ত আপনার মনোযোগ আকৃষ্ট করে না। অথচ এটি না থাকলে হয়তো আপনি অসহায় হয়ে পড়তেন।

এসব অত্যাশ্চর্য বস্তুর সমন্বয়ে আপনার দেহ গঠিত হয়েছে। অথচ এর মূলে ছিল কেবল একবিন্দু আণুবীক্ষণিক জমাট বাধা তরলকণা। এসব মিলেই আপনি। আর আপনি এই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের মাঝে একজন মাত্র। আর মানুষ এই পৃথিবীর অসংখ্য প্রজাতির জীবের মাঝে একটি মাত্র। আর এই পৃথিবী সূর্যের চারপাশে প্রদক্ষিণরত গ্রহের মাঝে একটি মাত্র! আর সূর্য শত কোটি ছায়াপথের মাঝে একটিতে অবস্থিত নগণ্য এক নক্ষত্র মাত্র! আর বিস্ময়কর এই বিশ্বজগতের তারকাদের অনন্যতার সারাংশ তুলে ধরাও বিশাল এক কঠিন কাজ। এসব কিছু উদ্দেশ্যহীন, দৈবক্রমে সংঘটিত কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা হতে পারে না।

এসব কিছুই সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ্’র প্রয়াসহীন সৃষ্টি। সূরা বাকারার এই দুইটি আয়াতে আল্লাহ্ আমাদেরকে দুইটি ব্যাপারে চিন্তা করতে বলেছেন:

১) নিজেদের নিয়ে এবং
২) নিজেদের চারপাশ নিয়ে।

এতে করে আল্লাহ্’র ইবাদাতে আমাদের মন নিবিষ্ট হবে।

> “হে মানব সমাজ, তোমরা তোমাদের সেই পালনকর্তার ইবাদত কর, যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা মুত্তাক্বী (ধর্মভীরু) হও। যিনি তোমাদের জন্য ভূমিকে বিছানা এবং আকাশকে ছাদ স্বরূপ স্থাপন করেছেন।”

সুতরাং যখন নিজের মধ্যে ঈমান-আমলে দুর্বলতা অনুভূত হবে, ইবাদাতে শক্তি ও মিষ্টতা পাবেন না তখন নিজের দেহের কথা ভাবুন অথবা কোনো এ্যানাটমি বই খুলে দেখুন, মহাকশের ছবি দেখে ভাবুন অথবা চোখ বন্ধ করে আল্লাহ্’র বড়ত্ব নিয়ে চিন্তা করুন।

তারিক মেহান্না,
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি,
আইসোলেশন ইউনিট, সেল #১০৮।
মঙ্গলবার ১৬ ই রবি-উল-আউয়াল ১৪৩১/২রা মার্চ, ২০১০।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৩)

সূরা বাকারা আয়াত ৬১, আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলদের উদ্দেশ্য করে বলেন,

> "(স্মরণ করো) যখন তোমরা বললে, হে মূসা! (প্রতিদিন) একই ধরনের খাবারের ওপর আমরা কিছুতেই (আর) ধৈর্যধারণ করতে পারি না, তুমি আমাদের পক্ষ থেকে তোমার রবের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি যেন আমাদের জন্য এমন খাদ্যদ্রব্যের ব্যবস্থা করেন যা জমিন থেকে উৎপন্ন হয়, যেমন তরিতরকারি, পেয়াজ, রসুন, গম, ভুট্টা, ডাল। তিনি বললেন, তোমরা কি (আল্লাহ্র পাঠানো) এ উৎকৃষ্ট জিনিসের সাথে একটি তুচ্ছ (ধরনের) জিনিসকে বদলে নিতে চাও? (যদি তাই হয়) তাহলে তোমরা অন্য কোনো শহরে নেমে যাও, সেখানে তোমরা যা কামনা করছো তা পাবে, (আল্লাহ্ তা'আলার আদেশ অমান্য করার ফলে) শেষ পর্যন্ত অপমান ও দারিদ্র্য তাদের ওপর ছেয়ে গেল; ..."

কোন গোষ্ঠী বা জাতি দীর্ঘদিন যাবৎ অন্যায়-অবিচার এর শিকার হতে হতে একসময় সেই অবস্থায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। আর এই পরিস্থিতি যদি দীর্ঘায়িত হয় তবে এই হীনম্মন্যতার গ্লানি তাদের অন্তরকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

ফির'আউনের অত্যাচার এবং অনাচার বনী ইসরাঈলের মন-মননকে গভীরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল এবং তাদের চরিত্রে দাসত্বের বীজ বপন করেছিল। আল্লাহ্ মূসাকে ﷺ বনী ইসরাঈলদের রক্ষা করে মিশর থেকে বের করে নিয়ে আসার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়কে দাসত্বের লাঞ্ছনা থেকে পরিত্রাণ দেওয়া এবং সম্মানিত ও গৌরবময় এক জাতিতে পরিণত করা। কিন্তু মিশর ত্যাগ করে কিছু দূর যাওয়ার পরই তারা ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ে। তখন তারা মূসাকে ﷺ দোষারোপ করতে লাগলো। এক্সোডাস ১৬:৩ এ আছে যে, তারা মূসা ﷺ এবং হারুন ﷺ কে বলেছিল,

> *"হায়! যদি আমরা কেবল মিশরে আমাদের প্রভুর হাতে নিহত হতে সম্মত হতাম, সেখানে আমরা মাংসের পাত্রের পাশে বসে থাকতাম আর ইচ্ছামতো রুটি খেতে পারতাম; কিন্তু তোমরা আমাদেরকে এই বিরান এলাকায় এনে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিচ্ছ"।*

একটা বড় বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার পরও এরকম একটি অবস্থায় তারা আরও নানা রকম খাদ্য উপকরণ চেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ করছিল! সেই কথাই সূরা বাকারার এই আয়াতটিতে বলা হয়েছে। মিশরে কঠিন দুর্দশা ভোগ করা সত্ত্বেও কেবল এইসব দুনিয়াবী ভোগের সামগ্রীর জন্য তারা সেই অতীত জীবনের কথা ভেবে আক্ষেপ করছিল! এছাড়াও যখন মূসা ﷺ আল্লাহ্‌র সাথে কথা বলতে কয়েকদিনের জন্য তাদের ছেড়ে গিয়েছিলেন, তখন তারা তাদের কাছে সঞ্চিত ফির'আউনের অলংকারগুলো দিয়ে স্বর্ণের বাছুর নির্মাণ করে তার ইবাদাত করা আরম্ভ করে দেয়! তাদের মনে তাদের মিথ্যে প্রভুদের ভক্তি এতটাই তীব্র ছিল, যে তারা আক্ষরিক অর্থেই সেই প্রভুদের দাসে পরিণত হয়েছিল।

অর্থাৎ বাহ্যত মুক্ত হলেও বনী ইসরাঈল জাতি হীনম্মন্যতা ও মানসিক দাসত্বের বেড়াজালে আবদ্ধ ছিল। আর এই দাসত্ব এমন মারাত্মক পর্যায়ের ছিল যে, যখন তাদেরকে প্রতিশ্রুত জেরুযালেমে প্রবেশ করতে বলা হলো তখন তারা উত্তরে মূসা ﷺ কে বলে বসে, "তুমি আর তোমার প্রতিপালক গিয়ে যুদ্ধ কর, আমরা এখানেই বসে থাকব।" তাদের আত্মসম্মানবোধ বলে কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।

যে ব্যক্তি, গোষ্ঠি বা জাতি দীর্ঘদিন ধরে অবিচার, অন্যায় আর পরাজয়ের শিকার হয়ে আসছে তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রথম পদক্ষেপ হলো তাদের মধ্যে মুক্ত, স্বাধীন এবং মর্যাদাভিত্তিক গুণাবলি আর মানসিকতার উন্মেষ ঘটানো, যেটাকে আমরা বলে থাকি "হার-না-মানা-মানসিকতা"। দ্বিতীয় ধাপে আসবে জ্ঞান অর্জন, এ ধাপে সাহসী ব্যক্তিত্বের মাঝে শরী'আহর জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে হবে এবং তারপরের ধাপে আসবে সে জ্ঞানের প্রয়োগ। অজ্ঞতা এবং বিপথগামীতাই কেবল আমাদের একমাত্র সমস্যা নয়। আজ আমরা অনেক দা'ঈ আর ইমামদের দেখি যারা অনেক শিক্ষিত এবং সুন্নাহর উপর অনেক জ্ঞান রাখেন অথচ তাদের মাঝে কি যেন একটা নেই।

একজন মানুষ যে আদর্শ বা বিশ্বাসই গ্রহণ করুক বা সে অনুসারে জীবনযাপন করুক না কেন, তার পক্ষে বিস্ময়কর কিছু করে দেখানো সম্ভব হয় তখনই, যখন সে শারীরিক ও মানসিক উভয়বলয়ে মুক্ত আর স্বাধীন থাকে। আমাদের এই সত্যটি অনুধাবন করতে হবে। পৃথিবীতে এই পদ্ধতিতেই সফলতা আসে। সুতরাং বনী ইসরাঈলের জন্য এবং অনুরূপভাবে আমাদের জন্যও প্রথম লক্ষ্য - জ্ঞানার্জন অথবা ইবাদাতে নিমগ্ন হওয়া নয়। বরং আমাদের প্রথম করণীয় হচ্ছে একজন সত্যিকার মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। নিজের মর্যাদা অনুধাবন করা।

নিজেদেরকে মনস্তাত্ত্বিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করা। ইসলামের মাঝে জীবন খুঁজে পাওয়ার লক্ষণ মূলত এগুলোই- দুর্বলতা আর হীনমন্যতা হটিয়ে শৌর্যের সাথে উঠে দাঁড়িয়ে আত্মসম্মানবোধকে জাগ্রত করা। অন্যথায় আমরা শুধুই চলমান লাশ।

অতএব আমাদের প্রথম সমস্যা এবং তার প্রথম সমাধান হওয়া উচিত এই আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের মাধ্যমে। (প্রাতিষ্ঠানিক) অজ্ঞতা, গৌণ বিষয়ে বিচ্যুতি, ঐক্যের অভাব ইত্যাদি মুসলিম উম্মাহর বড় বড় সমস্যা ঠিকই কিন্তু মৌলিক সমস্যা নয়। আমাদেরকে অবশ্যই একেবারে প্রাথমিক, সার্বজনীন ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়গুলো থেকে আরম্ভ করতে হবে। নতুবা সত্যিকারের দা'ওয়াহ কার্যক্রম এবং মুসলিম হিসেবে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে আমরা খুব বেশিদূর যেতে পারবো না। বনী ইসরাঈলের মানুষেরা আল্লাহ্কে বিশ্বাস করত, ইবাদাত করত। কিন্তু মানসিকভাবে তারা তাদের পুরাতন প্রভুদের গোলামি থেকে মুক্ত হতে পারেনি। তাই স্বাধীন জীবনের সম্মানজনক ক্ষুৎপিপাসার চেয়ে অপমানজনক দাসত্বের সাথে আসা উচ্ছিষ্ট ভালো খাবারকেই তারা শ্রেয় মনে করা শুরু করে।

তারিক মেহান্না,
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি,
আইসোলেশন ইউনিট, সেল #১০৮,
বুধবার, ১৭ ই রবি-উল-আওয়াল, ১৪৩১ হিজরি,
৩রা মার্চ, ২০১০।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৪)

সূরা বাকারা আয়াত ৭৯ এ আল্লাহ্ বলেন,

> "অতএব তাদের জন্য আফসোস! যারা নিজ হাতে কিতাব লেখে এবং বলে এটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ–যাতে তারা এর বিনিময়ে সামান্য অর্থ গ্রহণ করতে পারে। অতএব তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের হাতের লেখার জন্য এবং তাদের প্রতি আক্ষেপ, তাদের উপার্জনের জন্য।"

পৃথিবীর অনেক ধর্মের ঐশী বাণীই মানুষ কাঁটাছেড়া করে বিকৃত করেছে। এটি একটি চিরাচরিত ঘটনা এবং ইতিহাসে অনেক আগে থেকেই ঘটে আসছে। আর এর ফলে ধর্মের ভাবমূর্তিতে ব্যাপক ধ্বস নেমেছে, রটেছে দুর্নাম। পশ্চিমে ধর্মীয় চিন্তাধারা আর বিজ্ঞানের মাঝে যে প্রকট দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, এটি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রকৃতিপূজারি রোমান সাম্রাজ্যে খ্রিষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে চতুর্থ শতাব্দীতে। খ্রিষ্টধর্মের প্রকৃত একত্ববাদের শিক্ষা দ্বারা পৌত্তলিক রোমানদের প্রভাবিত করার পরিবর্তে খ্রিষ্টধর্ম নিজেই পৌত্তলিকদের রীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একজন রোমান সম্রাট হিসেবে কন্সটানটাইন, খ্রিষ্টান আর রোমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে মিশ্রিত করে এক সংকর ভাবধারার প্রচলন করে। ফলাফল, আজকের বিকৃত খ্রিষ্টধর্ম। এই বিকৃত খ্রিষ্টধর্মই পুরো ইউরোপ জুড়ে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে আছে। পুরো মধ্যযুগ ধরে "খ্রিষ্টধর্মের" এই রূপের আড়ালে ক্যাথলিক চার্চ ইউরোপে মানুষের সামগ্রিক জীবনযাত্রা একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। এর ফলে বাইবেলের ব্যাখ্যায় পোপের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গৃহীত হয় এবং সে হিসেবে পোপ হয়ে ওঠেন রাষ্ট্রের ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক জীবনে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। খ্রিষ্টধর্মের কিতাবের বাণী নয়, বরং পোপের ব্যাখ্যাই ছিল সমস্ত ধর্মীয়, বৈষয়িক এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উৎস।

ফলে, ১৫শ' শতকের দিকে, ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠে। এই "প্রোটেস্ট" বা প্রতিবাদের মূল আপত্তি ছিল ত্রিতত্ত্ববাদ(trinity), পাপ স্বীকার(confession) ইত্যাদি ধারণা। এগুলো প্রকৃত খ্রিষ্টধর্মের অংশ নয়। মার্টিন

লুথার, কেলভিন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যে সংস্কার নীতিমালা প্রস্তাব করেন তাতে তৎকালীন প্রচলিত খ্রিষ্টধর্মের অনেক রীতিনীতির বিরোধিতা করা হয়। ঐশ্বরিক বাণীর ব্যাখ্যায় পোপের একচেটিয়া আধিপত্যের উপর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়। আরও কিছু বিষয় যেমন ত্রিতত্ত্ববাদ বা ট্রিনিটি (trinity)কেও বাতিল ঘোষণা করা হয়। এই ত্রিতত্ত্ববাদ রাসূল ঈসা ﷺ এর আনীত শিক্ষার পরিপন্থী। এই পর্যায়েই রোমান ক্যাথলিক চার্চ থেকে ভিন্ন মতাদর্শী নতুন আরেক ভাবধারার খ্রিষ্টান চার্চের আবির্ভাব হয়। যার নাম "প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চ" (ইংরেজি 'protest' শব্দ থেকে উদ্ভূত)। এটি ছিল যিশুর (ঈসা ﷺ) প্রকৃত শিক্ষা বিকৃত করার প্রাথমিক পরিণাম।

এ ঘটনার দু'শ বছর পর আমরা দেখতে পাই যে, চার্চের পক্ষ থেকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়া, বানোয়াট, ভ্রান্ত আর ভ্রমাত্মক বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দানা বেঁধেছে। ক্যাথলিক চার্চ তার শিক্ষার সাথে বিরোধপূর্ণ বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনকে সহিংসভাবে দমন করতে চেষ্টা করে। এইসব কিছুই করা হতো ধর্মের দোহাই দিয়ে। বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন বিষয়াদিতে চার্চের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলায় সত্যিকারের অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের চার্চের তোপের মুখে পড়তে হয়। বাড়তে থাকে চার্চ এবং বিজ্ঞানের ঐতিহাসিক সংঘাত। এই নভেম্বরে (২০১০) লন্ডনের রয়্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার ৩৫০ বছর পূর্ণ হলো। প্রায় বারোজনের মতো বিভিন্ন বিষয়ের বিজ্ঞানীরা এক হয়ে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা পদ্ধতি প্রণয়নের কৃতিত্ব এদেরকে দেওয়া হয়। পশ্চিমা বিশ্বে এরাই বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা বের করা, পরস্পরের গবেষণা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা(peer review) আর পরিকল্পিত বিশ্লেষণ করার প্রক্রিয়া শুরু করেন। আজ পশ্চিমা বিশ্ব এটিকে আধুনিক বিজ্ঞানের সূতিকাগার হিসেবে কৃতিত্ব দিয়ে থাকে। খেয়াল করার ব্যাপার হলো, এই উদ্যোগকে চার্চের প্রচলিত শিক্ষার প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। পরবর্তীতে এটাকে ব্যাপক পরিসরে "ধর্মের" বিরুদ্ধেই চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা হয়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখা গেল চার্চের একচ্ছত্র আধিপত্য খর্ব হতে চলেছে। এর মূল কারণ ছিল, বস্তুজগৎ সম্পর্কে চার্চের ভিত্তিহীন বিচার বিশ্লেষণ এবং সে বিচার-বিশ্লেষণ চাপানোর লক্ষ্যে তাদের অন্যায়ভাবে বল প্রয়োগ। ঈসা ﷺ আনীত বিশুদ্ধ তাওহীদবাদী শিক্ষাকে নষ্ট করে ফেলার কারণেই ঘটনা এতদূর গড়িয়েছিল। এতে করে ইউরোপের দার্শনিক সমাজে ধর্ম একটি বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে মানুষ ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করা আরম্ভ করলো। অথচ পূর্বে যুক্তি ছিল ধর্মের অধীন আর চার্চের কর্তৃত্ব ছিল প্রশ্নাতীত। এ অবস্থায় জ্ঞানের উৎস আর পথনির্দেশিকা হিসেবে যুক্তি আর বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা সর্বাধিক গুরুত্ব পেতে শুরু করে। রাষ্ট্রনীতি, আইন, শিষ্টাচার এমনকি ধর্মীয় জ্ঞানের উৎস হিসেবেও মানুষ ধর্মের বদলে যুক্তিকে বেছে নেয়। এইসব "জ্ঞান" মূলত ছিল দার্শনিকদের চিন্তাধারার প্রতিফলন। এই যুগ ইতিহাসে আলোকপ্রাপ্তির যুগ, মানবতার যুগ, দেবত্বের যুগ নামে পরিচিত। হ্যাঁ, দেবত্বের যুগ এইজন্য যে দার্শনিকরা "বুদ্ধি" আর "যুক্তি" কে ঈশ্বরের সমকক্ষ বা তার চেয়েও বড় মনে করত। তাদের কাছে ঈশ্বর ছিলেন এক বহিরাগত সত্তা। এই দুনিয়ার কার্যকলাপের ব্যাপারে তার কোনো অধিকার বা যোগসূত্রও নেই। তারা মানুষকে শিক্ষা দিত যে, সকল আধিপত্য "মেধা"র এবং একমাত্র মেধাশক্তির। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মকে কর্তৃত্বের আসন থেকে হটানো। চার্চের দূষিত শিক্ষার ফলে ধর্ম, রাষ্ট্রনীতি ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় জীবনের যে বেহাল দশা হয়েছিল, তা থেকে পরিত্রাণ পেতেই তারা এ লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই ভাবধারার নতুন বিবর্তন ঘটে। এই পর্যায়ে এসে এক শ্রেণির মানুষ মনে করলো যে ধর্মকে জীবনের নানা ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত করার চেষ্টায় "আলোকপ্রাপ্তির যুগ (Age of enlightenment)" যতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা যথেষ্ট নয়। খেয়াল করুন, এর আগ পর্যন্ত দার্শনিকেরা কখনো ধর্মকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেনি। তারা ধর্মকে যুক্তি দিয়ে বিচার করে গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছিল। তারা চেয়েছিল যুক্তি এবং বাস্তবসম্মত জ্ঞানের আলোকে ধর্মসহ অন্য সকল জ্ঞান বিচার করা হবে। কিন্তু নব উদ্ভাবিত এই চিন্তাধারা অনুভব করা যায় না এমন সকল কিছুকে অস্বীকার করলো। যা দেখা যায় না তার অস্তিত্ব মেনে নিতে তারা রাজী নয়। অবস্থা এমন দাঁড়ালো যে ধর্মকে কেবল নির্বাসিতই করা হলো না বরং একে সমূলে উৎপাটনের চেষ্টা শুরু হলো। মানুষের স্বভাবগত বুদ্ধিবৃত্তি, সহজাত যুক্তি এবং মূল্যবোধ লোপ পেতে থাকলো। সেখানে জায়গা করে নিল প্রকৃতিগত আর জৈবিক প্রবৃত্তি। নব উদ্ভাবিত এই বস্তুবাদী দর্শন অনুযায়ী, যা বাহ্যত দেখা যায় না তার সবই ধোঁকা। কার্যত, এই সময়কালেই বিজ্ঞানকে প্রকাশ্যভাবে ধর্মের (মূলত, ক্যাথলিক চার্চ) বিরুদ্ধে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। আবারো মনে করিয়ে দেই, চার্চ কর্তৃক ধর্মের বিকৃতি সাধন, নতুন তত্ত্ব সংযোজন এবং এগুলোকে ইউরোপের মানুষের উপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার ফলেই এমনটি হয়েছিল। ব্যাপারটা কিন্তু এমন নয় যে,

বৈজ্ঞানিক প্রমাণ থাকার কারণে ডারউইন আল্লাহ্‌কে মানুষ সৃষ্টির কৃতিত্ব দিতে অস্বীকার করেছিল। আমার মনে পড়ে, কলেজে আমাদের "সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব" বিষয়টি পড়ানো হয়। সেই ক্লাসে আমি জেনে খুব অবাক হয়েছিলাম যে, বানর থেকে মানুষে রূপান্তর কখন কীভাবে হয়েছিল সে ব্যাপারে ডারউইন কোনোরকম তত্ত্ব দাঁড় করায়নি। বরং তার মূল উদ্দেশ্য ছিল চার্চের বিরোধিতা করা।

১৬৩৬ সালে আমেরিকার ম্যাসাচুসেটসে, খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি স্থাপন করা হয়েছিল। আর আজকে যদি কেউ গুরুত্বসহকারে ধর্মশিক্ষার ক্লাস করতে চায় তবে তাকে অনেক দূর হেঁটে নির্জন আর আলাদা একটা ধর্মীয় স্কুলে যেতে হয়। অথচ দু'শ বছরেরও বেশি সময় পর্যন্ত এর মূলমন্ত্র ছিল 'Christ et Ecclesiae' (যিশু এবং গীর্জার উদ্দেশ্যে)। ১৮৪৩ সালে এই মূলমন্ত্র পরিবর্তন করে রাখা হয় 'Veritas' (সত্য)।

এভাবেই ধর্মের (বিশেষভাবে পশ্চিমা ধ্যানধারণায়) সাথে বিজ্ঞানের ব্যবধান আর সংঘাত বাড়তে থাকে। এসবই ছিল চার্চ কর্তৃক কয়েক শতাব্দীব্যাপী ধর্ম বিকৃতির প্রত্যক্ষ ফল। অতএব, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি শেষ অবতীর্ণ আসমানী কিতাব কুরআনকে অপরিবর্তনীয় রেখেছেন। উপরন্তু, বৈজ্ঞানিকভাবে স্বীকৃত বিষয়াবলী আর ইসলামের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি নেই।

তারিক মেহান্না,
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি,
আইসোলেশন ইউনিট, সেল #১০৮।
তারিখ: সোমবার, ২০শে রবিউস-সানি ১৪৩১ হিজরি/৫ই এপ্রিল, ২০১০।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৫)

আল্লাহ্ ﷻ কুরআনে সূরা বাকারায় বলেন,

> “অতঃপর তোমরাই পরস্পর খুনাখুনি করছ এবং তোমাদেরই একদলকে তাদের দেশ থেকে বহিস্কার করছ। তাদের বিরুদ্ধে পাপ ও অন্যায়ের মাধ্যমে আক্রমণ করছ। আর যদি তারাই কারও বন্দী হয়ে তোমাদের কাছে আসে, তবে বিনিময় নিয়ে তাদের মুক্ত করছ। অথচ তাদের বহিষ্কার করাও তোমাদের জন্য অবৈধ। তবে কি তোমরা গ্রন্থের কিয়দংশ বিশ্বাস কর এবং কিয়দংশ অবিশ্বাস কর? যারা এরূপ করে পার্থিব জীবনে দুর্গতি ছাড়া তাদের আর কোনো পথ নেই। কিয়ামতের দিন তাদের কঠোরতম শাস্তির দিকে পৌঁছে দেয়া হবে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বে-খবর নন।” [২:৮৫]

এই আয়াতে বনী ইসরাঈলের একটি ঐতিহাসিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে। তারা কখনোই তাদের গোত্রের বা সমাজের মানুষকে ভুলে যায় না।

ইউশা ইবনে নুন ﷺ এর মৃত্যুর পরে বনী ইসরাঈলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। তাদের এক গোত্র অন্য গোত্রকে আক্রমণ করতে থাকে এবং নিজ ভূমি থেকে তাড়িয়ে বহিঃশত্রুর হাতে নিজেদের ভাইদের তুলে দিতে থাকে। এরপরও তাদের মধ্যে একটি গুণ তখনও বিদ্যমান ছিল। আর তা হলো তাদের গোত্রের কেউ বন্দী হলে তারা তাকে উদ্ধার করতে ব্যস্ত হয়ে যেত। যদিওবা তারা নিজেরাই প্রাথমিকভাবে এসব শুরুর পেছনে দায়ী! আজকেও আপনারা তাদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য দেখতে পাবেন। যখনই কোনো ইসরাইলী সৈন্যকে বন্দী করা হয় তখনই তারা তাকে উদ্ধারে সচেষ্ট হয়ে পড়ে। ২০০৬ সালে গোটা ইসরাইলী বাহিনীর লেবানন আক্রমণের পেছনে অজুহাত ছিল গুটিকয়েক ইসরাইলী সৈন্যকে মুক্ত করা। এমনকি ইসরাইলীরা যখন হামাসের সাথে প্রায়ই বন্দী বিনিময় করে তখন বন্দী বিনিময়ের অনুপাতটি বেশ চমকপ্রদ। যেমন দশ হাজার প্যালেস্টাইনীর বিনিময়ে মাত্র তিন জন ইসরাইলী সৈন্য! এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যটি বনী ইসরাঈল আজও ধরে রেখেছে। শত্রুর হাতে পতন আসন্ন হয়ে পড়লেও তারা যেকোনো মূল্যে তাদের বন্দী ভাইকে মুক্ত করার চেষ্টা করে।

প্রথম যুগের মুসলিমরা তাঁদের বন্দী মুসলিম ভাইদের উদ্ধারের ব্যাপারে ঠিক এমনই যত্নশীল ছিলেন। ‘উমার ইবন ‘আবদুল আজিজ ﷺ মুক্তিপণের অঙ্কের ব্যাপারে পরোয়া না করেই মুসলিম বন্দীদের ছাড়িয়ে আনার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। আল ইমাম আল আওযা’ই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে চিঠি লিখে আবু জা’ফর আল মানসুরকে নিয়মিত স্মরণ করিয়ে দিতেন যেন রোমানদের হাত থেকে মুসলিম বন্দীদের যেভাবেই হোক উদ্ধার করা হয়। মুসলিম বন্দীদের উদ্ধারের ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ ﷺ ছিলেন নিবেদিত এক অক্লান্ত প্রাণ। চিঠি লিখে, সমঝোতা করে, যুদ্ধ করে হলেও তিনি মুসলিম বন্দীদের মুক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। আল হাজ্জাজ ও আল মু’তাসিমের মতো অত্যাচারী মুসলিম শাসকরাও কুফফারদের কারাগারে বন্দী এক-দুইজন মুসলিমকে উদ্ধার করতে সমগ্র শহরে আক্রমণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। আল মানসুর বিন আবু ‘আমির ঘোড়ার পিঠে চড়ে কর্ডোভা থেকে উত্তর আন্দালুসিয়ায় গিয়েছিলেন! শুধুমাত্র এক মুসলিম বন্দীর মায়ের অনুরোধে খ্রিষ্টানদের হাতে আটক তার ছেলেকে উদ্ধারের জন্য।

এটাই আমাদের ইতিহাস। এটাই আমাদের ঐতিহ্য; যা বিশ্বস্ততা, সাহসিকতা আর নিঃস্বার্থতার কাহিনিতে পূর্ণ। সেটা ছিল এমন একটা সময় যখন মানুষ নিজের আরাম আয়েশের উপরে অন্যের স্বস্তি আর নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দিত। তাঁদের জীবন থেকে শিক্ষা নিন। বনী ইসরাঈলের উদাহরণের উপরও দৃষ্টিপাত করুন। হৃদয় থেকে কাপুরুষতা ঝেড়ে ফেলুন। স্বার্থপর ধ্যানধারণা ভুলে গিয়ে উম্মাহ্র প্রতি আরো অনুগত, বিশ্বস্ত ও দায়িত্বশীল হোন। নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হওয়ার এটাই সময়। কিভাবে একজন মানুষ নিজেকে মুসলিম সমাজের ‘‘সক্রিয় কর্মী’’ বলে দাবি করতে পারে যখন তাদের ভাইরা (শুধু ভাই নয়, এখন আমাদের বোনেরাও) কানাডা, আমেরিকা, গুয়ান্তানামো বে, ব্রিটেন, ভারত ইত্যাদি দেশের কারাগারে বন্দী রয়েছে? অথচ সে তাদের উদ্ধারের ব্যাপারে কোনো ভূমিকাই পালন করছে না! আর কতজন বন্দী হলে আপনি এগিয়ে আসবেন? পশ্চিমা ‘আলেম’রা পরিষ্কারভাবেই এই ব্যাপারে নিজেদের অনাগ্রহ বুঝিয়ে দিয়েছেন। কাজেই তাদের আশা ছেড়ে দিন। রাসূল ﷺ ছিলেন একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, সামরিক প্রধান, স্বামী, পিতা, শিক্ষক এবং আল্লাহর রাসূল। এই শত ব্যস্ততাও তাঁকে অত্যাচারিত মুসলিমদের নাম মনে রাখতে ও তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ানো থেকে ভুলিয়ে রাখতে পারেনি। আবু হুরায়রা ﷺ হতে বর্ণিত যে, রাসুল ﷺ তাঁর দু’আতে মু’মিনদের নামগুলো ধরে ধরে উচ্চারণ করে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতেন। তিনি বলতেন, **“ও আল্লাহ্! আল ওয়ালিদ বিন আল ওয়ালিদ, সালামাহ বিন হিশাম এবং আইয়াশ বিন আবু রাবিয়াহ সহ সকল**

অত্যাচারিত মু'মিনদের তুমি উদ্ধার করো।" প্রকাশ্যে ও জনসম্মুখে তিনি মযলুমদের জন্য দু'আ করতেন।

নিজের সমাজের মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা ফিতরাতের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য। এটাকেই বনী ইসরাঈলীরা নিজেদের মাঝে ধরে রেখেছিল। কিন্তু এটা মুসলিমদের জন্য সত্যিই দুর্ভাগ্যজনক যে, এই ক্ষেত্রটিতে আমরা তাদের অনেক পেছনে পড়ে আছি। এটি লজ্জার বিষয় যে, আমরা আমাদের ধর্মীয় ঐতিহ্য রক্ষায় লজ্জাজনকভাবে ইহুদিদের কাছে পরাস্ত হচ্ছি।

তারিক মেহান্না,
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি,
আইসোলেশন ইউনিট, সেল #১০৮।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৬)

সূরা বাকারাহ এর ৯৩ নং আয়াতে আল্লাহ্ বনী ইসরাঈলদের ব্যাপারে বলেছেন,

> "আর যখন আমি তোমাদের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিলাম এবং তূর পর্বতকে তোমাদের উপর তুলে ধরলাম যে, শক্ত করে ধর আমি যা তোমাদের দিয়েছি আর শোন। তারা বলল, আমরা শুনেছি আর অমান্য করেছি। কুফরের কারণে তাদের অন্তরে বাছুরপ্রীতি পান করানো হয়েছিল। বলে দিন, তোমরা বিশ্বাসী হলে তোমাদের সে বিশ্বাস মন্দ বিষয়াদি শিক্ষা দেয়।"

মুসা ﷷ যখন আল্লাহর সাথে কথা বলার জন্য সিনাই পর্বতে গেলেন, বনী ইসরাঈল তখন চঞ্চল ও অস্থির হয়ে পড়ল। তারা আল্লাহর পাশাপাশি ইবাদাতের জন্য অন্য দেবতা খোঁজা শুরু করল। এরই মধ্যে তারা সোনার তৈরি একটি কৃত্রিম বাছুরের ইবাদাত শুরু করে দিল। এই বাছুরটিকে পূজা করার প্রতি তাদের প্রবল অনুরাগকে ব্যাখ্যা করতে আল্লাহ 'উশরিবু' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু পান করা, শুষে নেওয়া। অর্থাৎ তাদের এই ভ্রষ্টতা ও বিপথগামিতাকে আল্লাহ তরল কিছু পান করা বা শুষে নেওয়ার সাথে তুলনা করেছেন।

কুরআন এবং সুন্নাহর অন্যান্য জায়গাতে ইলম এবং হিদায়াহ গ্রহণ করার বিষয়টিকেও এই পান করা বা শুষে নেওয়ার উপমাটি দেওয়া হয়েছে। আল-বুখারি এবং মুসলিমে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, যেখানে রাসূল ﷺ বলেছেন, **"আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে হিদায়াহ ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হলো যমীনের উপর পতিত প্রবল বৃষ্টির ন্যায়... আল্লাহ্ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন। মানুষ তা থেকে পান করে তৃষ্ণা মেটায়"** (সহিহ বুখারী :: খন্ড ১ :: অধ্যায় ৩ :: হাদিস ৭৬)। বুখারি ও মুসলিমের অন্য একটি হাদীসে এসেছে, **"আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। (স্বপ্নে) আমাকে একটি দুধের পাত্র দেওয়া হলো। আমি তা থেকে পান করতে লাগলাম। অবশেষে তা আমার নখের নিচ থেকে বেরিয়ে আসা শুরু করলে অবশিষ্ট দুধসহ পাত্রটি 'উমার ইবনুল খাত্তাবকে দিয়ে দিলাম।"** সাহাবিগণ ﵃ জিজ্ঞাসা করলেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী? তিনি ﷺ

বললেন, **"এই দুধ হচ্ছে ইলম"** (সহিহ মুসলিম :: বই ৩১ :: হাদীস ৫৮৮৮ এবং সহিহ বুখারী :: খণ্ড ৫ :: অধ্যায় ৫৭ :: হাদীস ৩০)।

ইসরা' এবং মি'রাজ এর হাদীসেও এমনটি আছে, রাসূল ﷺ বলেন, **"এরপর আমার সম্মুখে দুটি পাত্র পেশ করা হয়, এর একটি দুধের ও অপরটি মদের। আমাকে বলা হলো, এর মধ্যে যেটা আপনার ইচ্ছা সেটা গ্রহণ করুন। আমি দুধ গ্রহণ করে তা পান করলাম। জিবরীল ﷺ আমাকে বললেন: আপনাকে ফিতরাতেরই হিদায়াত করা হয়েছে। আপনি যদি মদ গ্রহণ করতেন, তবে আপনার উম্মাত গোমরাহ হয়ে যেত"** (সহিহ মুসলিম :: খণ্ড ১ :: হাদীস ৩২২)।

পানীয় দ্বারা যেমন দেহের তৃষ্ণা মেটে, তেমনি হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটে সঠিক জ্ঞান ও পথনির্দেশিকার দ্বারা। তৃষ্ণা পেলে মানুষ শুধু স্বাস্থ্যকর ও বিশুদ্ধ জিনিস পান করে। এক গ্লাস পানিতে মাত্র এক ফোঁটা কালি পড়লেও কেউ সেই দূষিত পানি পান করতে চাইবে না। তেমনি হৃদয় ও মনের তৃষ্ণা মেটাতে হলে প্রয়োজন বিশুদ্ধ ও পবিত্র উৎস থেকে উৎসরিত জ্ঞান এবং পথনির্দেশিকা। রাসূল ﷺ এভাবেই সাহাবাদের ﷺ বিস্ময়কর প্রজন্মকে বিশুদ্ধ উৎস এবং ঐশ্বরিক পথনির্দেশিকার ছাঁচে গড়ে তোলেন। যার ফলে তাদের হৃদয় এবং মনন এমনভাবে গড়ে ওঠে, যা বিচক্ষণতা এবং জ্ঞানে অতুলনীয়। সাহাবাদেরকে ﷺ শুধু কুরআন এবং সুন্নাহর আদর্শে গড়ে তোলার এই প্রক্রিয়া অন্য কোনো উৎসের অভাব থেকে জন্ম নেয় নি, কিংবা তা ওয়াহী ব্যতীত বিকল্প কোনো দিকনির্দেশনা থেকেও আসে নি। বরং এই প্রচেষ্টা সুচিন্তিত এবং ওয়াহী দ্বারা সুপরিকল্পিত। সায়্যিদ কুতুব ﷺ বলেছেন,

> *"মহাগ্রন্থ আল কুরআন থেকেই সাহাবায়ে কেরাম ﷺ তাদের প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ গ্রহণ করতেন। তারা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে কুরআনের ছাঁচে গড়ে তুলেছিলেন। কথা হলো-কেন তারা কুরআনকে এভাবে গ্রহণ করতেন? অন্য কোনো সভ্যতা, সাহিত্য, শিক্ষাকেন্দ্র, বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি না থাকার কারণে বাধ্য হয়েই কি তারা কুরআনকে এমন পরমভাবে গ্রহণ করেছিলেন? কিছুতেই নয়, কস্মিনকালেও এটা সত্য নয়।*
>
> *প্রকৃত ইতিহাস ঘাঁটলে দেখতে পাবো, তৎকালীন রোমান সভ্যতা ও রোমান আইনশাস্ত্রকে আজও ইউরোপে সভ্যতার আদি মডেল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। সে যুগের গ্রীক যুক্তিবিদ্যা, গ্রিক দর্শন, শিল্পসহ সাহিত্যকে আজও পাশ্চাত্য উন্নত চিন্তাধারার অন্যতম প্রধান উৎস*

হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পারস্য সভ্যতা, তাদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাও সে যুগে ছিল অত্যন্ত সুগঠিত ও ঐতিহ্যবাহী হিসেবে সুপরিচিত। আরবের কাছে ও দূরে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আরও অনেক সভ্যতা তখন বিদ্যমান ছিল; তাতে চীন ও ভারতের কথা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আরবের উত্তরে ছিল রোমান সভ্যতার কেন্দ্রভূমি, আর দক্ষিণে ছিল পারস্য সভ্যতা। সুতরাং একজন সুস্থ চিন্তার মানুষ একথা বলতে পারে না যে, সাহিত্য, সভ্যতা ও সুগঠিত কোনো ব্যবস্থার অনুপস্থিতির কারণে সে যুগের মুসলমানরা কুরআনকে তাদের একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করেন। বরং একটি সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়ায় এই প্রজন্মটি সুনির্দিষ্টভাবে শুধুমাত্র কুরআন এবং সুন্নাহ্ থেকে নিজেদের জ্ঞানের তৃষ্ণা মেটান যার ফলে ইতিহাসে তারা এক অনন্য স্থান লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তীতে বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই সরোবরের সাথে অন্য উৎসের মিশ্রণ ঘটিয়ে ফেলা হয়...''

সাহাবাদের ﷺ জন্য কুরআন ছিল এক আলো যা দ্বারা তাঁরা বিশ্বকে চিনতে, জানতে এবং বুঝতে পারতেন। কুরআনকে তাঁরা বুঝতেন কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই। অন্য কোনো মতবাদ, ওয়ার্ল্ডভিউ বা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কুরআনকে বোঝা বা ব্যাখ্যা করার কোনো প্রয়োজনই হয়নি, বরং এ ধরনের প্রয়াসকে বাতিল বলে বিবেচনা করা হয়। রাসুল ﷺ বেশ কঠোর ভাবে নিশ্চিত করেছিলেন যেন সাহাবারা ﷺ কুরআনকে কুরআনের মতো করেই বোঝেন, অন্য কোনো আদর্শ বা মতবাদের সংমিশ্রণ যেন তাঁদের হৃদয়-মনকে কলুষিত করতে না পারে। সাহাবাদের ﷺ যুগে এই বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ বজায় রাখা হয়েছিল, তাই উম্মাহকে সঠিক পথে পরিচালিত করা সম্ভব হয়েছিল। তারা ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী। সাহাবাদের ﷺ সময়ের শেষদিকে তাবি'ইনদের যুগে এসে তাঁদের জ্ঞানের বিশুদ্ধ উৎসগুলো আর অনন্য থাকেনি। যার ফলে ঐ সময় কাদেরিয়াদের আবির্ভাব ঘটেছিল, বসরায় আবির্ভাব হয়েছিল মু'তাযিলাদের, খুরাসানে আবির্ভাব হয়েছিল জাহ্মিয়াহদের এবং এমন আরো অনেক সম্প্রদায়। মুসলিমদের মধ্যে এই ধরনের বিজাতীয় বিশ্বাস ও মনগড়া মতবাদের উদ্ভব ও বিস্তার লাভের কারণ হলো ইসলামকে ভিনদেশী মতবাদ ও দর্শনের আলোকে বুঝতে চেষ্টা করা।

আজ গ্রিক ও পার্সিয়ানদের সভ্যতা, সাহিত্য আর দর্শনের দিকে খেয়াল করলে আমাদের বোধগম্য হবে যে এদের কিছু বিশ্বাস ও চিন্তা চেতনার সাথে ইসলামের সংমিশ্রণে এই সকল ভ্রান্ত মতবাদ ও জামাতের উদ্ভব হওয়া শুরু হয়েছে তাবে'ইনদের যুগ থেকে। কুরআনকে কুরআনের মতো করে বুঝতে হবে। রাসূল

ﷺ এর দৃষ্টিতে কুরআনকে বুঝতে হবে। পূর্ববর্তী সালাফগণ কুরআনের বিধি বিধান যেভাবে দেখেছেন ও মেনেছেন সেভাবে আমাদেরকেও বুঝতে হবে। অথচ কুরআনকে আজ বিচার করা হচ্ছে পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গিতে, তাদের তথাকথিত ‘সভ্য’ চোখে তারা ঠিক করে দিচ্ছে কুরআনের কতটুকু মানা যাবে আর কতটুকু ছেড়ে দিতে হবে। আজকের আরবরা পশ্চিমা সভ্যতা দেখে বিমুগ্ধ, অথচ সভ্যতার অর্থ এবং প্রকৃত জ্ঞানের মালিক ছিল তারাই যখন তারা কুরআন এবং সুন্নাহর অনুসরণ করত। বিশুদ্ধ ও পবিত্র সেই এক গ্লাস পানিকে এখন দূষিত ও অপবিত্র করা হচ্ছে যা হৃদয় ও মননের জন্য খুবই বিষাক্ত ও ক্ষতিকর। ইসলামের সাথে বিজাতীয় মতাদর্শ মিশে দূষিত হওয়ার যে ঝোঁক সৃষ্টি হয়েছিল ইমাম আহমাদ رحمه الله তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছিলেন এবং ইসলামের বিশুদ্ধতাকে যথাযথভাবে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন। আর শুধু একারণেই আল মু’তাসিমের হাতে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বালের رحمه الله মতো বীরদের জেল-যুলুম ও নির্যাতনের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে। সে সময়ে ইসলামের বিশুদ্ধ উৎসের ভেতরে বিজাতীয় মতবাদ ঢুকে পড়ার কারণে ইসলামী আক্বীদাহ্‌র কিছু বিষয় দূষিত হয়েছিল, যেমন আল্লাহর অবস্থান এবং গুণাবলি সংক্রান্ত বিষয়াদি।

কিন্তু বর্তমানে, এই দূষণ এমন সব বিষয়তেও ছড়িয়ে পড়েছে যা আগে দেখা যায়নি। উদাহরণস্বরূপ, আল মু’তাসিম মু’তাযিলাহ মতবাদের বিরোধিতার কারণে ইমাম আহমাদকে বেত্রাঘাত করেছিলেন ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি তিনি কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ অব্যাহত রেখেছিলেন। কেবল একজন অত্যাচারিত মুসলিমকে উদ্ধার করার জন্য তিনি অভিযান প্রেরণ করেন এমন ঘটনাও ঘটে। যদিও তার আক্বীদাহ্‌ তাত্ত্বিক দিক দিয়ে দূষিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু বিশ্বের প্রতি তার যে সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি (worldview) তা ছিল অবিকল কুরআনের শিক্ষার অনুরূপ। মুসলিমদের সম্মান ও গৌরব ধরে রাখতে তিনি তখনও দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন। তার মধ্যে তখনও নিঃস্বার্থতা এবং মুসলিমদের প্রতি বিশ্বস্ততা অটুট ছিল। তিনি ইসলাম এবং কুফরের দ্বন্দ্বকে অনুধাবন করতে তখনও ভুলে যাননি। মুসলিমদেরকে যেকোনো মূল্যে রক্ষা করার ব্যাপারে তার মধ্যে তখনও প্রবল ঈর্ষা কাজ করত। শত্রুর আচঁড় থেকে মুসলিমদের রক্ষা করার ব্যাপারে তিনি ছিলেন দৃঢ়চেতা। তিনি বিশ্বকে দেখতেন এবং বিচার করতেন প্রথম যুগের মুসলিম এবং সালাফগণের দৃষ্টিভঙ্গিতে। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি তাদের মধ্যে জন্ম নিয়েছিল কুরআনের সূরা আলে-ইমরান, আন-নিসা, আল-আনফাল এবং আত-তাওবার স্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন আয়াতগুলো সঠিকভাবে আত্মস্থ করার মাধ্যমে। কুরআনের বিষয়বস্তু আল মু’তাসিমের মতো মু'তাযিলাহ শাসকও অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন, আর আজ কুরআনের অর্থ বিকৃত হচ্ছে শুধুমাত্র

পশ্চিমা দৃষ্টিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ কুরআনকে বিবেচনা করার জন্য। বিজাতীয় পশ্চিমা ছাঁকুনি দ্বারা কুরআনের জ্ঞানের বারিধারাকে ছেঁকে ফেলার কারণে আজকে পশ্চিমা মুসলিমদের মধ্য থেকে হারিয়ে যাচ্ছে সেই উপলব্ধিগুলো যা মু'তাসিম মু'তাযিলাহ হয়েও অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। 'আল ওয়ালা ওয়াল বারা' অর্থাৎ শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালোবাসা আর শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা বিষয়টি সাহাবারা ﵃ হৃদয়ঙ্গম করে অভ্যাসে পরিণত করেছিলেন। আর আজ সাহাবাদের ﵃ সেই আদর্শ পুঁজিবাদী মানসিকতার আত্মকেন্দ্রিক চিন্তাচেতনা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। এই পুঁজিবাদী ধ্যানধারণা এই সমাজকে এমনভাবে দূষিত করেছে যে, কিছু সংখ্যক ''আলেম'' যারা কিনা মু'তাসিমের চেয়েও দ্বীনের জ্ঞান বেশি রাখেন, তারাও কুরআনের পরিভাষায় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদরত মুসলিমদের ''মুজাহিদ'' সম্বোধন না করে পশ্চিমা মিডিয়ার পরিভাষা ''জঙ্গি'' ব্যবহার করেন। তাই বলা যায় যে, কুরআনের সঠিক জ্ঞান, পথ নির্দেশ, অভিমত আজ দূষিত হচ্ছে পশ্চিমা ঔপনিবেশিক দৃষ্টিতে কুরআনকে বিবেচনা করার জন্য।

এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে, আত্মার প্রশান্তির জন্য একটি বিশুদ্ধ উৎস খুঁজে বের করা। গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা শাস্ত্র, কৃষি, প্রযুক্তিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়াবলির ক্ষেত্রে যেকোনো উৎস থেকে নিরাপদে জ্ঞান আহরণ করা যায়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, জীবন ব্যবস্থা, সাংসারিক ও বৈষয়িক চিন্তাচেতনা–যা আল্লাহ্ আমাদের উপর কুরআনে ধার্য ও উল্লেখ করে দিয়েছেন–তা আমাদের গ্রহণ করতে হবে সেই বিশুদ্ধ উৎস থেকেই। আমাদেরকে তা গ্রহণ করতে হবে কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, পশ্চিমা অভিরুচি মোতাবেক নয়। আমাদের মনকে এই দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে হবে।

যদি বনী ইসরাঈলীরা মুসা ﵇ এর প্রকৃত শিক্ষাতেই অটল থাকত, তাহলে তারা অন্য মতের সাথে নিজেদের মতামতের সংমিশ্রণ করে মূর্তিপূজায় লিপ্ত হতো না; সৃষ্টিকর্তার স্থলে স্বর্ণের তৈরি বাছুরের ইবাদাতও করতো না।

তারিক মেহান্না,
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি,
আইসোলেশন ইউনিট, সেল #১০৮।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৭)

সূরা বাকারাহর ১৫২ নং আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন:

> "অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ করব"।

এই আয়াতটি নিয়ে উল্লেখ করার মতো বেশ কিছু বিষয় আছে। প্রথমত, আয়াতটি পড়ে এই ভেবে আপনার সম্মানিত বোধ করা উচিত, "দারুণ, আল্লাহ আমাকে স্মরণ করবেন?" মানুষ সাধারণত তাঁর কাজের জন্যে পরিচিত হতে ভালোবাসে। এটা হতে পারে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্র্যাজুয়েশন করা, গরিবকে খাওয়ানো, মসজিদ পরিষ্কার করা। যে কাজই হোক না কেন, যখন একজন মানুষ আপনাকে আপনার কাজের জন্যে চিনবে এবং প্রশংসা করবে তখন আপনার ভালো লাগবে। এই কারণে অনেকেই তাদের কলেজের ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট, পুরস্কার, স্মৃতিফলক এ ধরনের জিনিসগুলো দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখে। কারণ অন্যের দেওয়া এই স্বীকৃতিটাই আপনার ভালো কাজের সাক্ষ্য বহন করে। এর অন্তর্নিহিত অর্থ হলো, আপনি অন্যের মতামতকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ গুরুত্ব দেন এবং তাদের স্বীকৃতি আপনার অন্তরে গর্ববোধের জন্ম দেয়। এর মাধ্যমে আপনার কাজটির গুরুত্বও প্রতিফলিত হয়।

এখন ভেবে দেখুন, কোনো মানুষ নয় বরং মানবজাতি ও সমগ্র মহাবিশ্বের যিনি সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা, তিনি আপনাকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন! তিনি আপনার কথা আলাদা করে স্মরণ করছেন! এই ব্যাপারটি তো আপনার অন্তরকে কাঁপিয়ে তোলার কথা! এটি জানামাত্রই আপনার ভাবতে বসে যাওয়ার কথা, আচ্ছা কোন সে কাজ যার জন্য আল্লাহ আমাকে স্মরণ করছেন? আপনি ভাববেন, "এই যে যিকর (আল্লাহকে স্মরণ), এর মধ্যে কী এমন আছে যাতে আত্মনিমগ্ন হওয়ার কারণে আল্লাহ ﷻ হাজার-লক্ষ-কোটি সৃষ্টির মাঝে আমাকে স্মরণ করবেন? অথচ কাজটা কতই না সহজ! আপনি তো অন্য মানুষের স্বীকৃতি ও প্রশংসা পেয়েই সম্মানিত ও গর্ববোধ করেন, তাহলে এই আয়াতটি পড়ে যখন আপনি অনুভব করবেন সমগ্র বিশ্বের মালিক আপনাকে স্মরণ করছে, তখন কি আপনি এর চাইতেও বহুগুণ বেশি গর্ব আর সম্মান বোধ করবেন না? আর এই স্বীকৃতির তো কোনো মূল্য নির্ধারণ করা যায় না। কারণ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে।

দ্বিতীয়ত, আপনার জানা উচিত যে, যিকর দুই ধরনের : একটি অভ্যাসগত আর অপরটি ঘটে থাকে সচেতনচিত্তে। এই দুয়ের মাঝে একটি মাত্র ধরনই কেবল আল্লাহর স্বীকৃতি এনে দিতে পারে। ইবন আল-যাওজী ﷺ বলেন:

> *"একজন মানুষ হয়তো অভ্যাসের বশে অমনোযোগীভাবেই 'সুবহানাল্লাহ' বলে। অন্যদিকে একজন সচেতন ব্যক্তি সর্বদা সৃষ্টির রহস্য বা সৃষ্টিকর্তার অনন্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে চিন্তা করতে থাকে এবং সেই চিন্তা থেকে 'সুবহানাল্লাহ' বলে ওঠে। তাই, এই তাসবীহ হচ্ছে চিন্তাশীল মনের গভীর ভাবনার ফসল। সচেতন মানুষেরা এভাবেই তাসবীহ পাঠ করে। আর তারা অতীতের গুনাহের পঙ্কিলতা চিন্তা করে গভীর অনুশোচনায় ডুবে যায়। গুনাহের পরিণাম চিন্তা করে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। অনুতাপ করে। এই অনুতাপ থেকে তারা 'আস্তাগফিরুল্লাহ' (অর্থ: আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই) বলে। এটাই সত্যিকারের তাসবীহ এবং ইস্তিগফার। অথচ একজন গাফেল ব্যক্তিও হয়তো তাসবীহ এবং ইস্তিগফার করে। কিন্তু অভ্যাসের বশে, উপলব্ধি থেকে নয়। চিন্তা করে দেখুন এই দুই ধরনের যিকরের মাঝে কী আকাশ-পাতাল ব্যবধান!..."*

পরিশেষে, এই আয়াতে আমরা আল্লাহর উদারতার নিদর্শনও পাই। ভেবে দেখুন, তিনি আপনাকে স্মরণ করেন, স্বীকৃতি দেন এবং পুরস্কৃত করেন কারণ আপনি তাঁকে স্মরণ করেছেন। কিন্তু আপনি কেন তাঁকে স্মরণ করছেন? কারণ তিনি আপনার উপর রহম করেছেন বলেই তা উপলব্ধির পর আপনি তাঁর স্মরণের দিকে ধাবিত হয়েছেন, তার আগে নয়! আপনি তাঁকে স্মরণ করেছেন যখন আপনি তাঁরই দেওয়া খাবার খাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন, যে খাবার তাঁরই দেওয়া নি'আমত। আপনি তাঁর দেওয়া ঘরে প্রবেশ করছেন, যে ঘর তাঁর দেওয়া নি'আমত। আপনি তাঁরই দেওয়া নি'আমত, বিছানায় ঘুমানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁরই দেওয়া নি'আমত ঘুম থেকে উঠছেন আর তাঁর দেওয়া দৃষ্টিশক্তি ব্যবহার করছেন। তাঁরই সৃষ্টি করা প্রকৃতির বিস্ময় দেখছেন। আপনি আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে আপনার ঘরে তাঁরই দেওয়া নি'আমত শিশু সন্তানের জন্ম উপভোগ করছেন – আপনার পুরো জীবনটিই তাঁর দেওয়া উপহার আর রহমতে ভরা – সমস্ত কিছুই তাঁর দেওয়া। তাই, এই আয়াত আপনাকে বলছে যে, আল্লাহ ﷻ আপনাকে স্বীকৃতি দিচ্ছেন শুধু তাঁকে স্মরণ করার জন্যই। অথচ সেই আল্লাহর দেওয়া নি'আমতের কারণেই কিন্তু আপনি তাঁকে স্মরণ করেছেন!

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৮)

সূরা বাকারার ১৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

> হে মুমিন গণ! তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর...

জেলখানার এই ছোট্ট কামরায় এই আয়াতটির অর্থ আমার কাছে খুব পরিষ্কারভাবে ধরা দেয়। এ আয়াতে বর্ণিত সবর ও সালাতের একীভূত করার ব্যাপারটি আমি কারাগারে বসেই উপলব্ধি করতে পেরেছি। এই দুটো ইবাদাতকে একসাথে উল্লেখ করার তাৎপর্য সম্পর্কে আমি কিছু কথা বলতে চাই।

নীচের পাঁচটি পদ্ধতিতে সালাত আপনাকে ধৈর্য ধরার অর্থাৎ সবরের শিক্ষা দেয়:

সালাতের সময় আপনি মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দাঁড়ান, রুকুতে মাথা নীচু করেন এবং সিজদায় অবনত হন। সালাতের পুরো সময়টা ধরে আপনি শারীরিকভাবে নিজেকে এটাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে, আপনি একজন "নিয়ন্ত্রিত সত্তা" আর আপনি বিশ্বজগতের একমাত্র পালনকর্তা ও নিয়ন্ত্রকের ইবাদাত করছেন। এভাবে চিন্তা করলে আপনার উপর বিপদাপদ যা কিছুই আপতিত হোক না কেন সবকিছুর মাঝে হাসিমুখে, সন্তুষ্টচিত্তে বেঁচে থাকা আপনার জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়। কেননা এটা আপনাকে নিজের সঠিক অবস্থান উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। আপনি কেবলই আপনার মালিকের একজন অনুগত দাস। যে মালিকের জন্য আপনি নিজের পবিত্র মুখমণ্ডল মাটিতে স্পর্শ করেছেন, সেই মালিকই আপনাকে আজকের পরিস্থিতির সম্মুখীন করেছেন। তিনিই আপনাকে রোগ-শোক দিয়েছেন, অথবা সম্পদ থেকে বঞ্চিত করছেন, কিংবা কোনো সংকটময় পরিস্থিতির মুখোমুখি করেছেন। আপনি যখন সিজদায় মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে আনুগত্যের সাথে বলতে থাকেন: "সুবহানা রাব্বি আল-আ'লা", তখন আপনি সেই রবের সাথে আপনার সম্পর্কটিকে উপলব্ধি করেন। আপনি নিজেকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, যেভাবে আমি আল্লাহর সামনে নিজের মুখমণ্ডল মাটিতে অর্পণ করছি, ঠিক একইভাবে আমার সমগ্র সত্তাকে আল্লাহর বেঁধে দেওয়া নিয়তির কাছে নতমস্তকে সমর্পণ করলাম। সালাত আপনাকে একটি পরম বাস্তবতা

উপলব্ধি করতে শেখায়। আর তা হলো, মহান আল্লাহ ﷻ হচ্ছেন সৃষ্টিজগতের একমাত্র নিয়ন্ত্রক এবং আপনি তাঁর আজ্ঞাবহ দাস।

সালাত আপনার মধ্যে একধরনের শৃঙ্খলাবোধ গড়ে তুলবে। এই শৃঙ্খলাবোধ আপনাকে চরম অস্থিরতার মুহূর্তেও সুস্থির রাখবে। যেমন: যথাযথভাবে সালাত আদায় করার অর্থ হলো আপনাকে অবশ্যই সময়-সচেতন হতে হবে এবং নির্দিষ্ট ওয়াক্তের মাঝে সালাত আদায় করে নিতে হবে। প্রত্যেক সালাতে নির্দিষ্ট সংখ্যক রাক'আত আদায় করতে হবে। আপনাকে অবশ্যই শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় করতে হবে। কোনোক্রমেই কোনো সালাত বাদ দিতে পারবেন না। এমন আরো অনেক কিছু সালাতের ক্ষেত্রে আপনি মেনে চলতে বাধ্য। এভাবে সালাত আদায় করার মাধ্যমে আপনি নিজেকে নিয়মানুবর্তী করে গড়ে তুলতে পারবেন। আপনি জেলখানায় বন্দী বা আপনার চাকরি নেই- এই অজুহাতে আপনি সালাত ত্যাগ করতে পারবেন না। সালাত আপনাকে নিয়ন্ত্রিত করে। আপনার চরিত্র গঠন করে। যাচ্ছেতাই জীবনযাপনের অভিশাপ থেকে মুক্ত করে আপনার জীবনকে সুশৃঙ্খল করে। জীবনে এমন কিছু কঠিন সময় আসে যখন মানুষ ভেঙে পড়ে। সালাত আপনাকে এমন সময়েও ধীরস্থির থাকতে সাহায্য করবে।

সময়ের সঠিক ব্যবহারে সালাত আপনাকে সহায়তা করে। সত্যি বলতে কি, আমি এই জেলে বসে আমার দিনগুলোকে সালাতের ওয়াক্তের ভিত্তিতেই ভাগ করি। যেমন, ফজর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কিছু কাজ নির্দিষ্ট করা থাকে। আবার যোহর থেকে আসর পর্যন্ত সময়টা আমি অন্য কিছু কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখি। এমনি করে যখন জেলখানার বাকিরা দীর্ঘ, বিরক্তিকর, উদ্দেশ্যহীন সময় কাটিয়ে দিনাতিপাত করে তখন প্রতিদিনই আমার অনেকগুলো কাজ করা হয়ে যায়। অথচ জেলের বাকিদের দিনগুলো ক্যালেন্ডারের পাতার মতো। একটার সাথে আরেকটার পার্থক্য শুধু তারিখে। ধৈর্যশীল হওয়ার জন্য ফলপ্রসূ সময় কাটানোটা খুবই জরুরি।

সালাতকে আত্মার জন্য এক ধরনের ব্যায়াম বলা চলে। রাগের সময় একজন মানুষ হাত-পা নাড়িয়ে চিৎকার করে যেভাবে তার মনের জমে থাকা ক্ষোভ প্রকাশ করতে চায়, তেমনিভাবে সালাত, বিশেষ করে দু'আ, আপনার মনের কথাগুলো সর্বশ্রোতা ও জবাবদাতা আল-মুজিবের কাছে পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। আপনার যত ফরিয়াদ, যত ইচ্ছা, দুশ্চিন্তা, যত আশা, ক্ষোভ, আবেগ, মনের যত চাপা কথা আছে - সবকিছু মন খুলে বলার এইতো সময়। মনের আগল খুলে দিন। সেখান থেকে বেরিয়ে আসা প্রার্থনা আর দুঃখগুলোকে চোখের জল হয়ে

আপনার গাল ছুঁয়ে নেমে আসতে দিন। নিশুতি রাতের শুনশান নীরবতায় কুনুতের জন্য হাত তুলে বিতর সালাতে আপনার রবের সাথে কথা বলুন। আপনার একান্ত, নিজস্ব রবের কাছে আপনার মনের কথাগুলো বলুন। আপনার রব একান্তে আপনার কথাগুলো শুনবেন এবং তিনি নিজে আপনার দু'আর জবাব দেবেন। আপনার মনের অনুভূতিগুলো তাঁকে বলে ফেলুন। জমিয়ে রাখা নালিশগুলো তাঁর কাছেই করুন। যেমনটি ইয়া'কুব ﷺ করেছিলেন- "...আমি তো আমার দুঃখ ও অস্থিরতা আল্লাহর সমীপেই নিবেদন করছি..."[সূরা ইউসুফ]। সুতরাং, শরীরচর্চার মধ্য দিয়ে যেভাবে শরীরের উদ্বৃত্ত শক্তি নির্গমন হয়, সালাত তেমনি একটি আধ্যাত্মিক অনুশীলন যার মাধ্যমে আপনি মনের গহীনে জমে থাকা অনুভূতিগুলোকে সুন্দরতম উপায়ে নিঃসরণ করতে পারেন।

সবশেষে, সালাতে কুরআন তিলাওয়াতের মধ্যে দিয়ে আপনাকে প্রতিনিয়ত আখিরাতের বড় চিত্রটির কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জাহান্নামের চিরস্থায়ী বন্দীদশার বর্ণনা আপনার পার্থিব দুঃখকষ্টগুলোকে তুচ্ছ করে দেয়। জান্নাতের অবর্ণনীয় সুখের বর্ণনা আপনার চারপাশের রূঢ় বাস্তবতা থেকে আপনাকে ক্ষণিকের অবকাশ দেয়। নবী-রাসূলদের সংঘাতময় জীবন সংগ্রাম আপনার মনে সংহতির চেতনা সৃষ্টি করে। একইসাথে আপনাকে এও জানিয়ে দেয় যে, পৃথিবীর সেরা মানুষগুলোর পার্থিব জীবন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। সালাতের মাঝে কুরআন পাঠ আপনাকে আপনার চারপাশকে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে এবং সামনের বন্ধুর পথকে মসৃণ ও পরিচিত করে তোলে।

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট-সেল #১০৬

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ০৯)

সূরা বাকারার ১৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেছেন:

> “নিঃসন্দেহে ‘সাফা’ এবং ‘মারওয়া’ (পাহাড় দুটো) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, অতএব যদি তোমাদের মধ্যে কোনো লোক হাজ্জ কিংবা ওমরা আদায় করার (এরাদা করে), তাঁর জন্যে এই উভয় (পাহাড়ের) মাঝে তাওয়াফ করাতে দোষের কিছু নেই... ”

প্রথমবার দেখেই এই আয়াতের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যায় না। কিন্তু এ আয়াত নাযিলের পরিস্থিতি বর্ণনা করে যে, বিষয়টি কতখানি গুরুত্বপূর্ণ।

আস-সাফা ও আল-মারওয়া হচ্ছে মক্কার দুটি পাহাড়। নবী ইবরাহীম ﵇ ফিলিস্তিন যাওয়ার আগে তাঁর স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ঈসমাইল ﵇ কে এই পাহাড় দুটির কাছে রেখে গিয়েছিলেন। বিবি হাজেরা তাঁর পিপাসার্ত পুত্রের জন্যে একটু পানি খুঁজতে গিয়ে এই দুই পাহাড়চূড়ার মাঝে সাতবার ওঠানামা করেন (এই ওঠানামার ঘটনাটি *আস-সা’ঈ* নামে পরিচিত)। পরবর্তীতে যখন ইবরাহীম ﵇ মানুষকে মক্কায় হাজ্জ করার জন্যে আহ্বান করলেন তখন বিবি হাজেরার এই ঘটনা থেকেই হজ্জের সময় *সা’ঈ* করার প্রচলন ঘটে। পরবর্তীতে বহু-ঈশ্বরবাদ বা শিরক আরবে শিকড় গেড়ে বসে। তখন এই দুই পাহাড়চূড়ায় মূর্তি বসানো হয় আর মানুষ সা’ঈ করার সময় মূর্তিগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা শুরু করে। কালক্রমে মুসলিমরা জয়ী হলো এবং ইসলাম পৌত্তলিকতাকে পবিত্র মক্কাভূমি থেকে উৎখাত করল। বিশুদ্ধ তাওহীদের যুগে যে পদ্ধতিতে হাজ্জ পালিত হতো সেই হাজ্জ আবার ফিরে এল। কিন্তু জাহিলিয়্যাতের যুগে পৌত্তলিকতার আদলে সাফা-মারওয়ার মাঝে সা’ঈ করার যে প্রথা প্রচলিত ছিল তা বহাল থাকবে কি না তা নিয়ে মানুষের মনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হলো। কারণ সাহাবাগণ ﵃ জাহিলিয়্যাতের দাগে কলঙ্কিত প্রথাতে শামিল হতে আগ্রহী ছিলেন না। বুখারী এবং মুসলিম থেকে বর্ণিত, আনাস বিন মালিক ﵁ কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, 'আপনি কি সাফা-মারওয়ার মাঝে *সা’ঈ* করতে ঘৃণা করতেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, কারণ এটা জাহিলিয়্যার সময়কার প্রথা। কিন্তু এই ঘৃণা কুরআনের এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগ পর্যন্তই ছিল: **“অবশ্যই ‘সাফা’ এবং ‘মারওয়া’ (পাহাড় দুটো) আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম, অতএব যদি তোমাদের মধ্যে কোনো লোক হজ্জ কিংবা ওমরা আদায় করার (এরাদা করে), তাঁর জন্যে এই**

উভয় (পাহাড়ের) মাঝে তাওয়াফ করাতে দোষের কিছু নেই...”। এই প্রথাটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল কারণ এটি ছিল প্রকৃতপক্ষে ইবরাহীম ﷺ এর হাজ্জের সুন্নাহ। পরবর্তীতে মক্কার মুশরিকরা একে বিকৃত করেছিল।

এই আয়াতটি দ্বীনের প্রতি সাহাবাদের ﷺ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামের স্বতন্ত্র একটি বৈশিষ্ট্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা যেকোনো আচার-প্রথা অথবা কাজকে ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ প্রমাণ হওয়ার আগ পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। দ্বীন ইসলাম সাহাবাদের ﷺ হৃদয়, মন, আচরণ আর দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। তাদের জীবনে ইসলাম ছিল একটা বিদ্যুৎ প্রবাহের মতো যা তাদের পুরো সত্তার ভিতরে প্রবাহিত হয়ে পুনর্বিন্যাস আর পরিমার্জনের মাধ্যমে নতুন এক সত্তার জন্ম দিত। বৈদ্যুতিক প্রবাহ যখন কিছু পরমাণুর গ্রুপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তা তাদের ইলেক্ট্রন বিন্যাসকেই সম্পূর্ণরূপে পুনর্বিন্যস্ত করে ফেলে। ইসলাম সাহাবাদের ﷺ মাঝে ঠিক এই কাজটাই করেছিল। মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর থেকে সাহাবাগণ ﷺ জীবনের প্রতিটা আঙ্গিক ইসলামের আলোকে বিশ্লেষণ করতেন আর দেখতেন কুরআনের আলোতে তা কেমন দেখায়। যা কিছু ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা তাঁরা ধরে রাখতেন। আর যা কিছু ইসলামের একটুখানি হলেও বিপরীত, তার ধারে কাছেও সাহাবাগণ যেতেন না। কারণ সেগুলোকে তাঁরা জাহিলিয়্যাতের ধ্বংসাবশেষ হিসাবে বিবেচনা করতেন। সায়্যিদ কুতুব ﷺ বলেছেন :

> *“রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সময় যখন একজন মানুষ ইসলাম গ্রহণ করত, সে তৎক্ষণাৎ জাহিলিয়্যাতের সাথে নিজের সম্পর্ক ছেদ করে ফেলত। ইসলামের বৃত্তে প্রবেশ করা মাত্রই সে তার অতীত জীবনের অন্ধকারাচ্ছন্নতা থেকে মুক্ত হয়ে নতুন এক জীবনব্যবস্থা গ্রহণ করত। সে তার অজ্ঞতাপূর্ণ জীবনের কর্মকাণ্ডকে খুব সতর্কতার সাথে বিচার করত এবং তার মনে হতো ইসলামে ঐ অপবিত্র কাজগুলোর কোনো ঠাঁই নেই। এই অনুভূতিকে সাথে করে সে নতুন এক পথে চলার আশায় ইসলামের ছায়ায় এসেছিল ... এবং কুরআনের দিকে মনোনিবেশ করেছিল যেন এই কুরআনের ছাঁচে তার মন-মনন-আত্মা গড়ে ওঠে।*
>
> *শিরকের স্থলে তাদের মনে বিশুদ্ধ তাওহীদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তারা জাহিলিয়্যাতের আবহ ও চেতনা, আচার ও প্রথা এবং ধারণা ও বিশ্বাসগুলো পরিত্যাগ করে। এই সামগ্রিক বর্জন ছিল ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা জাহেলী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিস্থাপনের ফলাফল। এ ছিল দুটি ভিন্ন পথের*

বিভাজন এবং নতুন পথে যাত্রার সূচনা। এ যাত্রায় জাহিলিয়্যাতের মূল্যবোধ, চেতনা বা রীতিনীতির কোনো বালাই নেই।”

কোনো পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে যেমন করে তার ইলেক্ট্রনগুলো সম্পূর্ণ পুনর্বিন্যস্ত হয়ে পড়ে, তেমনি ইসলামও তাদের জাহেল জীবনযাত্রা এবং মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন সাধন করেছিল। জাহিলিয়্যাহর মাঝে বসবাস না করলেও তারা তাদের ব্যক্তিত্বের ছোট-বড় সবগুলো দিক ইসলামের আলোকে যাচাই-বাছাই ও মূল্যায়ন করে দেখতেন এবং সে অনুযায়ী নিজেদের ঢেলে সাজাতেন, তা যত কঠিনই হোক না কেন। তাঁদের কাছে ইসলাম ছিল এতটাই গুরুত্বপূর্ণ। আজ আমাদের সামনে তাদের মতো করে ইসলাম পালনের সুযোগ এসেছে, কেননা আমরা আজকে জাহিলিয়্যাহ প্রত্যক্ষ করছি ও তার মাঝে বসবাস করছি।

উমর ইবন আল-খাত্তাব ﷺ বলেছিলেন, “জাহিলিয়্যাহ কি তা না জেনেই যখন মানুষ মুসলিম হিসাবে বেড়ে উঠবে তখন ইসলামের বন্ধন আস্তে আস্তে এক এক করে ছুটে যেতে থাকবে।”

এই উক্তিটির উপর বক্তব্য দিতে গিয়ে ইমাম ইবন আল-কায়্যিম ﷺ বলেন :

“জাহিলিয়্যাহর গতিপ্রকৃতির ব্যাপারে জ্ঞান ও ধারণা থাকার কারণে সাহাবাগণ ﷺ ইসলাম ও এর প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়াদি, এর কর্মপদ্ধতি(methodology) এবং এর আওতাধীন বিষয়গুলো সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখতেন। ইসলামের ব্যাপারে তাঁরাই সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন। তারাই ইসলামকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তাঁরাই ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লড়াই করেছেন এবং ইসলামবিরোধী মতাদর্শের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সতর্ক ছিলেন। আর এই সব কিছুই সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র ইসলামের বিপরীতধর্মী জিনিসগুলোর ব্যাপারে তাঁদের পরিষ্কার জ্ঞান থাকার কারণে। ইসলাম যখন তাঁদের কাছে এসেছিল তখন ইসলামের সবকিছুই তাঁদের জীবনযাত্রার সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। তাই, ইসলামের বিপরীতধর্মী জিনিসগুলোর নিকৃষ্টতার সাথে তাঁদের পূর্বপরিচিতির কারণে তাঁদের আবেগ আর লড়াই ছিল অন্য সবার চেয়ে তীব্র। আর এ জন্যই ইসলামের প্রতি তাদের জ্ঞান, ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগ ছিল সবচেয়ে বেশি।

কেননা তারা ইসলামের বিপরীত বিষয়গুলোর ব্যাপারে সম্যক অবগত ছিলেন।

এটা অনেকটা এরকম যে, একজন দুঃখে জর্জরিত অসুস্থ, দরিদ্র, ভীত আর একাকী লোক হঠাৎ করেই এসব কিছু থেকে মুক্তি পেয়ে আরামদায়ক, নিরাপদ, ঐশ্বর্যময় এবং উন্নত জীবন লাভ করল। এরকম লোক তাঁদের পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকার কারণে অপেক্ষাকৃত বেশি সুখী হবে। কারণ যেই ব্যক্তির অতীতে কষ্টের অভিজ্ঞতা নেই সে এই আরামের জীবন আর কষ্টের জীবনের মাঝে যে পার্থক্য সেটা উপলব্ধি করতে পারবে না।''

আমি সবসময় আশা করতাম যে পশ্চিমের কোনো দ্বীন শিক্ষার্থী '*মাসা'য়িল আল-জাহিলিয়্যাহ*' – নামক অতুলনীয় গ্রন্থটির একটা আধুনিক সংস্করণ তৈরি করার দায়িত্ব নেবে যেটিতে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর জাহিলিয়্যাহর একটি পরিষ্কার এবং উপলব্ধিযোগ্য বর্ণনা থাকবে। এটি থাকলে আধুনিক জাহিলিয়্যাহ এবং ইসলামের মধ্যকার পার্থক্য আমাদের চোখে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা দিত এবং ইসলামকে আমরা আরো গভীরভাবে বুঝতাম। এই সুন্নাহটি মেনে চললে আমাদের জীবন অনেক সহজ হয়ে যেত। এরকম একটা সম্পাদনায় কিছু জিনিস অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। যেমন, আমাদের বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গী (worldview), রাজনীতির একাল-সেকাল, সমাজের রীতিনীতি (যেমন: বাহ্যিক আচার-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে ইসলাম বনাম জাহিলিয়্যাহ), বিনোদন, পারিবারিক জীবন, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সামাজিক কাঠামো, সমাজে ধর্মের প্রতি মনোভাব, বাজে ভাষার ব্যবহার, সম্পদের ভূমিকা, স্বাস্থ্যসেবা ও লিঙ্গ বিষয়ক বৈষম্য, বর্ণবাদ, সমাজে যৌনতা এবং আরো অনেক কিছু। ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক একুশ শতকের জাহিলিয়্যাহর সকল বিষয় এমনভাবে সংকলন করতে হবে যেন সেটি পড়ে ''কী করা যাবে আর কী করা যাবে না'', এমন একটা তালিকা পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে কোন কাজগুলো করা যাবে তা জানা হয়ে যাবে। ফলে ইসলামকে যুগোপযোগীভাবে দেখা সহজ হবে এবং সাহাবাদের ﷺ মতো করে ইসলাম বোঝা ও মানার ক্ষেত্রে তা সহায়ক হবে।

ইমাম ইবন আল-কায়্যিম ﷺ তাঁর ''মাদারিজ আস-সালিকিন'' গ্রন্থে বলেছেন, ''একজন মানুষের হৃদয় থেকে জাহিলিয়্যাতের শেষ অংশটুকুও বিদায় নেওয়ার আগ পর্যন্ত সে কখনোই ঈমানের মিষ্টতা এবং সত্যতা ও ইয়াক্বীনের স্বাদ নিতে

পারে না।” সাফা-মারওয়ার মাঝে *সা’ঈ* করার ব্যাপারে সন্দিহান থাকার সময় এটাই ছিল সাহাবাদের ﵃ মনের অবস্থা।

আল্লাহ ﷻ সাহাবাগণের ﵃ উপর সন্তুষ্ট হোন এবং আমাদেরকে তাঁদের পথে চলার তাওফিক্ব দিন।

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট-সেল #১০৬

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১০)

সূরা বাকারার ১৭২ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ বলেন,

> “হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহর, যদি তোমরা একান্তভাবে শুধু তাঁরই ইবাদাত কর।”

এই আয়াতে খাবার সংক্রান্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। এর প্রত্যেকটিই আমাদের তাওহীদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রথমটা হলো, আল্লাহ ﷻ আমাদের নির্দিষ্ট একটি খাবার খেতে বলেননি। তিনি বিশেষভাবে যে সকল খাবার *‘তাইয়্যিব’* সেগুলো খেতে বলেছেন। অর্থাৎ শুধু স্বাদসর্বস্ব খাবার নয় যা স্বাস্থ্যের জন্যে ভালো, পুষ্টিকর, স্বাস্থ্যকর এবং উপকারী সেগুলো খেতে বলেছেন। এর কারণ হলো আমাদের দেহটা আসলে ‘আমাদের’ নয়। এটি আমাদের উপর অর্পিত একটি আমানাত। একটি অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পাথেয় হিসাবে আমাদের এই আমানাতটি দেওয়া হয়েছে। আর সেই অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর ইবাদাত। এই কারণে, আল্লাহ কুরআনের কিছু অংশ জুড়ে শুধু খাবার হিসেবে আমাদের জন্য কী উত্তম সে ব্যাপারে নির্দেশনা দিতে কথা বলেছেন। আর আল্লাহর নির্দেশনা মোতাবেক *তাইয়্যিবাত* গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আল্লাহর দেওয়া এই আমানতকে সবচেয়ে ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে পারব। মাটির তলা থেকে বের হয়ে আমাদের পেটে যাওয়ার আগ পর্যন্ত যে খাবারগুলোর চেহারা একই থাকে সেগুলোই হচ্ছে সর্বোত্তম খাবার। কারণ এগুলোতে কোনো আকর্ষণীয় মোড়ক আর বাহারী রঙ থাকে না। শাকসবজি ও ফলমূলে আছে ফাইটোক্যামিক্যালস আর মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস যা আমাদের শরীরকে ক্রমাগত সচল ও কার্যকরী রাখার প্রক্রিয়াকে জিইয়ে রাখে। ওজন বেড়ে গেলে শরীরের এই প্রক্রিয়াগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় আর পরিণামে রক্তে চিনি ও চর্বির পরিমাণ এবং উচ্চ রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে ধমনীর ক্ষতি হয়। দিনে পাঁচ বেলা সবজি খেলেও হৃদরোগ এবং স্ট্রোকের সম্ভাবনা ততটা থাকে না, যতটা দুই বেলা অন্য খাওয়া খেলে থাকে। আর টমেটো, ফুলকপি ও অন্যান্য সবুজ শাক-সবজি বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক ভূমিকা রাখে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি হলো, এই আয়াত আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে যে, আল্লাহই হলেন এইসব খাবারের যোগানদাতা। প্রতিবারই যখন আমরা আঙুল বা চামচে করে একটুখানি খাবার মুখে তুলে নিই, ততবারই তা যেন দেখিয়ে দেয় এই পৃথিবীতে আমরা আল্লাহর কতটা মুখাপেক্ষী। আপনি যতই ধনী বা গরিব হোন, হোন বিখ্যাত বা অখ্যাত কেউ, অথবা সবল কিংবা দুর্বল; দুনিয়ার প্রতিটি মানুষই তার নিজের চাইতেও বড় বা শক্তিশালী কিছুর মুখাপেক্ষী। আমরা কে আর আমরা কে নই, খাবারই আমাদের সেটা জানিয়ে দেয়। কেউ অন্যের উপর যতই ক্ষমতাবান হোক না কেন, এই ক্ষমতা যে মিছে ভ্রম ছাড়া কিছুই নয় তা খাবারের ব্যাপার আসলেই বোঝা যায়। তখন সে আর আট-দশটি সৃষ্টিরই অনুরূপ, স্রষ্টার অনুগ্রহে বেঁচে থাকা এক সৃষ্টি। এই লেখাটি যারা পড়ছেন, তাদের বেশিরভাগেরই হয়তো কোনো বেলা অভুক্ত হয়ে থাকতে হয় না। কিন্তু খেয়াল করুন, খেতে বসে খাবারের স্বাদ-গন্ধ-বৈচিত্র্য, রন্ধন-কৌশলসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমরা মুখ্য আলোচনা থেকেই দূরে সরে যাই। পরিবার-পরিজন আর বন্ধু-বান্ধব নিয়ে খেতে বসে আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতার ব্যাপারে অসচেতন হয়ে পড়ছি। আর তা হলো: মানুষ হিসেবে আল্লাহর উপর আমাদের নির্ভরতা। আল্লাহর দিকে আমাদের চেয়ে থাকা। আমরা ভুলে যাচ্ছি, আমরা আল্লাহর তুলনায় কতই না দুর্বল। আর আমাদের তুলনায় আল্লাহ ﷻ কতই না শক্তিশালী! এই মহাসত্য আমরা উপলব্ধি করতে ভুলে যাই। খাবারের যোগান দেওয়াটা আল্লাহর একটি অনন্য গুণ যা আল্লাহ সূরা আয-যারিয়াত এর ৫৭ নাম্বার আয়াতে বলেছেন, **“....এবং (তাদের কাছে আমি) এটাও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য যোগাবে”**, সৃষ্টি আর স্রষ্টার মাঝে খাবারের যোগান দেওয়ার বিষয়টিকে একটি পার্থক্যকারী বৈশিষ্ট্য হিসেবে আল্লাহ চিহ্নিত করেছেন।

আর সত্যিই, এই জেলখানায় খাবার দিতে নির্ধারিত সময় থেকে মাত্র ৩০ মিনিট দেরি হলেই কয়েদিরা ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে চিৎকার চেঁচামেচি আর দরজায় আঘাত করা শুরু করে দেয়। এটি যেন মানুষের সীমাবদ্ধতা আর পরমুখাপেক্ষীতার বাস্তব প্রদর্শনী। কাজেই, আজকের পর থেকে যখন আপনি কোনো খাবার অথবা নাস্তা উপভোগ করতে বসবেন, অবশ্যই এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও বাস্তবতা অনুধাবন করে তা উপভোগ করবেন।

সবশেষে, উপরে বর্ণিত বাস্তবতার উপলব্ধি আপনাকে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার দিকে ধাবিত করবে। সহীহ মুসলিম-এ রাসূল ﷺ বলেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ সন্তুষ্ট হন তাঁর বান্দার ওপর, যখন সে কিছু খাবার খায় আর আল্লাহর

প্রশংসা করে।” এটা একই সাথে তাওহীদের বহিঃপ্রকাশ এবং এই রূঢ় বাস্তবতার স্বীকৃতি, যে এই ছোট্ট খাবারের টুকরোটা লক্ষ লক্ষ মুসলিম ভাই- যাদের আপনি হয়তো আপনার জীবনে কোনোদিন দেখেনও নি- তাদের চোখে এই টুকরোটি একটা কল্পনা মাত্র। যার কেবল স্বপ্নই দেখা চলে। সোমালিয়া বা হাইতির ভয়াবহ লাগামহীন দুর্ভিক্ষের দিকে তাকিয়ে দেখুন। খাবার কিছুক্ষণের মধ্যে আসবেই এই নিশ্চয়তা থাকার পরও আমার চারপাশের কয়েদিরা একটু দেরিতেই অস্থির হয়ে দরজায় আঘাত করা শুরু করে দেয়। অথচ এক মুহূর্ত ভাবুন তো, আপনার দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোথাও কোনো খাবার নেই। আপনার কোনো নিশ্চয়তা নেই যে, আপনি সারাদিন বা সারা সপ্তাহ কিছু মুখে দিতে পারবেন কি না। কী করবেন আপনি? এহেন পরিস্থিতিতে বসবাসকারী একজন ব্যক্তি যে দুঃস্বপ্নের সাথে প্রতিনিয়ত লড়াই করেন তা পশ্চিমা ধনী দেশের দরিদ্রতম লোকটিও কল্পনা করতে পারবে না। এমন দুঃস্বপ্ন থেকে মুক্তি পেতে উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করা ছাড়া আর কীইবা করার আছে? ভাবুন তো, আপনার নিজের ক্ষুৎ-পিপাসার সাথে যদি স্ত্রী আর সন্তানদের অনাহারক্লিষ্ট মুখ যোগ হয় তাহলে আপনার কেমন লাগবে? খুশির কথা হচ্ছে, এই কল্পনা শুধুই ক্ষণিকের জন্যে আপনার মাথার একটা ছোট্ট অংশ জুড়ে বিদ্যমান থাকবে। কিন্তু এ দুনিয়ায় আপনার চোখের আড়ালের লাখো মানুষের জন্যে এটাই বাস্তবতা। এটাই জীবন, ভাবতে না চাইলেও ভাবতে হবেই। এই জীবন থেকে পালিয়ে বেড়ানোর কোনো সুযোগ নেই। যে ব্যক্তি মন-প্রাণ ভরে খাবার খায়, অথচ এ খাবারের সন্ধানদাতা (আল্লাহ) ও প্রকৃত অর্থে অমূল্য এই খাবারের সঠিক মূল্যায়ন করতে জানে না, সে আসলে এই খাবার খাওয়ারই যোগ্য নয়।

আল-ইমাম আল আওযা’ই ﵀ একবার দামাস্কাস থেকে শাম উপকূলে যাত্রা করছিলেন। পথিমধ্যে তার এক বন্ধুর শহরে তাকে থামতে হলো। বন্ধুটি তাদের দুইজনের জন্যেই রাতের খাবার তৈরি করল। যখন তারা খেতে বসলেন, বন্ধুটি বললেন, “হে আবু ‘আমার! খাও। আর আমাকে ক্ষমা কর। কারণ, তুমি এমন একসময় এলে যখন আমি কিছুটা টানাপোড়েনে আছি।”ইমাম আওযা’ই তাঁর হাত সরিয়ে নিলেন এবং খাবার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকলেন। বন্ধুটি বারবার তাঁকে খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করতে লাগলেন কিন্তু তিনি প্রতিবারই অস্বীকৃতি জানালেন। শেষ পর্যন্ত বন্ধুটি খাবার গুছিয়ে ফেললেন। তারপর দুজনেই শুয়ে পড়লেন। পরদিন সকালে উঠে বন্ধুটি ইমাম আওযা'ইকে প্রশ্ন করলেন, 'কাল রাতে তুমি খেলে না কেন?” আল আওযা’ই জবাবে বললেন, “আমি সেই খাবার ছুঁয়ে দেখতে চাইনি যে খাবারের জন্যে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়নি বা

যে খাবার সামনে নিয়ে আল্লাহর নি'আমত সেই খাবারকেই ছোট করে দেখা হয়েছে।

তাই খাওয়া-দাওয়ার সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে তাওহীদ।

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট #১০৮

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১১)

কুরআনে সূরা বাকারার ২১৭ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলছেন,

> "সম্মানিত মাস সম্পর্কে তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে যে, তাতে যুদ্ধ করা কেমন? বলে দাও এতে যুদ্ধ করা ভীষণ বড় পাপ। আর আল্লাহর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা এবং কুফরী করা, মসজিদে-হারামের পথে বাধা দেওয়া এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে বহিষ্কার করা, আল্লাহর নিকট তার চেয়েও বড় পাপ। আর ধর্মের ব্যাপারে ফিতনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহা পাপ ..."

হিজরি ২য় বর্ষে এই আয়াত নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আব্দুল্লাহ ইবনে জাহশ ﷺ এর নেতৃত্বে ১২ জন সাহাবিকে ﷺ কুরাইশদের একটি খাদ্যবাহী কাফেলাকে অবরোধ করতে নাখলাহ (মক্কা ও তায়েফের মাঝামাঝি) নামক স্থানে পাঠান। মুসলিমদের উপর বাড়াবাড়ি রকমের যুলুম-নির্যাতনকারী কিছু মুশরিক সেই কাফেলাতে ছিল। অত্যাচারের ক্ষেত্রে তারা সবরকমের সীমা অতিক্রম করেছিল। তারা মুসলিমদের অর্থসম্পদ আত্মসাৎ করেছিল, মুসলিমদের ঘরছাড়া করেছিল, সাহাবিদের ﷺ অত্যাচার করেছিল, এমনকি রাসূল ﷺ কে ও তারা একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করেছিল। সেই কাফেলার কাছাকাছি গিয়ে 'আবদুল্লাহ ইবনে জাহশ এই ঘৃণ্য লোকগুলোকে দেখতে পান। সাহাবাদের ﷺ মনে তখন এ কাফেলাটি আক্রমণ করে তাদের নিজেদের অর্থসম্পদের কিয়দংশ ফেরত পাওয়ার চিন্তা উদিত হয়। কিন্তু সে সময়টা ছিল রজব মাস। চারটি সম্মানিত মাসের মধ্যে অন্যতম রজব মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া ছিল হারাম। তবে অনেকক্ষণ ভেবে দেখার পর, মুসলিমদের সেই ছোট্ট দলটি তাই করার সিদ্ধান্ত নেয় যা ইতিহাস এবং পরিস্থিতির বিচারে সমর্থনযোগ্য। তারা সে কাফেলাটি আক্রমণ করেন এবং তাদের হারানো কিছু সম্পদ পুনরুদ্ধার করেন।

এই ঘটনা রাসূল ﷺ কে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে ফেলে দেয়। এই ঘটনাকে পুঁজি করে এবার মুশরিকরা সমাজে হৈ চৈ বাঁধিয়ে মুসলিমদের বিপক্ষে জনসমর্থন আদায়ের সুযোগ পায়। তারা বলে বেড়াতে থাকে মুসলিমরা যুদ্ধের পবিত্র রীতি লঙ্ঘন করেছে। তারা উগ্র, তারা জঙ্গী, তারা রক্তপিপাসু যুদ্ধবাজ; তারা শান্তি ও স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এবং এ ধরনের আরো নানান কথা তারা বলতে শুরু করে। এক পর্যায়ে গিয়ে ইবন জাহশ ও তার বাহিনীর কুরাইশদের কাফেলা আক্রমণের

ঘটনায় কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা উচিত তা নিয়ে মুসলিমরাও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। অবশেষে, আল্লাহ ﷻ এই আয়াতটি নাযিল করেন এবং নিশ্চিত করেন যে, হ্যাঁ, সম্মানিত মাসে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ। কিন্তু মক্কার মুশরিকরা মুসলিমদের সাথে এতদিন ধরে যা কিছু অন্যায় করে আসছে সেগুলো নিষিদ্ধ মাসে যুদ্ধ করার চেয়েও নিকৃষ্ট। এই আয়াতের মাধ্যমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগকে কেন্দ্র করে কুরাইশরা যে মানবতার মেকি আর্তনাদ তোলে তা নিস্ফল হয়ে যায়।

বর্তমানকালেও এই ধরনের পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবেলা করতে হবে সে ব্যাপারে এই আয়াত আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। এই শিক্ষা হলো, ইসলামের শত্রুরা কিছু ঘটনাকে পুঁজি করে ফায়দা লুটবার চেষ্টা করে। এই ঘটনাগুলো আমাদেরকে অনেক সময় রক্ষণাত্মক অবস্থানে ঠেলে দেয়। কিন্তু আমাদের রক্ষণাত্মক হয়ে পড়া মোটেই উচিত নয়। বরং কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা না করে বরং ইসলামের এইসব শত্রুদের তাদের অপরাধের জন্য কাঠগড়ায় তোলা উচিত। ইবনে জাহশের আপাতদৃষ্টিতে অনুচিত কাজটিকে তারা শঠতাপূর্ণ উপায়ে এমনভাবে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সবার সামনে তুলে ধরেছিল যে, তাদের নিজেদের সব অপকর্ম এর নীচে চাপা দিয়ে ফেলেছিল। অথচ তাদের অন্যায় ও অপকর্মই এই ঘটনার মূল প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছিল। তাদের এই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার জবাবে আল্লাহ ﷻ মুসলিমদেরকে তাদের ফাঁদে পা দিয়ে রক্ষণাত্মক হতে বলেননি। মুশরিকদের সামনে কৈফিয়ত পেশ করতেও বলেননি। বরং আল্লাহ মুসলিমদেরকে আদেশ করেছেন এই মুশরিকদের সকল অপকর্ম সবার সামনে তুলে ধরতে। এখানে মুসলিমদের আচরণটা হবে এমন, *"আরে? তুমি কাকে সন্ত্রাসী, উগ্রপন্থী বলছ? তুমি নিজে কী করেছো আমাদের সাথে, সে ইতিহাসের দিকে আগে লক্ষ কর!"*

এই যুগে এসেও মুসলিমদেরকে এই ধরনের পরিস্থিতিতে পড়তে হয়। যখনই আমাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদ, উগ্রপন্থা এবং এই ধরনের আরো অতি পরিচিত কিছু অভিযোগ তাক করা হয়, তখন অধিকাংশ মুসলিম হয়তো ভালো নিয়ত নিয়েই রক্ষণাত্মক অবস্থানে গিয়ে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। *"দেখুন অল্প কিছু মানুষের কাজের জন্য আমাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হতে দেওয়া যায় না"*, *"আমরা শান্তিকামী মুসলমান"*, *"ইসলাম নিরীহ মানুষ হত্যা কোনোক্রমেই সমর্থন করে না"* ইত্যাদি কিছু গৎবাঁধা বুলি আওড়ে তারা যেন ইসলামকে কলঙ্কমুক্ত করার চেষ্টা করে। হতে পারে তারা এসবের সাথে মোটেও জড়িত ছিল না।অনেক ক্ষেত্রে তাদের এই বুলিগুলো সত্যও বটে। তবুও আগ-

বাড়িয়ে এসব কথা বলে নিজেদের ভাবমূর্তি পরিচ্ছন্ন রাখার চেষ্টা করাটা পরাজিত মানসিকতার একটি লক্ষণ। এই লক্ষণটি পশ্চিমা মুসলিমদের একটি সনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমারা এভাবেই আমাদের জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে। তারা চায় আমরা নমনীয় হই। কৈফিয়ত ও আত্মরক্ষাসুলভ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করি যাতে করে তারা নিজেদের হিংস্র ও রক্তাক্ত ইতিহাস আড়াল করতে পারে। এ কারণেই, এই আয়াতটি আমাদের শিক্ষা দেয়, কাফিরদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে নমঃনমঃ হয়ে নিজেদের নির্দোষ প্রমাণ করার এই বেদনাদায়ক মানসিকতা যেন আমরা পরিত্যাগ করি। বরং হাঁটে হাড়ি ভেঙে তাদেরকে যেন তাদের অপকীর্তিগুলো দেখিয়ে দেই। আর তাদের অপকীর্তির উদাহরণ তো ভুরি ভুরি।

এই আয়াতে মুসলিমদেরকে কুরাইশদের অপকর্ম ও অন্যায়ের স্বরূপস্বরূপ উন্মোচন করে দিতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিল তাদের তর্জন-গর্জনকে স্তিমিত করে দেওয়া। ঠিক একইভাবে আমাদের উচিত, আজকে যারা ইসলামের শত্রু, তাদের সীমালঙ্ঘন সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া এবং সেগুলোর একটি তালিকা তৈরি করা। যখনই তারা আমাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস বা উগ্রপন্থার অভিযোগ তুলে আঙুল তাক করার ধৃষ্টতা দেখাবে এবং নিজেদের পরম হিতৈষী শান্তিকামী হিসেবে দাবি করবে, তখন আমরা তাদের কুকীর্তির ইতিহাস উন্মোচন করব।

আমাদের নেটিভ আমেরিকানদের গণহত্যার ইতিহাস সম্বন্ধে জানা উচিত। কলম্বাস আসার আগে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ কোটি। কিন্তু ইউরোপিয়ান হানাদাররা বর্তমান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই আদি অধিবাসীদের কচুকাটা করে তাদের সংখ্যা নামিয়ে নিয়ে আসে ১০ লক্ষেরও নীচে।

আফ্রিকার দাসদের ইতিহাস নিয়ে আমাদের পড়াশোনা করা উচিত। দাস-বণিক ও উপনিবেশ স্থাপনকারীদের হাতে সেখানে ৫০ মিলিয়ন মানুষ তাদের জীবন দিয়েছে। এটি সুদূর ইতিহাসের ঘটনা নয়। এটি ঘটেছিল সেই যুগে, যে যুগকে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার সূচনাকাল হিসাবে ধরা হয়। এই নিষ্ঠুরতার পেছনে কোন দেশ ছিল? পশ্চিমা ইউরোপ এবং আমেরিকা, যাদের কিনা সবচেয়ে "সভ্য" জাতি হিসেবে গণ্য করা হয়।

আমাদের মেক্সিকান-আমেরিকান যুদ্ধের ইতিহাস জানা উচিত, এবং "manifest destiny" এর অর্থ জানা উচিত। (manifest destiny হলো এই নিয়তিতে বিশ্বাস করা যে, আমেরিকান সৈন্যরা বিশ্বের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে)। ১৯ শতকের

শেষদিকে আমেরিকান দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ফিলিপিনোদের বিদ্রোহের কাহিনি সম্পর্কে আমাদের জানতে হবে।

আমাদের জ্ঞানের পরিধিতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে হিরোশিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক বিস্ফোরণের ঘটনা। প্রায় দেড় লক্ষ মানুষ মুহূর্তের মাঝে ছাই হয়ে যায় এই বোমার কবলে পড়ে। এদের সবাই ছিল যে যার মতো কাজ করা বেসামরিক লোক। ইতিহাসে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপর পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের এটিই একমাত্র ঘটনা। অথচ নির্মম বাস্তবতা এই যে, যারা সেইদিন নিজেরা পারমাণবিক বোমা ফাটিয়েছিল, তারাই আজকে হর্তা-কর্তা সেজে বিশ্বব্যাপী লেকচার দিয়ে বেড়ায় যেন যার-তার হাতে এই পারমাণবিক বোমা চলে না যায়! (জন হেরেসির(John Hersey) "হিরোশিমা" নামক বইটি পড়ুন) ল্যাটিন আমেরিকা, বিশেষ করে এল সালভাদর, চিলি, পানামা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, গ্রেনেডা এবং গুয়াতেমালায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করার ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা উচিত। হাওয়ার্ড যিন(Howard Zinn) এর বইগুলো সেক্ষেত্রে ভালো কাজ দিতে পারে।

আমাদের ১৯৯০ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের ইতিহাস এবং তৎপরবর্তী আমেরিকা-নেতৃত্বাধীন জাতিসংঘ কর্তৃক ইরাকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করার ইতিহাস জানতে হবে। এই অবরোধের মাধ্যমে ইরাকে খাদ্য-পানি-ঔষধপত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়। শিশুদেরকে অনাহারে এবং ঔষধসেবা থেকে বিরত রাখা ছিল যুদ্ধের 'আধুনিক' একটি কৌশল। ১৯৯৬ সালে, "60 Minutes" নামের একটি অনুষ্ঠানে, ম্যাডেলিন অলব্রাইট (আমেরিকার প্রথম মহিলা সেক্রেটারি অফ স্টেট), আমেরিকার পক্ষ থেকে নিশ্চিত করেন যে তারা মনে করেন, ইরাকে ৫ লক্ষ শিশুর মৃত্যু তাদের যথার্থ প্রাপ্য ছিল।

১৯৯৩ সালে আমেরিকা কর্তৃক সোমালিয়া আক্রমণের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে। সেখানে তারা প্রায় ২০০০ সোমালিকে হত্যা করেছিল। আমেরিকা কর্তৃক ইসরাঈলকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের খুঁটিনাটি জানতে হবে। ইসরাঈলের প্রতিটি বুলেট, মিসাইল, বুলডোজার এবং যুদ্ধবিমানে আমেরিকানদের কালো হাত প্রকাশ পায়। এগুলো দিয়ে ফিলিস্তিনে প্রতিনিয়ত আমাদের ভাই-বোনদের হত্যা করা হয়। (পড়ুন নরম্যান ফিনকেলস্টাইনের (Norman Finkelstein) বইগুলো)

আমাদের জানতে চাওয়া উচিত, কীভাবে তারা আমাদেরকে সন্ত্রাসী ডাকার আস্পর্ধা দেখায়? অথচ তারাই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে আমাদের দু-দুটো দেশে আগ্রাসন চালিয়ে জবরদখল করেছে এবং প্রতিনিয়ত বোমাবর্ষণ করছে।

মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে *'সাইকোলজিক্যাল প্রজেকশান* (Psychological projection)' বলে একটি ধারণা আছে। এই ধারণামতে, কোনো অপকর্মের দায়ে দোষী ব্যক্তি নিজের বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেতে নিজের উপর থেকে সকলের মনোযোগ সরিয়ে নিতে চায় এবং অন্য কারো কাঁধে নিজের দোষ চাপিয়ে বাঁচতে চায়। আজকের দিনে আমাদের শত্রুদের সম্ভবত এই রোগেই ধরেছে। যা কিছুই হোক, আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে এই আয়াতে শিখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে আমরা তাদের অপপ্রচারের জবাব দেব (এবং কীভাবে দেব না)।

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮
জুন ১৮, সকাল ৯টা ২২ মিনিট।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১২)

সূরা আলে ইমরানের আয়াত ১১৯ এ আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

> "দেখ! তোমরাই তাদের ভালোবাসো, কিন্তু তারা তোমাদের প্রতি মোটেও সদ্ভাব পোষণ করে না। আর তোমরা সমস্ত কিতাবেই বিশ্বাস কর। অথচ তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আর যখন তারা নিরিবিলি হয়, তখন তোমাদের উপর রোষবশতঃ আঙ্গুল কামড়াতে থাকে..."

অন্যদের সাথে কোনো বোঝাপড়া করার ক্ষেত্রে নিজেদের সহজাত অন্তর্জ্ঞান অর্থাৎ Intuition কে কাজে লাগানোর বিষয়ে এই আয়াতটি আমাদেরকে শিক্ষা দেয়। নেকড়েদের এই সমাজে টিকে থাকতে হলে আমাদেরকে দুই ধরনের প্রান্তিক আচরণ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। একদিকে যেমন অন্যদেরকে সাক্ষ্যপ্রমাণের স্বল্পতার কারণে সন্দেহ সত্ত্বেও ছাড় দিতে হবে ঠিক তেমনি এর বিপরীতে আবার সুস্পষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মুখের কথায় মুগ্ধ হয়ে সবকিছুকেই সরলমনে বিশ্বাস করে প্রতারিত হওয়া যাবে না। এ দুটোর মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। কেউ যেন আমাদের সরলতাকে কাজে লাগিয়ে হীন স্বার্থোদ্ধার করার সুযোগ না পায়।

সহানুভূতিশীলতা এবং সতর্কতা-এ দুয়ের মাঝে হতে হবে আমাদের অবস্থান। সবকিছুকে অতি সরল মনে গ্রহণ করা বা মানুষকে খুব সহজে বিশ্বাস করে ফেলা যেমন এক ধরনের চরমপন্থা, তেমনি সারাক্ষণ চরম নৈরাশ্যবাদে নিমজ্জিত থাকা, সবকিছুর মাঝে মন্দের আভাস খুঁজে পাওয়া আরেক ধরনের চরমপন্থা। উল্লেখিত দ্বিতীয় ধরনের চরমপন্থা একজন মানুষকে অন্যের প্রতি সদয় হতে নিরুৎসাহিত করে তোলে। তাই মুসলিমরা এ দুয়ের মাঝে এমন এক মধ্যপন্থা অবলম্বন করে যা বাস্তবধর্মী।

রাসূল ﷺ এর সীরাহর দিকে একটু দৃষ্টিপাত করলেই আমরা দেখতে পাব যে, একজন নেতা হিসেবে রাসূলুল্লাহর ﷺ সফল হওয়ার কারণ হলো তিনি মানুষের মনে কী চলছে তা ধারণা করতে পারতেন। তাঁর মানুষের সাথে বোঝাপড়া করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। এতে ছিল সহানুভূতি এবং বাস্তবধর্মী অন্তর্জ্ঞানের চমৎকার এক সমন্বয়। তিনি জানতেন কার সাথে চুক্তি করতে হবে এবং কার

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। তিনি জানতেন কাদের হাতে অঢেল সম্পদ ঢেলে দিতে হবে আর কাদেরকে কিছু কম দিলেও চলবে। তিনি যে কারো মুখের কথাকেই বিশ্বাস করে নিতেন না। কারণ তিনি মানবচরিত্রের দুর্বলতাগুলো জানতেন। কারো কথায় মোহগ্রস্ত না হয়ে তিনি এই ব্যাপারগুলো খুব বাস্তবসম্মত পন্থায় সামলাতে পারতেন। তিনি ছিলেন একজন বাস্তববাদী। যেমন, আবু 'আযযা আল-জুমাহী নামে এক মুশরিক ছিল যে বদর যুদ্ধে যুদ্ধবন্দী হিসেবে ধরা পড়ে। সে ছিল হতদরিদ্র আর তাকে তার বড় সংসারের দেখাশোনা করতে হতো, তাই রাসূল ﷺ সেবারের মতো এই শর্তে তাকে মুক্তি দিলেন যে, সে ভবিষ্যতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার শত্রুতায় জড়াবে না। কিন্তু, ঠিক এক বছর পরেই সে উহুদ যুদ্ধে মুশরিকদের পক্ষে যুদ্ধ করতে এসে মুসলিমদের হাতে আবার বন্দী হয়। উহুদ যুদ্ধে ৭০ জন সাহাবি ﷺ শহীদ হন। আবু 'আযযা আবার কাকুতি-মিনতি করে আবদার করল যেন তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে বদরের মতো এবারও অঙ্গীকার করল যে, ভবিষ্যতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে আর কখনও সে যুদ্ধে অংশ নেবে না। কিন্তু এবার, রাসূল ﷺ ছিলেন কঠোর। তিনি বললেন, **"মু'মিনরা এক গর্তে দু'বার দংশিত হয় না"**। এ কথা বলার পর আয-যুবাইর ﷺ আবু 'আযযাকে হত্যা করেন। কারণ, যতই অনুনয়-বিনয় সে এবার করুক না কেন, নিশ্চিতভাবেই তার অঙ্গীকার সে আবারো ভঙ্গ করত এবং সে আবার মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করত। কিন্তু খেয়াল করুন যে, রাসূল ﷺ তাকে বদরের পর একটি সুযোগ দিয়েছিলেন এবং তার মধ্যে সদিচ্ছার উপস্থিতি বোধ করে তাকে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কাজেই, এই আয়াতটি আমাদের নিজেদের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি গড়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়। অনেকেরই মুখের কথা আর অন্তরের কথা এক নয়। তাদের সাথে বোঝাপড়ায় এই জ্ঞান কাজে দেয়। এ আয়াত থেকে আমরা শিক্ষা পাই যে, এমন কারো মুখের কথা প্রশ্নাতীতভাবে গ্রহণ করা উচিত নয় যা পরবর্তীতে আফসোসের কারণ হতে পারে। এই প্রসঙ্গে অধুনা বিশ্বের যে ঘটনাটি খুব করে আমাকে নাড়া দেয় তা হলো ওবামার সস্তা স্লোগান "change we can believe in"। এই ডাকে সাড়া দিয়ে আমেরিকান মুসলিমদের তার সমর্থনে মেতে ওঠা বরাবরের মতোই আমেরিকান মুসলিমদের সবকিছু অতি সহজে হজম করার অভ্যাসের পরিচায়ক। এটা ছাড়াও কায়রোতে দেওয়া তার ভাষণ, তাতে কুরআনের আয়াত উদ্ধৃত করা এবং আরো অনেক কিছুই আমেরিকান মুসলিমদের মন অতিসহজে জয় করে ফেলেছে। এই ধরণের কূটচাল সম্পর্কে অবশ্য আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে অনেক আগেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন, **"...তারা যখন তোমাদের সাথে এসে মিশে, তারা বলে, আমরা ঈমান এনেছি..."**

পরবর্তীতে এল মুসলিমদের হা করে শুধু দেখবার পালা। যে ওবামা মুসলিম বিশ্বের সাথে যুদ্ধে না জড়াবার অঙ্গীকার করেছিল, সেই ওবামাই মুসলিমদের সাথে যেন বুশ থেকেও আরো মারাত্মক ও তীব্রতর যুদ্ধে নামল। উদাহরণস্বরূপ, রাষ্ট্রপতির আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরের ১৭ মাসে তার ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে মুসলিম ভূমিতে প্রায় ১০০টি ড্রোন হামলা করা হয়েছে। এমনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতে এসব ড্রোন হামলায় হাজারেরও বেশি নিরীহ মুসলিম নিহত হয়েছে। বুশ তার সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদ জুড়ে যত ড্রোন হামলার অনুমোদন দিয়েছে, ওবামা ১৭ মাসেই মুসলিম বিশ্বে তার দ্বিগুণ ড্রোন হামলা চালিয়েছে! অনেকের কাছে এটি অবাক করা বিষয় হতে পারে। তবে যারা এই আয়াতের মর্মার্থ বোঝে এবং মুসলিম ও কুফফারদের ইতিহাস সম্পর্কে জানে তারা এটা আগেই অনুমান করতে পেরেছিল।

সুবহানআল্লাহ! কি চমৎকার ভাবেই না ১৪০০ বছর আগে নাযিলকৃত একটি আয়াত আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে চিত্রিত করেছে!

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৩)

সূরা আলে ‘ইমরান, আয়াত ১২০ এ আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

> “তোমাদের কোনো কল্যাণ হলে সেটা তাদের দুঃখ দেয়, আর তোমাদের কোনো অকল্যাণ হলে তারা আনন্দিত হয়, আর তাতে যদি তোমরা ধৈর্যধারণ করো ও তাক্বওয়া অবলম্বন কর, তাহলে তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না ...”

এ আয়াতটি পড়ে আমি ইবন আল-যাওজির رحمه الله “সায়েদ আল-খাতির” বই (পৃষ্ঠা ১১৮) থেকে কিছু কথা যোগ না করে পারছি না। তিনি বলেন,

> *“জেনে রেখো, সবগুলো দিন সমান নয় ... কখনও তুমি নিঃস্ব, কখনও বা তুমি ধনী, কখনও তুমি অপমানিত, আর কখনও বা তুমি মানী। কখনো তুমি দেখছ তোমার বন্ধুদের সুখে উল্লাসরত, কখনও বা তুমি দেখবে তোমার শত্রুরা আনন্দে উদ্বেলিত।*
>
> *কিন্তু সত্যিকারের সুখী ব্যক্তি হলো সে, যে তার জীবনভর সকল পরিস্থিতিতে একটি আদর্শকে আকঁড়ে ধরে আছে। আর তা হলো আল্লাহভীতি বা তাক্বওয়া অবলম্বন করা।*
>
> *সে যদি ধনী হয়, তাক্বওয়া তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করবে। সে যদি গরিব হয়, তাহলে তাক্বওয়া তার জন্য সবর করার দ্বার খুলে দেবে।*
>
> *যদি সে স্বস্তি আর আয়েশের মাঝে জীবনযাপন করে, তবে এই তাক্বওয়া তার উপর বর্ষিত নি’আমত পূর্ণ করবে। আর যদি সে কষ্ট আর দুর্ভোগের মধ্যে দিনাতিপাত করে, তবে এই তাক্বওয়া তাকে অলংকৃত করবে। তাক্বওয়া তার সঙ্গী হলে তার দিনগুলো ভালো চলুক বা মন্দ-তাতে তার কিছুই আসে যায় না। তার পরনের জামাটা ছেঁড়া হোক বা নতুন; সে*

অভুক্ত থাকুক বা তুষ্ট থাকুক তাতে খুব বেশি কিছু আসে যায় না। কেননা, এসব কিছুই যেকোনো সময়ে হারিয়ে যেতে পারে বা বদলে যেতে পারে।

কাজেই, তাকওয়া হলো নিরাপত্তার অতন্দ্র প্রহরী। সে নিদ্রা যায় না। বিপদের সময় তাকওয়া তোমার হাত ধরে রাখবে। সদাসর্বদা জেগে তোমাকে নিরাপদ রাখবে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তাকওয়া অবলম্বন করবে। তাহলে শত টানাপোড়েনের মাঝেও তুমি স্বচ্ছন্দ থাকবে। কষ্টের মাঝেও তুমি স্বস্তি খুঁজে পাবে।''

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট – সেল #১০৮

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৪)

আল্লাহ তা'আলা সূরা আলে-'ইমরানের ১২১ নম্বর আয়াতে বলেছেন,

> "আর স্মরণ করুন আপনি যখন ভোরবেলায় আপনার আপনজনদের কাছ থেকে বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের ঘাঁটিসমূহে মোতায়েন করলেন..."

উহুদের যুদ্ধ নিয়ে অবতীর্ণ হওয়া প্রায় ৬০টি আয়াতের মধ্যে এ আয়াতটি-ই প্রথম। রাসূলুল্লাহ ﷺ উহুদ পর্বতে মুজাহিদীনদের সংগঠিত করার জন্য ভোরবেলাকে বেছে নিয়েছিলেন। এ আয়াতে সেই কথাই বলা হচ্ছে। এখানে লক্ষণীয় বিষয়টি হলো সময়ের উল্লেখ। আল্লাহ তা'আলা সুনির্দিষ্ট ভাবে "ভোরবেলা" কথাটি বলে দিয়েছেন।

ভোরবেলা বা দিনের প্রথম ভাগ হলো গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সেরে ফেলার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট সময়। সাখর বিন ওয়াদা'আ আল-গামিদী বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন: **"হে আল্লাহ! আমার উম্মাহর ভোরের-পাখিদের তুমি বরকত দাও!"** আল্লাহর রাসূল ﷺ কোনো সেনাবাহিনী পাঠালে বা অভিযান পরিচালনা করলে তা সর্বদা করতেন একেবারে দিনের প্রারম্ভে। সাখর বিন ওয়াদা'আ নিজেও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি সবসময় সকালবেলায় তার কাফেলা পাঠাতেন। যার ফলে তার ছিল অঢেল বিত্তবৈভব।

সত্যিকার অর্থেই কুরআনের মধ্যে একটু ঘেঁটে দেখলে দেখা যাবে যে, বহু তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা দিনের প্রারম্ভে সংঘটিত হয়েছে। এই ভোরবেলাতেই আল্লাহ তা'আলা লুতের সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন। সূরা হুদের ৮১ নম্বর আয়াতে এই ঘটনার কথাই বর্ণিত হয়েছে: **"নিঃসন্দেহ তাদের নির্ধারিত সময় হচ্ছে ভোরবেলা। ভোরবেলা কি আসন্ন নয়?"** আর সূরা আল-হিজরের ৬৬ তম আয়াত: **"আমি লূতকে এই বিষয়ে জানিয়ে দিলাম যে, সকাল হলেই তাদেরকে সমূলে বিনাশ করে দেয়া হবে।"** এবং সূরা আল-ক্বমারের আয়াত ৩৮: **"আর নিশ্চিতভাবে প্রত্যুষে তাদেরকে নির্ধারিত শাস্তি আঘাত হেনেছিল।"** এভাবে বার বার "ভোর" কথাটি কুরআনে এসেছে। সূরা আশ-শু'আরার ৬০-৬৬ আয়াতেও

আমরা দেখি যে, ফির‘আউন ও তার সৈন্যদলের ধাওয়া করার পর এই সূর্যোদয়ের সময়েই মূসা ﷺ সমুদ্র বিদীর্ণ করেছিলেন।

এই ভোরবেলার ফজরের ফরয সালাতের পূর্বে আদায় করা দু’ রাক‘আত সুন্নাহ সালাতের কথা বলতে যেয়েই আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন: **“এটা আমার কাছে দুনিয়া ও তাতে যা কিছু আছে তার চাইতেও বেশি প্রিয়”**। সত্যিই! তাঁর কাছে তা এতোটাই প্রিয় ছিল যে, তিনি ﷺ কোনোদিনও এ দু’ রাক‘আত সালাহ বাদ দেননি। আর এই ফজর সালাত-ই যখন জামাতের সাথে আদায় করা হয়, তার বর্ণনা নিয়ে নবীজি ﷺ বলেন: **“এ সালাত বান্দাকে আল্লাহর নিরাপত্তার ছায়াতলে নিয়ে আসে”**।

আপনি নিজের দিকেই লক্ষ করুন। দেখবেন, যে দিনগুলোতে আপনি ফজরের পর থেকেই কাজকর্ম শুরু করে দেন, সে দিনগুলি অন্যান্য দিনের চাইতে অনেক বেশি কার্যকর। আর যে দিনগুলিতে ফজরের পর আবার কয়েক ঘণ্টা ঘুমান, সে দিনগুলো কখনোই এত কর্মমুখর হয় না। সকালে উঠে একটু হাঁটতে বের হওয়া বা তাড়াতাড়ি অফিসে পৌঁছানোর জন্য সকাল সকাল উঠে পড়ার কোনো বিকল্প নেই। অথবা ক্লাসের পড়াটা তৈরি করে ফেলা এবং কুরআন মুখস্থ করার জন্য কিংবা সফরে বের হওয়ার জন্য ভোরবেলার কোনো জুড়ি নেই। এমনকি দিনের প্রথম খাবার দেরি করে খাওয়ার বিপরীতে সকাল সকাল নাস্তা করার মতো ছোট্ট বিষয়টাও আপনার পুরো দিনটিকে সতেজ করে তোলে। ভোর থেকে শুরু হওয়া আপনার কর্মব্যস্ত দিনগুলোর সাথে সেই দিনগুলোর তুলনা করে দেখুন যখন পুরো সকালটা আপনি কিছু না করেই কাটিয়ে দেন। সেই অলস দিনগুলোতে হয়তো ঘুম থেকে উঠে কেবলমাত্র সকালের নাস্তা সারতে সারতেই বেলা বারোটা বেজে যায়। এই দুই ধরনের দিনে আপনার অর্জন কি কখনো সমান হয়? তফাৎটা তো দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার! আর এ কারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবাদের ﷺ সুন্নাহ ছিল সকাল সকাল কাজ শুরু করে দেওয়া। এমনকি কঠোর শারীরিক শ্রমজড়িত আমল, জিহাদের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

সুতরাং ফজর সালাতের পর অলসতা ঝেড়ে ফেলুন। জড়তা কাটিয়ে জেগে ওঠার চেষ্টা করুন। আর এসময়টিকে কাজে লাগান। আপনার দৈনন্দিন কাজগুলো আগে আগে সেরে নিন। সেই দলের সাথে যোগ দিন যাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আখ্যায়িত করেছেন “ভোরের-পাখি” হিসেবে। তাদের জন্য তিনি আল্লাহর কাছে

বরকতের দু'আ চেয়েছেন! আর জেনে রাখুন সকালে করা সবচেয়ে উত্তম, সতেজ ও উপকারী কাজটি হলো আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন হওয়া। নবীজি ﷺ তাঁর নিজের সম্পর্কে বলেছিলেন: **"ইসমাঈল ﷺ এর উত্তরসূরীদের মধ্য হতে চারজন দাস মুক্ত করার চাইতে ভোর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত আল্লাহর স্মরণে রত কোনো দলের সাথে বসে থাকা আমার নিকট অধিক প্রিয়"**।

শেষ একটি ছোট্ট কথা বাকি রয়ে গেছে। আমাদের মাঝে অনেকেই আছেন যারা দিনের প্রথম ভাগের নি'আমত সম্পর্কে ভালো ভাবেই অবগত। তারা সকাল থেকে শুরু করে সমগ্র দিন কাজে লাগাতে চান, কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিদিন সকালে শরীরে যে আলস্য আর জড়তা জেঁকে বসে, তা কোনোভাবেই কাটিয়ে উঠতে পারেন না। আমার মতো আরো অনেকেই মোটেও "ভোরের-পাখি" নন। তাহলে কীভাবে আমরা নিজেকে বদলাবো? কীভাবে আমাদের প্রতিটি দিনকে সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারব?

প্রথমত, আমাদের নিজেদেরকে শৃঙ্খলার মাঝে নিয়ে আসতে হবে। ইশার সালাতের পর কাজকর্ম সীমিত করে ফেলতে হবে। ইশার পর বেশি দেরি না করে শুয়ে পড়তে হবে। সহীহ হাদীস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে - ইশার সালাতের পরে অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা এবং ইশার পূর্বে ঘুমানো - এ দু'টি কাজের ব্যাপারে রাসূল ﷺ অত্যন্ত জোরালোভাবে আমাদেরকে নিরুৎসাহিত করেছেন। কেননা এই দু'টো অভ্যাস ত্যাগ করলে আমরা দ্রুত ঘুমাতে পারবো। আর গাঢ় একটি ঘুমের পরে ঝরঝরে দেহ ও মন নিয়ে পরদিন সকালে জেগে উঠবো। দ্বিতীয়ত, ভোরের কিছু আগে উঠে ইবাদাতে নিয়োজিত হওয়ার বিষয়টি আমাদের মন ও মেজাজের উপর সরাসরি ছাপ ফেলে। বুখারী ও মুসলিম উভয়েই বর্ণনা করেছেন যে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> **"ঘুমানোর সময় তোমাদের প্রত্যেকের মাথার শেষাংশে শয়তান তিনটি গিঁট দেয়। প্রত্যেক গিঁটের স্থানে সে মোহর এঁটে দিয়ে বলে: তোমার রাত এখনো অনেক বাকি, অতএব ঘুমাও। যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর যিকর করে তখন একটি গিঁট খুলে যায়। যদি সে ওযু করে তো আরেকটি গিঁট খুলে যায়। যদি সে সালাত আদায় করে, তো তার সবকটি গিঁটই খুলে যায়, ফলে সে ভোরবেলায় প্রাণবন্ত ও প্রফুল্ল থাকে। অন্যথায় সে অবসাদ ও আলস্য অনুভব করে।" (বুখারী: ১১৪২, মুসলিম: ৭৭৬)**

এসব কিছু চিন্তা করার পর যখন উপরের আয়াতটির দিকে আবার তাকাই তখন বুঝি আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ কেন বিশেষভাবে সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এই একটি আয়াত-ই আমাদের দিনগুলোকে আরো বেশি কর্মতৎপর করে তুলতে পারে, ইনশা আল্লাহ..।

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট- সেল#১০৮।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৫)

সূরা আলে ইমরানের ১৩৫ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

> “...আর যারা কোনো পাপ কাজ করার পর বা নিজেদের উপর যুলুম করার পর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, আল্লাহ ব্যতীত আর কে আছে তাদের ক্ষমাকারী?”

সাধারণভাবে, তাওবাহ (ক্ষমাপ্রার্থনা) ও ইস্তিগফারের (অনুশোচনা) সাথে বিষণ্ণতা ও অনুতাপের অনুভূতিগুলো জড়িত। প্রকৃতপক্ষে, আল্লাহর কাছে বান্দার তাওবাহ গৃহীত হওয়ার প্রথম শর্তই হলো উক্ত পাপের জন্য অনুতপ্ত হওয়া ও অনুশোচনা করা। আপনি ইবন আল-জাওযীর বইগুলো পড়লে কিছু কথা ঘুরেফিরে বারবার দেখতে পাবেন। তা হলো ‘অনুতাপের অশ্রু’ এবং ‘অনুশোচনার অশ্রু দ্বারা নিজের পাপমোচন’। এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, নিজেকে বা অন্য কাউকে আল্লাহর অবাধ্যতায় পতিত হতে দেখলে আমাদের তাতে দুঃখ পাওয়া উচিত।

কিন্তু আমি একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের দিকে নির্দেশ করতে চাই। তা হলো, আপনি কোনো পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার পর যখন অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে উদ্যত হন সেই মুহূর্তে আপনার দুঃখবোধ আনন্দের অনুভূতি দ্বারা পরিবর্তিত হওয়া উচিত। হ্যাঁ, মু’মিনের হৃদয় আল্লাহর অবাধ্যতার কারণে অবশ্যই দুঃখে ভারাক্রান্ত হবে। কেননা পাপে লিপ্ত হওয়া হচ্ছে একটি খাঁচায় বন্দী হওয়ার মতো। আর সেই পাপকর্মের জন্য অনুতপ্ত বোধ করা এবং আল্লাহর কাছে সেজন্য ক্ষমা চাওয়া হলো সেই খাঁচার দরজা খুলে মুক্ত হওয়ার চাবি। ভেবে দেখুন আপনি যখন কোনো খাঁচা থেকে মুক্তি লাভ করবেন তখন আপনার স্বাভাবিক অনুভূতিটি হবে আনন্দ এবং সুখমিশ্রিত। কোনো কারাগার থেকে মুক্ত হওয়ার সময় কেউ দুঃখ বোধ করে না। কাজেই, তাওবাহ এবং ইস্তিগফারের পর আপনার স্বাভাবিক অনুভূতি হওয়া উচিত মুক্তির আনন্দমিশ্রিত। পাপকর্মের দুঃখে অনুতপ্ত হবেন কিন্তু পাপ কাজের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা ও অনুশোচনা যেন আপনার মাঝে মুক্তির বোধ তৈরি করে।

প্রকৃতপক্ষে, পাপকাজের জন্য আপনার অনুশোচনা অন্য কারো জন্য নয় বরং স্বয়ং আল্লাহর জন্য আনন্দের এক উপলক্ষ। আনাস ﷺ হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> **"মনে কর, তুমি মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাচ্ছ, এমতাবস্থায় তোমার খাদ্য-পানীয়সহ তোমার উটটি হারিয়ে গেল, তুমি সেটিকে ফিরে পাবার সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে একটি গাছের ছায়ায় বসে আছ। হঠাৎ তোমার উটটিকে তুমি তোমার সামনে দেখলে পেলে! এই অবস্থায় তুমি যতটা না খুশি হবে, তুমি কোনো পাপ করে আল্লাহর নিকট অনুতপ্ত হলে তিনি তার থেকেও বেশী খুশি হন।"**

সুতরাং, মহান ক্ষমাশীল আল্লাহ ﷻ যেখানে আপনার অনুশোচনায় খুশি হন, সেখানে যাকে ক্ষমা করা হচ্ছে সেই আপনার তো তাওবাহ করার পর আনন্দিতই হওয়া উচিত।

তাই তাওবাহ এবং ইস্তিগফার আমাদের জীবনে আকাঙ্খিত বিষয় হওয়া উচিত। তাই সুযোগ পাওয়া মাত্রই তাওবাহ ও ইস্তিগফার করুন মুক্তির আনন্দে।

তারিক মেহান্না
পলিমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট- সেল#১০৮।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৬)

সূরা আলে ইমরানের ১৩৯ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> "আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।"

উক্ত আয়াতটিই আমাদের সময়ের স্লোগান হওয়া উচিত।

কিছু পশ্চিমা দা'ঈ তাদের লেকচারে হুদায়বিয়ার সন্ধি, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মাক্কী জীবন প্রভৃতি বিষয় নিয়ে এমনভাবে কথা বলেন যাতে মনে হয় মুসলিম উম্মাহর চলমান অধঃপতিত ও দুর্বল অবস্থাকেই যেন তারা নিজেদের নিয়তি হিসাবে মেনে নিয়েছেন। এমন একটা ভাব যেন এই অবস্থা থেকে উত্তরণে আমাদের কিছুই করার নেই। এই চিন্তাধারাটি আমাকে ক্ষুব্ধ করে। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, ICNA এর এক কনভেনশনে একজন দা'ঈ ইসলামের কিছু স্পর্শকাতর বিষয় উল্লেখ করে মন্তব্য করলেন, "এককালে আমরা এইসব বিষয় নিয়ে কথা বলতে পারতাম!" সাথে সাথে তিনি ও উপস্থিত অন্যান্যরা উচ্চস্বরে হেসে উঠলেন। আমি দর্শকসারিতে বসে আনমনে মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে ভাবছিলাম, "আশ্চর্য! আপনি আপনার লেকচারে ইসলামের কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারছেন না এতে হাসির কী আছে! এর থেকে দুঃখজনক ব্যাপার আর কী হতে পারে যে, ইসলামের একজন দা'ঈ হয়েও আপনি আজকে একজন অনুগত ভৃত্যে পরিণত হয়েছেন?" তখন এই আয়াতটি আমার কানে বাজছিল।

কিন্তু এই আয়াতটিই কেন? কারণ উহুদের যুদ্ধের এক ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত মুহূর্তে এই আয়াতটি নাযিল হয়। সাহাবিদের ﵃ অনেকেই তখন মনোবল হারিয়ে ভেঙে পড়েছিলেন। তাদের মনে লুকিয়ে থাকা ভয় এবং দুর্বলতা- এই দুটি সহজাত অনুভূতির দিকে নির্দেশ করে এই আয়াতটি বলছে, ভীত হয়ো না, ভেঙে পোড়ো না। এই আয়াত শিক্ষা দিচ্ছে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকাটাই প্রকৃত বিজয়। যুদ্ধক্ষেত্রের পরাজয় তো বাহ্যিক পরাজয়, এটি সাময়িক ব্যাপার। কাজেই মু'মিনদের হতাশ বা দুঃখিত হওয়ার কোনো কারণ নেই বা নিজেদের দুর্বল ভাবার কোনো অবকাশ নেই।

আজকের দিনেও এই আয়াতটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। আয়াতটি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমাদের বর্তমান বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং শক্তিহীনতা সত্ত্বেও আমাদের নিজেদেরকে দুর্বল ভাবার কোনো কারণ নেই। কেননা সত্যিকারের যুদ্ধ হলো মনস্তাত্ত্বিক। মন এবং মগজই হচ্ছে যুদ্ধের আসল ক্ষেত্র। যতদিন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে বিশুদ্ধ ও ত্রুটিমুক্ত ঈমানধারী মুসলিম আছে ততদিন আমরা দুর্বল নই। বাহ্যিকভাবে আমাদের পরিস্থিতি যতই নড়বড়ে হোক না কেন।

যদি কোনো ব্যক্তি, সমাজ, জাতি অথবা উম্মাহ বৈষয়িক দিক থেকে নিরাপদ ও সমৃদ্ধশালী হয় অথচ তার নিজস্ব চেতনা বা ঈমান-আক্বীদার সাথে আপস করে ফেলে, তবে সে বাহ্যিক সফলতা নিরর্থক। আবার, বাহ্যিক সাফল্যের পরোয়া না করে যদি ঈমানের ব্যাপারে আপসহীন থাকা যায়, তখনও বাহ্যিক সাফল্য গৌণ হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণে বলা হয়ে থাকে, যখনই কোনো সাম্রাজ্য তার নিজস্ব চেতনা ও মূল্যবোধের সাথে প্রতারণা করে তখনই তার পতন ঘটে। আর তাই উহুদে সামরিকভাবে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিমদেরকে আল্লাহ ﷿ জয়ী বলেছেন, কেননা তারা নিজেদের চেতনা ও বিশ্বাসের উপর ছিলেন বলীয়ান। তাই, আজকে মুসলমানদের সবচেয়ে কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ যে যুদ্ধে লড়তে হচ্ছে তা হলো মতাদর্শের যুদ্ধ, মনস্তাত্ত্বিক জগতের হৃদয় ও মননের যুদ্ধ (battle for hearts and minds)।

আজকে মুসলিম উম্মাহকে পরাজিত করার লক্ষে কুফফাররা আমাদের মানসিকভাবে পঙ্গু করে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করছে। তারা দিনে রাতে কাজ করে চলেছে ইসলামের জীবনীশক্তি, আমাদের শক্তির আসল উৎস, "ঈমান" কে আমাদের হৃদয় থেকে মুছে ফেলতে। কারণ এই ঈমান পশ্চিমাদের দাসত্বের কলুষতা থেকে মুক্ত। তারা চায় আমরা যেন নিজেদের দুর্বলতাকে নিয়তি ভেবে তাদের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নিই। এভাবে তারা আমাদের কেবল বাহ্যিকভাবে নয়, বরং অন্তরকেও সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের শেকলে আবদ্ধ করতে চায়। আমাদের উচিত আমাদের এই দুর্বল জায়গাগুলো সারিয়ে তোলা। আমাদের মনে রাখতে হবে, গোলামির কলুষতা থেকে মুক্ত ঈমান বুকে ধারণ করার কারণেই আল্লাহ ﷿ সাহাবিদের ﵃ সম্মানিত করেছেন, যদিও দুনিয়াবী শক্তির বিবেচনায় তারা ছিলেন দুর্বল। আজকেও আমরা একইভাবে সম্মানিত হব, যদি আমরা পশ্চিমাদের দাসত্বের মনস্তাত্ত্বিক বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারি।

এই আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ ﷿ আমাদের মনে এই বিষয়টি দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিতে চান যে, বস্তুগতভাবে আমরা যতই দুর্বল হই না কেন, আমাদের হৃদয়ে

জেঁকে বসা ঔপনিবেশিক দাসসুলভ মানসিকতার (mental colonialism) কারণসমূহ চিহ্নিত করতে পারলে এবং আমাদের হৃদয় ও মনকে এই হীনম্মন্যতা থেকে বিশুদ্ধ রাখতে পারলে আমরাও সম্মানিত হব। এই আদর্শিক যুদ্ধজয় তখন অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে। জেলখানাতে আমার কয়েক সেল পাশে 'জো' নামে এক মাদকব্যবসায়ী ছিল। কর্তৃপক্ষ তাকে গ্রেফতারের আগে সে কেমন করে তার মাদক ব্যবসা চালাতো, সেটা নিয়ে জো আমাকে অনেক গল্প বলেছিল।

গল্পের শেষে জো দুঃখের সাথে বলেছিল, "এখন সরকার আমাদের সাথে ইচ্ছামতো যা খুশি করতে পারে।"

আমি তাকে বলেছিলাম, "জো, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি, "তুমি কি তোমার স্ত্রীকে ভালোবাসো?"

সে উত্তর দিল, "অবশ্যই, আমি তাকে ভালোবাসি।"

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "মনে কর কর্তৃপক্ষ তোমার উপর অনেক শারীরিক নির্যাতন চালালো। তারা কি তোমার মুখ থেকে এ কথা বের করতে পারবে যে, 'আমি আমার স্ত্রীকে ঘৃণা করি'?"

সে বলল, 'পারতেও পারে।"

আমি আবারও জিজ্ঞেস করলাম, "কিন্তু কর্তৃপক্ষ যদি তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুলোকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে তারপরও কি তারা পারবে তোমার হৃদয়ের গভীর থেকে স্ত্রীর প্রতি তোমার ভালোবাসাকে মুছে ফেলতে?"

জো উত্তর দিল, "কখনোই না।"

তখন আমি এই বলে কথোপকথন শেষ করলাম যে, "এজন্যই আসলে তারা যা খুশি তা করতে পারে না। কারণ তোমার হৃদয় তাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে।"

আল্লাহ ﷻ বলেন,

> "আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মু'মিন হও, তবে তোমরাই জয়ী হবে।"

সুতরাং, বাহ্যিক দুর্বলতা সত্ত্বেও সর্বদা অগ্রগামিতা ধরে রাখা সম্ভব। কাজেই দা'ঈদের আমাদের বর্তমান পরিস্থিতির সাথে বারবার 'মাক্কী জীবন' আর 'হুদাইবিয়াহ'র তুলনা দিয়ে দুর্বলতা আর হতাশাকে স্বাভাবিক হিসাবে মেনে নেওয়ার বোধ তৈরি করে দেওয়া মোটেই উচিত নয়। বরং তাদের উচিত ভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের বর্তমান পরিস্থিতিকে উপস্থাপন করা। কুরআনের এই আয়াতে আল্লাহ মুসলিমদেরকে সেই শিক্ষাই দিচ্ছেন যে, বাহ্যিক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও মুসলিমরাই হবে শ্রেষ্ঠ, যদি তারা হীনমনা না হয়ে ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার ইতিবাচক মনোভাব ধরে রাখে। তাই, উক্ত আয়াতটি আমাদের আজকের দিনের স্লোগান হওয়া উচিত। আমাদের মানসিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে আল্লাহর ﷻ এই একটি আয়াতই যথেষ্ট।

এ বিষয়ে আরও পড়তে চাইলে:

• সায়্যিদ কুতুবের লেখা *Milestones* বইয়ের 'The Faith Triumphant' অধ্যায়।

• RAND কর্পোরেশন কর্তৃক প্রকাশিত '*সিভিল ডেমোক্রেটিক ইসলাম*' [Amazon.com: Civil Democratic Islam: Partners, Resources, and Strategies…]

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট- সেল#১০৮।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৭)

সূরা আলে ইমরানে, ১৪৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলছেন,

> "আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ কিছু নন! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন। অতএব তিনি যদি মারা যান অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? ..."

কুরআনে হাতেগোণা অল্প কিছু আয়াত আছে, যে আয়াতের শব্দগুলো কোনো সাহাবার رضي الله عنه মুখে প্রথমে উচ্চারিত হয়েছিল এবং পরে আল্লাহ কুরআনে ওহী হিসেবে সেগুলোকে নাযিল করেন। এই আয়াতটি তেমনই একটি আয়াত।

উহুদের ময়দান। মুশরিকরা চারিদিক থেকে মুস'আব বিন 'উমাইরকে ঘিরে ফেলেছে। তিনি সামনে তাকিয়ে দেখলেন রাসূলুল্ললাহ ﷺ নিজেও বিপদের সম্মুখীন। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহকেও ﷺ ঘিরে ফেলেছে। তখন মুস'আব رضي الله عنه নিজেই নিজেকে বলে উঠেন,

> *"আর মুহাম্মদ একজন রসূল বৈ কিছু নন! তাঁর পূর্বেও বহু রসূল অতিবাহিত হয়ে গেছেন"*

এর পরপরই মুস'আবকে মুশরিকরা হত্যা করে। কিন্তু গুজব ছড়িয়ে পড়ে মুস'আব নয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মুশরিকরা হত্যা করেছে। এই বানোয়াট তথ্যটি যখন সাহাবাদের رضي الله عنهم কাছে পৌঁছল তখন তারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েন। তাদের মধ্যে একটি দল এতটাই বিষাদগ্রস্ত এবং মনোবলহীন হয়ে পড়ল য, তারা পুরোপুরি হাল ছেড়ে দেন। কেউ কেউ পালিয়ে মুনাফিক্বদের সাথে যোগ দিল। আর কেউ ছিল তাদের অবস্থানে অনড়। তারা বলল, "যদি আল্লাহর নবী মারা গিয়ে থাকেন, তবে যে উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধ করে গেছেন, সে উদ্দেশ্য সাধনে আমরাও লড়াই করে যাব"। মৃত্যু সংবাদের গুজব শোনার আগে এবং পরে তারা একইরকম অবিচল ছিলেন। মুশরিকদের দ্বারা অবরুদ্ধ অবস্থায় মুস'আবের মুখ নিঃসৃত এ কথাগুলোকেই সম্পূর্ণ করে আল্লাহ কুরআনের আয়াত হিসাবে নাযিল করেন। এর মাধ্যমে তিনি মুস'আবের এ কথাটির প্রতি সমর্থন জানান। ইসলামের সঠিক দা'ওয়াহর অনুসারীদের জন্য এই আয়াতটি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

কোনো কিছু বিশ্বাস করা বা অনুসরণ করার পেছনে একজন মানুষ বিভিন্ন কারণে উদ্বুদ্ধ হতে পারে। যেমন:

- কিছু মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠের দলে থাকতে পছন্দ করে। তারা স্রোতে গা ভাসিয়ে চলে এবং আর দশজনের মতো করে চলতে চায়। তারা এমন একটা মানহাজ বা পদ্ধতির অনুসরণ করে যা তার বন্ধু এবং পরিচিতজনেরা মেনে চলছে।

- কেউ কেউ নিজেদের আক্বীদা-বিশ্বাস এবং মানহাজ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে থাকে। একটি ব্যর্থ হলে আরেকটি যাচাই করে। যেন তারা 'এ-সপ্তাহের-সেরা-আকর্ষণ' খুঁজতে ব্যস্ত!

- কেউ কেউ আবার আবেগচালিত। হয়তো একটা অনলবর্ষী বক্তৃতা বা উপস্থাপনা তাদেরকে আবেগাপ্লুত করে একটি বিশ্বাস বা মানহাযের দিকে ধাবিত করে। অনেকক্ষেত্রেই আবেগের সেই জোয়ারে ভাঁটা পড়লে তারা পুরনো পথে ফিরে যান।

- অনেকে একটি নির্দিষ্ট মানহাজ বা পদ্ধতি অনুসরণ করে কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রতি তাদের ভালো-লাগা থেকে।

এই কারণগুলোই ব্যাখ্যা করে কেন রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর নিছক গুজব শুনেই একদল সাহাবি ﵁ আশাহত হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। এই আয়াতটি আমাদের এই মানবীয় দুর্বলতাগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করে এবং আমাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, যদি আমরা ইসলামের যে মূল নির্যাস বা আদর্শ রয়েছে তার প্রতি অনুরক্ত বা আকৃষ্ট না হয়ে উপরোক্ত কোনো একটি কারণে ইসলামের অনুসারী হই, তবে তুচ্ছাতিতুচ্ছ চাপের মুখেই আমরা ভেঙে পড়ব এবং পশ্চাদপসরণ করে বসব। আমরা আল্লাহর রাসূলকে ﷺ একজন নবী হিসেবে অবশ্যই ভালোবাসিকেননা তিনি আমাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে ইসলামের বাণী ও পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও আমাদের মূল আনুগত্য এবং ভালোবাসা হতে হবে ইসলামের মূল বিষয়বস্তুর প্রতি।

ইসলামের প্রতি আমাদের ভালোবাসা ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়া চলবে না। আর সে কারণেই, উহুদের দিনে বেশ কিছু সাহাবি ﵁ ছিলেন যারা রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর গুজব শুনে পিছপা হননি বরং বলে উঠেছিলেন, "যদি তিনি মারা যান, তবে তিনি

যে উদ্দেশ্যে লড়েছেন, আমরাও সে উদ্দেশ্যে লড়ে যাব।" অর্থাৎ সহজ ভাষায় তাদের মনোভাব ছিল, "তিনি মারা গেছেন তো কী হয়েছে? তিনি আমাদেরকে যা শিখিয়েছেন আমরা সেটা অনুসরণ করছি। ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে আমরা অনুসরণ করিনি, বরং অনুসরণ করছি একজন নবী হিসেবে। তিনি একজন নবী, এর বেশি কিছু তিনি নন।" আর এ কারণেই, সাত বছর পরে যখন রাসূল ﷺ সত্যিই মারা যান, সেদিন আবু বকর ؓ উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "তোমাদের মধ্যে যারা মুহাম্মদের ইবাদাত করত, (জেনে রাখ) মুহাম্মদ মারা গেছে। আর তোমরা যারা আল্লাহর ইবাদাত কর, (জেনে রাখ), আল্লাহ চিরঞ্জীব এবং তাঁর কোনো মৃত্যু নেই।" এরপর তিনি এই আয়াতটি আবৃত্তি করেন। তিনি এ কথাগুলো বলেছিলেন এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে যে, আমরা ইসলামের সত্য আদর্শের কারণে মুসলিম। কোনো বিশেষ ব্যক্তিত্বের প্রতি অনুরাগ বা মোহ থেকে নয়।

পশ্চিমা সমাজে ব্যক্তিপূজা অত্যন্ত প্রবল। হোক তা গায়ক, নায়ক বা অন্য কোনো ধরনের খ্যাতিমান লোক। ভালো করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই অভ্যাসটি ইসলামী দা'ওয়াহ প্রতিষ্ঠানগুলোর মাঝেও ছড়িয়ে পড়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে 'সুপারস্টার শাইখ বা স্কলার' এর একটি সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে। এটি জাহেলী সমাজের 'তারকাব্যক্তি পূজা'র (Celebrity Culture) বিকল্পরূপে আবির্ভূত হয়ে ব্যক্তিপূজার ধারাটিকে ইসলামী ছদ্মবেশে বজায় রেখেছে। এই ধারাটির বিপদ দ্বিমাত্রিক।

#এক, এ ধরনের শাইখ বা 'আলিমের উচ্চারিত যেকোনো কথাকে চূড়ান্ত এবং বিতর্কের উর্ধ্বে ধরা হয় যাকে কোনোভাবেই চ্যালেঞ্জ করা যাবে না। যদিও ইসলামের সত্য উদঘাটন ও প্রচারের অধিকার কোনো বিশেষ দলভুক্ত আলিম বা কোর্স ইন্সট্রাক্টরদের একচেটিয়া সম্পত্তি নয়!

#দুই, কোনো শাইখ বা নেতার প্রতি তাদের অনুসারীদের গভীর ভক্তি এবং অযাচিত আসক্তি থাকলে আরো যে সমস্যাটি হতে পারে তা হলো, যদি সেই নেতা বা শাইখ তার অবস্থান থেকে সরে আসে, কিংবা গ্রেপ্তার হয় কিংবা তার মৃত্যু ঘটে, তখন তাদের অনুসারীরা পথের দিশা হারিয়ে ফেলে এবং পিছু হটতে আরম্ভ করে। কিছু সাহাবিদের ؓ ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই হয়েছিল। তারা কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মৃত্যুর খবর শুনে উহুদের ময়দান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

এই সমস্যার সমাধান হলো একটি মুক্ত, সমালোচক, বিশ্লেষণধর্মী এবং অনুসন্ধিৎসু মনের অধিকারী হওয়া। এর ফলে আপনার আর সত্যের মাঝে কোনো বাধা থাকবে না। এবার সে সত্য যেখান থেকেই আসুক না কেন। এ ধরনের ইতিবাচক মানসিকতা আপনাকে সত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করবে কেবল তা সত্য হওয়ার গুণেই। কে সেই সত্য বলছে তা আপনার কাছে আর মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে না। যেমন করে আল-ইমাম আহমাদ ﷬ বলেছিলেন, "একজন মানুষের জ্ঞানের ঘাটতি থাকে তখনই, যখন সে অন্য কাউকে অন্ধ ভাবে বিশ্বাস করে।" এবং সম্ভবত এ কারণেই, ইমাম আহমদ তাঁর ক্লাসগুলোকে মুসনাদ থেকে হাদীস শিক্ষা দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন এবং তাঁর নিজস্ব মতগুলোকে লিখে রাখার ব্যাপারে খুব জোরালোভাবে নিরুৎসাহিত করতেন। তিনি চাইতেন তার ছাত্ররা যেন তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং মতামতের অনুসারী না হয়ে শুধুমাত্র কুরআন এবং সুন্নাহর অনুসারী হয়।

এটা খুবই দুঃখজনক যে, অনেক মুসলিম প্রাথমিক পর্যায়ে বেশ উৎসাহী এবং উদ্যমী হওয়া সত্ত্বেও এই আয়াতের মূলভাব হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তীতে নানান মানহাজের মাঝে ছুটাছুটি করতে থাকে। আজকে তারা সালাফি, কালকে সুফী বা আশ'আরি, আরেকটা দিন হয়তো আসবে যেদিন তারা পুরো দ্বীনকেই পরিত্যাগ করে ফেলবে। এই সবকিছুর পেছনে ফিরে তাকালে যে সমস্যাটি আমরা আবিষ্কার করব তা আমি উপরে পয়েন্ট আকারে উল্লেখ করেছি। মূলত, ইসলামের পথে তাদের প্রবেশের মুহূর্তটি ছিল অত্যন্ত ভাসাভাসা এবং ক্ষণিকের প্রণোদনায় উদ্বুদ্ধ। তাই প্রবল দ্রুততার সাথে তারা বারবার নিজেদের রঙ বদলায়। এর পেছনে মূল কারণ হলো, তারা নানান কারণে একসময় সত্যের অনুসারী হলেও সঠিক কারণটি অনুধাবন করে অনুসারী হয়নি। আর সত্যকে অনুসরণ করার সঠিক কারণটি হচ্ছে সত্যের বাণীকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার মাধ্যমে তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা।

কাজেই, কোনো ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অতিভক্তি এবং অপরিমিত শ্রদ্ধাবোধ থেকে সতর্ক হোন। মানুষ বদলায়, মৃত্যুবরণ করে। তাই, ইসলামী দা'ওয়াহর মূল বার্তাকে অধ্যয়ন করুন এবং ভালোবাসুন। ইসলামের মূল বার্তা দ্বারা আন্তরিকভাবে উদ্বুদ্ধ হোন এবং অন্যকে উদ্বুদ্ধ করুন। কোনো ব্যক্তি বা সংগঠন নয় বরং এই দা'ওয়াহর মূল উৎসের প্রতি আন্তরিক হোন। কেননা, মানুষের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এই আদর্শ মৃত্যুঞ্জয়ী। এই আদর্শ অপরিবর্তনীয়।

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৮)

সূরা আলে ইমরানের ১৫৩ নং আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

> "...তাই আল্লাহ তোমাদের উপর দুঃখের পর দুঃখ দিলেন, যেন তোমাদের কাছ থেকে যা হারিয়ে গেছে এবং যা কিছু বিপদ তোমাদের উপর আপতিত হয়েছে, তার (কোনোটার) জন্য তোমরা অনুশোচনা না কর..."

এই আয়াতটি উহুদ যুদ্ধে মুসলিমদের বিপর্যয়কে কেন্দ্র করে নাযিল হলেও এর নিহিতার্থ আমাদের বর্তমান জীবনে খুবই পরিষ্কারভাবে প্রয়োগযোগ্য। মানুষের একটি সহজাত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সে যত পায় ততই চায়। আর তার চাওয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে তার দুশ্চিন্তা। কারণ আরও বেশি না পাওয়ার ব্যর্থতা তাকে বিমর্ষ করে তোলে। এই বৈশিষ্ট্যের দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছিলেন,

> "মানুষকে এক পাহাড় স্বর্ণ দেওয়া হলে সে অনুরুপ আরেকটি পাহাড় চাইবে। আর তাই কবরের মাটি ছাড়া কোনো কিছুই তাকে তুষ্ট করতে পারবে না।"

তাই আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে আমাদেরকে খাদ্য, অর্থ, স্বাধীনতা, পরিবার কিংবা সুস্বাস্থ্যের মতো বিভিন্ন নি'আমাত থেকে কিছু সময়ের জন্য বঞ্চিত করেন। এই পৃথিবী এবং তার আরাম-আয়েশের প্রতি আমাদের চির-অতৃপ্ত বাসনাকে নষ্ট করে দেওয়াই এর উদ্দেশ্য। আমরা কোনো কিছুকে যখন যেভাবে চাই সেভাবে পাওয়ার পরিবর্তে যখন কোনো বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে বাধ্য হই, তখন সেই অভিজ্ঞতাটি আমাদের ভবিষ্যতে যেকোনো পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নিতে প্রস্তুত করে তোলে। এই আয়াতটিতে ঠিক একথাটিই বলা হয়েছে। আগেও এমন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়ার কারণে আমরা যা চাই সেটা না পাওয়ায় কিংবা যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে চাই না তার সম্মুখীন হতে বাধ্য হলে আমরা আর মুষড়ে পড়ব না। কারণ আরাম-আয়েশ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আমাদের নির্ভরতার শিকড় কেটে দেওয়া হয়েছে।

এই আয়াতটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে বিষণ্ণতাকে নিরুৎসাহিত করা। অপ্রাপ্ত সাফল্য কিংবা আপতিত অকল্যাণ নিয়ে দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। এতে কোনো উপকার হওয়া তো দূরের কথা, বাস্তবতার বিন্দুমাত্র পরিবর্তনও হয় না। বরং ইবন আল কায়্যিমের ﷫ ভাষায়, বিষণ্ণতা মানুষের সংকল্পকে দুর্বল করে দেয় ও হৃদয়কে ভঙ্গুর করে তোলে। যা তার উপকারে আসবে এমন কাজ করা থেকে বিরত রাখে এবং বাস্তবতাকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। তাই যখন আপনি বিষণ্ণ অনুভব করবেন তৎক্ষণাৎ সেই অনুভূতিকে মন থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করুন। আল্লাহর প্রশংসা, ধৈর্য এবং আল্লাহর সিদ্ধান্তের প্রতি সন্তুষ্টি, তাঁর প্রতি দৃঢ়তর ঈমান এবং 'ক্বদ্দরাল্লাহ ওয়া মাশা-আ ফা'আল' (আল্লাহ ﷻ তাঁর সিদ্ধান্ত দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ীই সিদ্ধান্ত দেন) এই বাক্যাংশটি উচ্চারণের দ্বারা সেই অনুভূতিকে প্রতিস্থাপন করুন। এটাই হচ্ছে তাওহীদের চশমা দিয়ে যেকোনো বিপর্যয়কে দেখার ফলাফল।

তৃতীয়ত, এই পৃথিবী তো বিপদ-আপদমুক্ত হওয়ার কথা ছিল না। শুধু জান্নাতই হবে সবরকম সঙ্কটমুক্ত। উদাহরণস্বরূপ, রাসূলকে ﷺ একবার জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এই পৃথিবীতে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় কী। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, আ'ইশাহ ؓ । অথচ পার্থিব জগতে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সত্তাটির প্রতি তাঁর ভালোবাসাও কিন্তু ত্রুটিহীন ছিল না। কারণ আ'ইশার ؓ উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়ার ঘটনাটি কিছুটা হলেও আ'ইশাহর ؓ প্রতি রসূলুল্লাহর ﷺ ভালোবাসাকে দ্বিধান্বিত করেছিল। এই ঘটনার মাঝেও একটি নিগুঢ় বার্তা রয়েছে। আর তা হলো এই সকল সঙ্কটের উদ্দেশ্যই দুনিয়া থেকে আমাদের অন্তরকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া এবং অন্তরকে আখিরাতের দিকে যাত্রার অভিমুখী করে তোলা।

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ১৯)

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে সূরা আলে ইমরানের ১৫৬ নং আয়াতে বলছেন,

> "হে মু'মিনগণ! তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা কুফরি করে এবং তাদের ভাই-বন্ধুগণ যখন কোনো অভিযানে বের হয় কিংবা কোথাও যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাদের সম্বন্ধে বলে, "তারা যদি আমাদের সাথে থাকতো, তাহলে মরতোও না আহতও হতো না"

এবং ১৬৮ নং আয়াতে বলছেন,

> "...যারা (ঘরে) বসে থেকে নিজেদের ভাইয়ের সম্বন্ধে বলতে লাগলো, আমাদের কথা মতো চললে তারা নিহত হতো না..."

উপরের আয়াতগুলোতে মুনাফিকদের ব্যাপারে বলা হয়েছে। এই মুনাফিকরা উহুদের ময়দানে মুসলিম বাহিনী থেকে বের হয়ে গিয়ে দর্শকের ভূমিকায় মুসলিমদের যুদ্ধ করতে দেখতে থাকে। তারা যুদ্ধরত মু'মিনদের দেখে মনে মনে ভাবতে থাকলো যে, দ্বীন কায়েমের সংগ্রাম থেকে দূরে থেকে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকাটাই বিচক্ষণতা। আর মু'মিনদের যারা দ্বীনকে রক্ষা করা ও বিজয়ী করে তোলার জন্য নিজের প্রাণ পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে রাজি আছে, তারা যেন বোকার মতো নিজেদের জীবনটা নষ্ট করছে! এই আয়াত দুটিতে মুনাফিকদের মানসিকতার সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে।

সত্যের দিকে মানুষকে ডাকতে গেলে কষ্ট ও বিপর্যয় নেমে আসবেই। এই কষ্ট সহ্য করতে পারাটাই একজন প্রকৃত সত্যান্বেষীর পরিচয়। ইবন আল-কায়্যিম দ্বীনের প্রচারে একজন দা'ঈর প্রচেষ্টার সর্বোচ্চ স্তরের দিকে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেছেন: *"(দা'ঈর পক্ষে সর্বোচ্চ ত্যাগ হলো) আল্লাহর রাস্তায় দা'ওয়াত দিতে গিয়ে যাবতীয় বিপর্যয় ও মানুষের দ্বারা সৃষ্ট বাধা-বিপত্তি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের জন্য সহ্য করে যাওয়া।"* এছাড়াও আল্লাহ তাআলা কুরআনের সূরা আল-'আসরে আমাদেরকে দ্বীনের প্রচার ও শিক্ষাদানের পথে সব বাধা-বিপত্তিতে ধৈর্যশীল হতে জোর দিয়ে বলেছেন:

"সময়ের শপথ! মানুষ ভ্রান্তির মধ্যে আছে; কেবল তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করে, সত্যের প্রচারক, আর ধৈর্যধারণে উৎসাহ দান করে।" [সূরা আল-আসর]

অতএব একজন মুসলিম যেচে পড়ে কষ্ট ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে না সেটাই স্বাভাবিক, কিন্তু যদি এমন হয় যে, সত্যপ্রচারের পথে বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন না হয়ে আর কোনো উপায় নেই, তবে একজন মু'মিন হাত গুটিয়ে বসে না থেকে স্বেচ্ছায় সে পথেই এগিয়ে যাবে। কেননা আলোচিত আয়াতগুলোর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয় যে, দ্বীন প্রচারের জন্য সকল কষ্ট মেনে নেওয়ার এই ইচ্ছাই তার ঈমান ও নিফাকের মধ্যে পার্থক্যকারী।

আরাম-আয়েশের দিকে ঝুঁকে পড়া, নিরাপদ জীবন চাওয়া, এগুলো আমাদের স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। স্বয়ং আ'ইশা ﵂ রাসূলুল্লাহর ﷺ ব্যাপারে বলেছেন, "তাঁর সামনে যখন দুটো রাস্তা খোলা থাকত, তখন তিনি দুটোর মাঝে সহজটাই বেছে নিতেন, যদি না সেই সহজ পথে আল্লাহর অবাধ্যতা থাকে।" কিন্তু যখন এমন হতো, দ্বীন প্রচার করতে গিয়ে কুফফারদের কাছ থেকে কিছু ক্ষতির সম্মুখীন হতেই হবে এবং নিজের আরাম-আয়েশকে বিসর্জন দিতে হবে, তখন কি তিনি আরাম-আয়েশকে প্রাধান্য দিতেন? নিজেকেই জিজ্ঞেস করুন।

তিনি বা অন্য কোনো নবী কি কখনো নিজেদের নিরাপত্তা ও আরাম-আয়েশের কথা ভেবে সত্য প্রচারে পিছু হটেছিলেন? আজকাল ইসলামের অনেক দা'ঈ সত্য গোপন করার পিছনে একটি খোঁড়া যুক্তি দাঁড়া করান যে, "এটা করলে আমাদেরকে অচিরেই শত্রুর হাতে ধ্বংস হতে হবে, বরং এ থেকে বিরত থাকলে সামনের দিনগুলোতে আমরা দ্বীনের উপকারে আসতে পারব"। নবীদের কেউ কি এসব খোঁড়া অজুহাত দিয়েছেন? কক্ষণো না।

বদরের সেই দিনে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কথা স্মরণ করে দেখুন, যুদ্ধের আগে তিনি আল্লাহর কাছে কী ফরিয়াদ জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, **"হে আল্লাহ! মু'মিনদের এই দল যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত ও পরাজিত হয়, তোমার ইবাদাত করার জন্য আর কেউই অবশিষ্ট থাকবে না"**। অন্য ভাবে বলা যায়, তিনি জানতেন এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ মানে মু'মিনদের জীবন নয়, খোদ ইসলামের অস্তিত্বকেও হুমকির মুখে ঠেলে দেওয়া। আরাম-আয়েশ পরিত্যাগের বিষয়টি বাদই দিলাম। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ কি বিপদের আশংকায় সাহাবিদেরকে ﵃ নিজেদের মালামাল গুটিয়ে মদীনায় ফিরে যাওয়ার কথা একটিবারের জন্যেও মুখে এনেছিলেন? তিনি এমনটি

করেননি। বরং নির্ভীকচিত্তে সামনে এগিয়ে গিয়ে মুশরিকদের মোকাবেলা করেছেন এবং আল্লাহ ﷻ তাঁকে পরিপূর্ণ বিজয় দান করেছিলেন। এই ঘটনাটি সকল পরিস্থিতিতে তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দেয় এবং আমাদের নিজেদের চিন্তার ধরন কেমন হওয়া উচিত সে ব্যাপারে আমাদেরকে দিকনির্দেশনা দেয়।

সমগ্র পৃথিবী আজ পুঁজিবাদীদের 'যার যার তার তার' (every man for himself) চিন্তাধারা দ্বারা মগজধোলাইকৃত। এই চিন্তাধারা একজন মানুষকে শুধু তার স্বার্থোদ্ধারের জন্য কোনো কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আলোচ্য আয়াতগুলোতে আমরা মুনাফিকদের মুখেও ঠিক একই ধাঁচের কথা শুনতে পাই। তাদের ভাষ্যমতে, সত্যের পক্ষে দাঁড়ালে যদি ক্ষতির আশঙ্কা থাকে তাহলে আমাদের সেই সত্যের দরকার নেই! তাই তারা ঘরে বসে নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহর দীনের জন্য কাজ করে যাওয়া মুসলিমদের নিয়ে হাসিঠাট্টায় মেতে উঠে। ত্বাগুতের রোষানল থেকে নিরাপদে ঘরে বসে থাকার পরিবর্তে 'অকারণে নিজেদের জীবন নষ্ট করা' মুসলিমদের ধর্মান্ধ বলে তাচ্ছিল্য করে। দ্বীনের খাতিরে জান-মাল বিলিয়ে দেওয়া এদের চোখে নেহায়েত অপচয় বলে ঠেকে, আর তাই তারা 'সহজ', 'হিকমাহপূর্ণ' ও 'বাস্তবসম্মত' - এই শব্দগুচ্ছের আড়ালে এমন এক আরামের পথ বেছে নেয়, যে পথে কোনো বিতর্ক বা আদর্শিক দ্বন্দ্বের ঠোকাঠুকি নেই। এটাই অতীত ও বর্তমানের মুনাফিকদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। তারা সর্বদা আত্মোৎসর্গের তুলনায় আত্মরক্ষা করতেই সদা তৎপর।

ইবনে আব্বাস একবার বলেছিলেন যে, "আল্লাহর রাসূল ছিলেন সবচেয়ে উদার ব্যক্তি"। তাঁর উদারতার উদাহরণ দেখাতে গিয়ে আমরা দরিদ্রদের প্রতি তাঁর দানশীলতার উদাহরণ টেনে আনি। অথচ আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকে এর উদাহরণ দেয়া যায় যেটি নিয়ে আমরা সচরাচর ভাবি না। আর তা হলো সত্যের প্রচারে কোনো বাধা-বিপত্তির পরোয়া না করে তাঁর নিজের সুযোগ-সুবিধা, আরাম-আয়েশকে বিসর্জন দেয়া। অর্থাৎ মুনাফিকের বৈশিষ্ট্য যেখানে স্বার্থপরতা, আর নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারীদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিঃস্বার্থতা। প্রতিটি মুসলিম সংগঠন, নেতা, দা'ঈ, এমনকি সাধারণ মুসলিম- প্রত্যেকের উচিত নিজেদের দিকে একবার ফিরে দেখা, নিজেদের কে প্রশ্ন করা। পুঁজিবাদী ধ্যানধারণার প্রভাববলয় থেকে কি তারা নিজেদের দ্বীনের কাজকর্মকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন? তারা কি পেরেছেন দ্বীনের মূলনীতিগুলোকে সততার সাথে আঁকড়ে ধরে রাখতে? নাকি নিজের গা বাঁচানোটাই তাদের কাছে মুখ্য? যদি বলা হয় 'আরাম-আয়েশ অথবা দ্বীনের কল্যাণে ঝুঁকি' - এ দুয়ের মাঝে যেকোনো একটি বেছে নাও - তবে তারা কোনটিকে বেছে নিতে প্রস্তুত? তাঁরা কি নিজেদের ক্ষণস্থায়ী চাহিদাকে

অধিক গুরুত্ব দেবেন, নাকি আল্লাহর দ্বীনের বিশুদ্ধতা রক্ষা ও সঠিকভাবে একে তুলে ধরার প্রয়াসে আত্মনিয়োগের মাধ্যমে দ্বীনের দীর্ঘস্থায়ী উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হবেন? তাঁরা কি মুনাফিকদের আলোচ্য বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিফলন নিজেদের মাঝে ঘটাবেন, নাকি আল্লাহর রাসূলের ﷺ পথকে বেছে নিবেন? কোনটি বেছে নেবেন তারা? আদর্শ নাকি আত্মরক্ষা?

সুরা আল-বুরুজ এর 'আসহাবুল উখদুদ' (গর্তের অধিবাসী) গল্পটির ব্যাপারে সাইয়্যিদ কুতুব বলেছিলেন:

> *"এই ঈমানদার মানুষগুলো নিজেদের ঈমানকে বিক্রি করে দিয়ে দুনিয়ার জীবন লাভ করতে পারত সত্যি, কিন্তু তাতে তাদের আর পুরো মানবজাতির লাভ থেকে ক্ষতির পাল্লাটাই কি অনেক বেশি ভারী হতো না? তাঁরা বেঁচে থাকলেও তাঁরা একসময় পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যেতেনই। অথচ ঈমান বিসর্জন দিলে তার সাথে তারা একটি মহাসত্যকেও গলা টিপে হত্যা করত। কিন্তু তাঁরা তা হতে দেয়নি। ঈমানের জন্য নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে তাঁরা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে তবেই দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।*

ঈমান ছাড়া জীবন মূল্যহীন, আর স্বাধীনতা ছাড়া জীবন হয় মর্যাদাহীন। আর যালিমদের যদি শরীর ও আত্মার উপর আধিপত্য করতে দেওয়া হয়, তাহলে সে জীবন হয় লাঞ্ছনার।- এই মহাসত্যটিকে তারা নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিয়ে সমুন্নত রেখে গেছেন।"

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২০)

সূরা আলে ‘ইমরানের ১৮০ নং আয়াতে আল্লাহ্ ﷻ বলেন –

> “আল্লাহ তাদেরকে নিজের অনুগ্রহে যা দান করেছেন তাতে যারা কৃপণতা করে এই কার্পণ্য তাদের জন্য মঙ্গলকর হবে বলে তারা যেন ধারণা না করে...”

কিছু কিছু দিক দিয়ে আমরা সবাই একইরকম। আমাদের সবাইকে আল্লাহ্ ﷻ তাঁর রহমত ও নি’আমত দান করেছেন, বেশি হোক আর কম হোক। আমাদের যতটুকু আছে তার চাইতে আরো বেশী পেতে আমরা সবাই ভালোবাসি। মুখে আমরা যাই বলি না কেন – যখন আমাদের নিজের কোনো জিনিস ত্যাগ করতে হয়, তখন আমরা সবাই সামান্য হলেও দ্বিধা বোধ করি। আমরা সবাই খুব ভালোমতো বুঝি আল্লাহর জন্য কোনো ত্যাগ স্বীকার করার গুরুত্ব কী ও এর মূল্য কত বড়। সেটা হতে পারে দরিদ্রকে অর্থ-সম্পদের মাধ্যমে সাহায্য করা, কিংবা হতে পারে আল্লাহর পথে অন্য কোনো ত্যাগ স্বীকার করা। আমরা কৃপণতা করি বা না করি আমাদের এই উপলব্ধিগুলো কিন্তু সার্বজনীন।

এই কৃপণতাকে পাশ কাটিয়ে মনের দ্বিধা-দ্বন্দ্বগুলো ঝেড়ে ফেলে আরও উদার হওয়ার সবচেয়ে সহজ উপায় কী?

সবচাইতে সহজ উপায় হলো, দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ধাপে আল্লাহর ﷻ যেই নি’আমতগুলো আপনি ভোগ করছেন সেগুলো এক এক করে গুণতে শুরু করুন। সেটা হতে পারে মনে মনে, মুখে মুখে, বা কাগজে লিখে; সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর ﷻ যেই নি‘আমতগুলো আপনি ভোগ করছেন তার একটা লিস্ট বানানো শুরু করে দিন। সবচেয়ে ছোট এবং আপাত দৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর নি’আমতটাও লিস্টে টুকে রাখুন...

আপনার জীবন, আপনার প্রতিটি নিঃশ্বাস, আপনার দৃষ্টিশক্তি এবং আপনার শরীর সম্পর্কিত সব কিছু, বাড়ি-গাড়ি, পোশাক-আশাক, খাবার এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, আপনার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কাজকর্ম, মসজিদ এবং আপনার সমাজ ও সামাজিকতা সবকিছুই তালিকাবদ্ধ করুন। আপনার স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবার ক্ষমতা, জীবনের আনন্দের মুহূর্তগুলো, আপনার প্রতি

আপনার স্বামী বা স্ত্রীর ভালোবাসা, ইসলাম, বিশুদ্ধ বাতাস, ঠাণ্ডা পানি, নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তার অনুভূতি – যেই দয়া, উদারতা ও ভালোবাসা আপনি অন্য মানুষের কাছ থেকে পেয়ে থাকেন সেসব কিছুকেও হিসাবে আনুন। আপনি খেয়াল করে দেখবেন, প্রতি দিন প্রতি মুহূর্তে এরকম অসংখ্য নি'আমত আপনি ভোগ করছেন, যেগুলো লিখে শেষ করা যাবে না।

কিছুদিন আগে আমি ম্যাগাজিনে একটা প্রবন্ধ পড়ছিলাম, যেটাতে ইন্ডিয়া ও আফ্রিকার কিছু জায়গায় পানি স্বল্পতার জন্য কি কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। এসব জায়গাতে প্রতিদিন সকালে, প্রত্যেক পরিবারের মায়েরা হেঁটে ছয় ঘণ্টার পথ পাড়ি দেওয়ার পর এক কলসি পানি যোগাড় করেন। তারপর তারা সেটা বয়ে আনেন। তারপর সেই এক কলসি পানি দিয়ে পুরো পরিবারের খাওয়া, গোসল ও রান্নার কাজ সারতে হয়, কেননা পানির আর কোনো উৎস তাদের হাতের নাগালে নেই!

অথচ এই কারাগারের সেলেও শুধু উঠে দাঁড়িয়ে দু'পা হেটে গিয়ে বেসিনের একটা বোতাম চাপলেই আমি সেকেন্ডের ব্যবধানে ইচ্ছামতো বিশুদ্ধ, ঠাণ্ডা পানি পেতে পারি। প্রথম দৃষ্টিতে আপনাদের কাছে হয়তো এটাকে একটা অভিশাপ মনে হবে, কারণ আমি কারাগারে। কিন্তু ইন্ডিয়া আর আফ্রিকার সেই মায়েদের সাথে তুলনা করুন একবার! তারা তো এত সহজে বিশুদ্ধ পানি পাবার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। তখনই বোঝা যায়, কারাগারে সেলে বসেও আমি প্রতিদিন যেসব নি'আমত ভোগ করছি তার মধ্যে এই পানি একটি। চিন্তা করে দেখুন, জেলে বসে আমি যদি এরকম নি'আমত ভোগ করি, তাহলে বাইরের স্বাধীন, মুক্ত জীবনে আপনার নি'আমতের লিস্টটা কতো লম্বা হবে!

কাজেই এই নি'আমতগুলোর তালিকা তৈরি করে ফেলুন। লিস্ট যত বড় হবে আপনি ততো গভীরভাবে উপলব্ধি করবেন, আপনার চোখের সামনে থেকেও কত কী আপনার নজর এড়িয়ে গেছে। আপনার নাকের ডগায় থাকা সত্ত্বেও এতদিন এই অসাধারণ আশীর্বাদগুলো নিয়ে আপনি সামান্যতম চিন্তাও করেননি। তারপর আপনি উপলব্ধি করবেন, আপনি এই সবের কিছুই পাওয়ার যোগ্য নন। এসব কিছুই আপনার প্রতি আল্লাহর عزوجل রহমত। তিনি তাঁর অসীম করুণার বশে আপনাকে এগুলো দান করেছেন। এর কোনোটার উপরই আপনার কোনো অধিকার নেই। আপনি যখন আপনার লিস্টের উপর বারবার চোখ বোলাবেন এবং দেখতে পাবেন কীভাবে আপনার শত অযোগ্যতা সত্ত্বেও আল্লাহ্ عزوجل তাঁর

অসীম ভালোবাসা, উদারতা ও করুণায় আপনাকে একটার পর একটা নি'আমত দান করেছেন – তখন আপনি আপনার হৃদয় ও মনে পরিবর্তন দেখতে পাবেন।

মানুষের স্বভাব হলো, তার সাথে যেমন ব্যবহার করা হয়, অন্যের সাথে সে তেমনই ব্যবহার করে। সারাজীবন যদি আপনার সাথে খারাপ ব্যবহার করা হয় তাহলে আপনার স্বাভাবিক প্রবণতা হবে মানুষের সাথে রুক্ষ ব্যবহার করা। কারণ আপনি তেমনটাই শিখে এসেছেন। একইভাবে সারাজীবন যদি আপনি উদারতা, দয়া ও করুণা পেয়ে আসেন, তাহলে আপনি মানুষের সাথে সেভাবেই আচরণ করবেন; কারণ আপনি সেই শিক্ষাই পেয়েছেন। আমাদের সমস্যা হলো, আল্লাহ্ ﷻ প্রতিনিয়ত আমাদের দয়া, করুণা ও উদারতা দেখাচ্ছেন। প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি সেকেন্ডে তিনি আমাদের পরম মমতায় ঢেকে রেখেছেন। কিন্তু বেশীর ভাগ সময়ই আমরা এটা মনে রাখি না, কিংবা মনে রাখলেও এই করুণার পরিধি ও মাত্রা নিয়ে চিন্তা করি না।

তাই আমাদের উদার ও দানশীল হওয়ার পথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম বাধাটি হলো, আমাদের প্রতি আল্লাহর ﷻ দয়া ও করুণা সম্পর্কে আমাদের উদাসীনতা। যত বেশী আপনি আল্লাহর ﷻ নি'আমতগুলোকে আবিষ্কার করবেন, গুণতে থাকবেন এবং আপনি যতো উপলব্ধি করবেন যে এই অসংখ্য নি'আমতের কোনোটারই আপনি যোগ্য নন ততোই আপনি আল্লাহর দেওয়া নি'আমত থেকে অপরকে সাহায্য করার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করবেন। উদারতা ও দানশীলতাকে ভালোবাসতে শেখার সবচেয়ে সহজ উপায় এটাই।

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট- সেল #১০৮

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২১)

আল্লাহ ﷻ সূরা আলে 'ইমরানের ১৮৫ নং আয়াতে বলেন,

> "...আর এই পার্থিব জীবন তো ছলনাময় ক্ষণিকের ভোগ-সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয়"

আয়াতের এই অংশটি আপনার জীবনে প্রয়োগ করতে চাইলে, দৈনন্দিন যেসব টুকরো সুখের মুহূর্তগুলো আপনি উপভোগ করেন সেগুলো উপভোগ করার আগে এক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ান। দগ্ধ দিনের শেষে শীতল পানির স্পর্শ, হিমশীতল পানীয় কিংবা সুস্বাদু খাবার, মোটা অঙ্কের চেক কিংবা চোখ ধাঁধানো গাড়ি অথবা আনকোরা নতুন পোশাক প্রভৃতির সুখস্পর্শ উপভোগ করার আগে একবার থামুন এবং ভাবুন। উপলব্ধি করুন যে আপনার সামনে যেই উপভোগ্য বস্তুটি আছে তা বিভ্রম ছাড়া কিছুই নয়। আপাতদৃষ্টিতে বস্তুটি সৃষ্ট, স্পৃশ্য এবং বাস্তব হলেও এর সাথে আরও সুগভীর এবং গুপ্ত এক বাস্তবতা সংযুক্ত রয়েছে। এই গোপন বাস্তবতাটির ব্যাপারে অসচেতন হলে আপনি ধোঁকায় পড়ে থাকবেন। যে ধোঁকার কথা এই আয়াতে বলা হয়েছে এই গোপন বাস্তবতাটি ঠিক তার বিপরীত। এই ধোঁকার পাশাপাশি এই বাস্তবতা সম্পর্কেও আমাদের সমান ভাবে সচেতন থাকা উচিত।

পার্থিব এই ধোঁকার একটি বিশেষ দিক হচ্ছে যে, এটি আমাদের মধ্যে নিজেদেরকে ক্ষমতাধর ভাবার এক মিথ্যে আত্মতুষ্টি তৈরি করে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি বেশি ঘটে। ১৯১২ সালের কথা মনে করুন। সেবছর টাইটানিক নির্মাণ করা হয়েছিল। এর নির্মাতারা দাবি করেছিল যে, ''স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাও এই জাহাজ ডুবাতে পারবেন না।'' ক্ষণিকের আরাম-আয়েশ আর স্বাচ্ছন্দ্যে ডুবে থাকলে, নিরাপত্তা আর অপরাজেয়তার এক মিথ্যা ধারণা খুব সহজে মানুষের অন্তরে জেঁকে বসে। তাই টাইটানিকের নির্মাতারা আপাতদৃষ্টিতে নিখুঁত এই জাহাজ তৈরি করতে পেরে এই একই ফাঁদে পা দিয়ে বসে। অবশেষে আর কেউ নয়, যখন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই এক টুকরো বরফ খণ্ড দিয়ে টাইটানিক ডুবিয়ে দেন তখন তারা তাদের ধারণার অন্তঃসারশূন্যতা বুঝতে পারে। কি নির্মম পরিহাস! যে পানির উপর টাইটানিকের চলার কথা ছিল সেই পানি দ্বারা গঠিত এক খণ্ড বরফই এটাকে ডুবিয়ে দিল!

আমেরিকান ব্যাংকগুলোর দায়িত্বজ্ঞানহীন অপচয় এবং লোভের ফলে আমেরিকায় সৃষ্ট অর্থনৈতিক মন্দার দিকে লক্ষ করুন। জাগতিক ধোঁকায় পড়ে থাকা হৃদয়ে ক্ষমতার যে মিছে আত্মতৃপ্তি জন্ম নেয় তার প্রকৃষ্ট ফলাফল হচ্ছে আজকের আমেরিকা। আর পার্থিব এই আনন্দের মাত্রা যত বেশী হয় পরবর্তীতে সৃষ্ট দুর্দশার মাত্রাও একই হারে বৃদ্ধি পায়। ধরুন দু'জন উদ্বাস্তু লোক একটি খাবার দোকানের সামনে বসে আছে। দুজনেরই দোকানের ভিতরে ঢুকে কিছু কিনে খেতে ১০ টাকা প্রয়োজন। দোকান থেকে বের হওয়ার পর একজন ক্রেতা তাদের দেখতে পেল। কিন্তু তাদের মধ্যে শুধু একজনকে তিনি ১০ টাকা দান করলেন। যাকে দান করা হলো সে নিশ্চিতভাবে নিজেকে তার সঙ্গীর চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান এবং কর্তৃত্বময় মনে করবে। শুধু ১০ টাকার পার্থক্যেই একজন মানুষের মনে এসব ধারণা তৈরি হয়ে যেতে পারে। তাহলে ভাবুন আপনি আপনার জীবনে আরও কত-শত বিলাস উপভোগ করছেন, আপনার অন্তরে সেগুলোর প্রতিক্রিয়া কেমন হতে পারে! এই ধোঁকা দ্বারা প্রতারিত হওয়া থেকে বেঁচে থাকার উপায় হচ্ছে দুনিয়ার জীবনের প্রকৃত বাস্তবতাকে উপলব্ধি করা। উপলব্ধি করুন যে, আপনি একজন ক্ষমতাহীন জীব এবং আল্লাহ عَزَّوَجَلَّ ছাড়া কোনো শক্তি বা ক্ষমতার উৎস নেই।

পার্থিব ধোঁকার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক রয়েছে। তা হচ্ছে আপনি যা উপভোগ করছেন তা সবসময়ই আপনার কাছে থাকবে এমন ভেবে বসে থাকা। কোনো কিছু উপভোগ করার ঠিক আগ মূহূর্তে কি আপনার মনে কখনো এমন ধারণা উঁকি দেয় যে, যে বিলাসদ্রব্যটি আপনি উপভোগ করতে যাচ্ছেন তা চোখের পলকেই উধাও হয়ে যেতে পারে? আপনার হাতের হিমশীতল পানির গ্লাসটি উঁচু করে ধরে সূরা মুলকের শেষ আয়াতটির কথা ভাবুন,

> "...তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভের গভীরে চলে যায়, তবে কে তোমাদেরকে সরবরাহ করবে পানির স্রোতধারা?"

আপনার স্ত্রী, স্বামী, সন্তান কিংবা বন্ধুদের সঙ্গ উপভোগ করার সময় কি কখনো মনে হয় এরা আগামীকাল জীবিত নাও থাকতে পারে? পরবর্তীতে যখনই তাদের সাথে সময় কাটাবেন তখন নিজেকে সূরা আর-রহমানের ২৬ নং আয়াতটি মনে করিয়ে দেবেন- **"ভূপৃষ্টের সবকিছুই ধ্বংসশীল"**। যখন আপনার গাড়িটি গ্যারেজে রেখে আপনার বিশাল বাসার দিকে এগিয়ে যাবেন তখন এক মূহূর্ত দাঁড়িয়ে আপনার বাড়ির দিকে তাকিয়ে সূরা কাহফের ৩৩-৩৪ নং আয়াতে উল্লেখিত দুই বাগানমালিকের কাহিনি স্মরণ করুন। অনুধাবন করুন, আপনার এই সব সম্পত্তি

মূহূর্তের ব্যবধানে নেই হয়ে যেতে পারে। ছোট-বড়, জীবিত বা জড় যা কিছুই আপনি উপভোগ করেন না কেন তার সবই উধাও হয়ে যেতে পারে। স্বস্তির যে প্রশান্তি আপনি অনুভব করছেন তা আপনার সামনে রাখা আল্লাহর সৃষ্ট দুনিয়ার ধোঁকা মাত্র।

পার্থিব ধোঁকার তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপনি সত্যিকারের আনন্দ কোনটি তা উপলব্ধি করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। আমাদের মন এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, আমরা যদি দীর্ঘ সময় ধরে কোনো ছোটখাট কিছু বা কোনো বিলাসদ্রব্যের পেছনে ছুটি এবং অবশেষে তা অর্জন করি তখন এর চেয়ে ভালো কিছু পাওয়ার কথা আমরা আর ভাবতে পারি না। মনে করুন আপনি মরুভূমিতে হারিয়ে গেছেন। আপনি বেশ কয়েকদিন ধরে কিছুই খেতে বা পান করতে পারেননি। হঠাৎ করে আপনি এক টুকরো শুকনো রুটি, বহু দিনের পুরোনো একটু পনির আর এক জগ কুসুম গরম পানি পেয়ে গেলেন। তীব্র ক্ষুধার জন্য এটুকুই তখন আপনার কাছে অমৃত বলে মনে হবে। আর এগুলো খেয়ে নিজের ক্ষুধা নিবারণ করতে করতে আপনার মনে হবে যে, এর চেয়ে বেশি আপনার আর কিছুই চাওয়ার নেই। আপনি এই বাসি খাবার দিয়ে নিজের ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটিয়ে এতটাই সন্তুষ্ট যে গরম রুটি, তাজা পনির এবং পরিষ্কার ঠান্ডা পানির কথা চিন্তাও করবেন না।

এই পৃথিবী আর পরকালের বিলাসদ্রব্যের মাঝে তুলনাটাও ঠিক এইরকম। আর একারণেই আয়াতটির উল্লেখিত অংশের আগের বাক্যটি হচ্ছে – **"...যাকে আগুন থেকে বহুদূরে রাখা হবে ও স্বর্গোদ্যানে প্রবিষ্ট করা হবে, নিঃসন্দেহ সে হলো সফলকাম ..."**। এই আয়াতটি আনন্দ এবং উপভোগের ধারণাটিকে যথাযথ দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে। এই আয়াতটি আপনার সামনে বাস্তবতাকে উন্মোচন করে দিচ্ছে। তা হলো এই যে, এই পৃথিবীতে আপনি সম্ভাব্য যা যা উপভোগ করতে পারেন তার কোনোটিই জান্নাতের সাথে তুলনীয় নয়। কিন্তু পার্থিব জীবন আমাদের জন্য বাস্তব ও চাক্ষুষ। আর জান্নাতের জীবন সম্পর্কে আমরা শুধু কুরআন এবং হাদীস থেকেই জানতে পারি। তাই এই পৃথিবীর প্রতিটি আনন্দ উপভোগের আগে নিজেকে মনে করিয়ে দিন যে, পরকালে যা আপনার জন্য অপেক্ষা করে আছে- সেটা জান্নাতের আমোদ হোক বা জাহান্নামের আতঙ্কই হোক - তার তুলনায় এই পার্থিব পুলক একটি বিভ্রম মাত্র।

পার্থিব প্রতারণা বনাম বাস্তবতার এই তিনটি বৈশিষ্ট্য যদি আপনি আত্মস্থ করতে পারেন তবে তা আপনার ব্যক্তিত্বের উপর অত্যন্ত কার্যকর প্রভাব ফেলবে।

- প্রথমটি আপনাকে বিনয় শেখাবে।
- দ্বিতীয়টি আপনার যা আছে সেটাকে আরো মূল্যায়ন করতে শেখাবে।
- তৃতীয়টি আপনার অন্তরকে পরকালের সাথে আরও দৃঢ় বন্ধনে যুক্ত করবে এবং এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনের অসারতা থেকে আপনাকে মুক্ত করবে।

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২২)

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে সূরা আলে ‘ইমরানের ১৮৬ নং আয়াতে বলছেন,

> “নিশ্চয়ই তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে তোমাদের সম্পদ ও জীবনের দ্বারা ...”

কিছু লোকের জন্য এই পরীক্ষা হতে পারে দারিদ্র্য; কারো জন্য হতে পারে মারাত্মক কোনো শারীরিক বা মানসিক অসুস্থতা। আবার কিছু মানুষের জন্য তা হতে পারে ভালোবাসার মানুষকে হারানো। কারও জন্য বা বন্দীদশা। তবে আমাদের প্রত্যেকের জন্যই, আল্লাহর ﷻ পক্ষ থেকে এটা একটা প্রতিশ্রুতি যে, তিনি আমাদের সবাইকেই জীবনের কোনো না কোনো সময়ে, কোনো একধরনের পরীক্ষার মুখোমুখি অবশ্যই করবেন। আপনি নবীতুল্য এক সৎকর্মশীল ব্যক্তি হোন কিংবা একজন খুনীর মতো ঘৃণ্য কেউ হোন, আল্লাহ তা‘আলা আপনার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ দুঃখ-কষ্ট এবং পরীক্ষা নির্ধারণ করে রেখেছেন। আল্লাহ তা‘আলার প্রেরিত নবীগণ যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছেন তা ভালো করে খেয়াল করলে আপনার কাছে মনে হবে যেন আল্লাহতা‘আলা আগে থেকেই আপনার আমার জন্য এই জিনিসগুলোকে উদাহরণ হিসেবে রেখে দিয়েছেন। যেন আমরা আমাদের সমস্যাগুলোকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করতে পারি:

- আদম ﷺ এর এক পুত্র আরেক পুত্রকে হত্যা করেছিল।
- নূহ ﷺ এর এক পুত্র ছিল কাফির। পানিতে ডুবে তার মৃত্যু হয়েছিল।
- ইবরাহিম ﷺ এর বাবা ছিল এক অত্যাচারী মুশরিক।
- ইউসুফ ﷺ কে নিরপরাধ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘ দিন কারাগারে কাটাতে হয়েছিল।
- আইয়্যুব ﷺ কে সম্মুখীন হতে হয়েছিল মারাত্মক ধরনের সব অসুখের।

- ইয়াকুব ﷺ দুইবার সাময়িকভাবে পুত্রহারা হয়েছিলেন (একবার ইউসুফ ﷺ, আরেকবার বিন ইয়ামিন)।

- রাসূলুল্লাহ ﷺ দারিদ্র্যের সম্মুখীন হন। তাঁর জীবন একাধিক বার বিপন্ন হয়। তিনি তাঁর শিশু সন্তানদেরকে হারান, প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজাকে হারান, প্রাণপ্রিয় চাচা তাঁকে ছেড়ে চলে যান পরপারে। এমনকি তার নিজের জন্মভূমি থেকে তিনি হয়েছিলেন বিতাড়িত।

তাই বলা চলে এখনকার দিনে আমরা যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি হচ্ছে সেগুলোর মধ্যে এমন একটি সমস্যাও নেই যেগুলো পূর্ববর্তী কোনো নবী-রাসূল মোকাবিলা করেননি। এর অনেকগুলো উপকারিতা আছে, যেমন:

- আমাদের কাছে প্রত্যেকটি কষ্টকর পরীক্ষার নীলনকশা রয়েছে। সেই সাথে রয়েছে সেগুলো মোকাবিলা করার জন্য পর্যাপ্ত দিক নির্দেশনা।

- আল্লাহ তা‘আলার সবচাইতে প্রিয় বান্দাদেরকে এই ধরনের ভয়াবহ পরিস্থিতিগুলোর মুখোমুখি হওয়ার ঘটনা থেকে আমরা সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি যে, এই সকল বিপদময় পরিস্থিতির মোকাবিলা মানুষকে পূর্ণতা দান করে।

- আল্লাহ ﷻ যেখানে প্রিয় বান্দা অর্থাৎ নবী-রাসূলদেরকেই সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি করেন, তাই আপনিও যদি তেমন কঠিন কোনো পরীক্ষায় পতিত হন তাহলে একথা বলার অবকাশ নেই, “আমি-ই কেন?” কারণ আপনার থেকেও অধিক প্রিয় বান্দাদেরকেও আল্লাহ এরচেয়ে কঠিনভাবে পরীক্ষা করেছেন।

- নবীদের সাথে আমাদের অন্তত একটা দিকে সাদৃশ্য অর্জন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

- যখন আমরা নিজেরা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হবো তখন নবীদের কষ্ট-ত্যাগ ইত্যাদি যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হব। কারণ তারা আরো বৃহৎ পরিসরে এসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। ফলে আল্লাহ তা‘আলার নবী -রাসূলদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা সৃষ্টি হবে।

- আল্লাহ তা'আলার উপর আপনার ভরসা আকাশচুম্বী হবে যখন আপনি জানতে পারবেন যে, নবীদের কঠিন বিপদের সময় আল্লাহ তা'আলা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সুতরাং তিনি আপনাকেও সাহায্য করবেন যদি আপনি তাক্বওয়া অবলম্বন করেন।

- এমনকি নবীরাও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষার উর্ধ্বে নন-এই সত্যটি সমগ্র সৃষ্টির উপর আল্লাহতা'আলার একচ্ছত্র আধিপত্যের বিষয়টিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে।

কাজেই এই আয়াতে আল্লাহ ﷻ আমাদের পরীক্ষা নেওয়ার যে ওয়াদা করেছেন তা আমাদের কাছে অপছন্দনীয় মনে হতে পারে। কিন্তু এই অনিবার্য পরীক্ষা থেকে আমাদের অনেক কিছু অর্জন করার আছে। তবে সেজন্য আমাদের পরীক্ষাগুলোকে আল্লাহর নবীদের উপর আমাদের বিশ্বাসের সাথে সমন্বিত করতে হবে।

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট - সেল #১০৮

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২৩)

আল্লাহ তা‘আলা সূরা আলে-‘ইমরানের **১৮৮** তম আয়াতে বলেছেন:

> “তুমি মনে করো না, যারা নিজেদের কৃতকর্মের উপর আনন্দিত হয় এবং নিজেরা যা করেনি, তার জন্যেও প্রশংসিত হতে ভালোবাসে, তুমি কখনো ভেবো না এরা (বুঝি) আল্লাহর আযাব থেকে অব্যাহতি পেয়ে গেছে। বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব।”

আবু সাঈদ খুদরী ﷺ এই আয়াতের পটভূমি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হতেন, তখন এক দল মুনাফিক পেছনে বসে থাকতো আর জিহাদে শামিল হওয়ার হাত থেকে বেঁচে গেছে ভেবে খুব প্রফুল্ল বোধ করতো। যেই না রাসূলুল্লাহ ﷺ লড়াই শেষে ফিরে আসতেন, এই মুনাফিকের দল যার যার কৈফিয়ত নিয়ে তাঁর সামনে হাজির হতো। ইসলামের জন্য নিজের আন্তরিকতা প্রমাণে তখন তারা ব্যতিব্যস্ত। এদিকে মদীনাবাসীরা ভাবতো তারা হয়তো জিহাদে গেছে, তাই তারা এই লোকগুলোর প্রশংসা করতো। অথচ তারা জিহাদে না গেলেও অন্যের মুখে নিজেদের গুণগান শুনতে খুবই পছন্দ করত আর তা শোনার জন্যে মুখিয়ে থাকতো।

এই আয়াতটি একটি ইবাদতের ব্যাপারে (জিহাদ) নাযিল হলেও, আমাদের সামাজিক জীবনের জন্য খুব অসামান্য একটি শিক্ষা এ আয়াতের মাঝে লুকিয়ে আছে। আমরা চাইলে শিক্ষণীয় সেই নির্যাসটুকু বের করে নিজেদের চরিত্র গঠনের কাজে লাগাতে পারি। আমাদের সময়ে এই শিক্ষাটির গুরুত্ব অনেক বেশি। কেননা আজ আমরা এমন এক যুগে বাস করছি, যেখানে নিজেদের ‘ইমেজ’ বা ভাবমূর্তি নিয়ে সবাই প্রয়োজনের চাইতে বেশি সচেতন। “অমুক আমাকে নিয়ে কী ভাবলো, তমুক আমাকে নিয়ে কী চিন্তা করলো, সমাজ আমাকে নিয়ে কী মনে করলো!”-এই চিন্তায় সবাই অস্থির। কখনো কখনো সেই অস্থিরতা এতোটাই লাগামছাড়া হয় যে, অন্যের প্রশংসা লাভের আশায়, আমরা নিজেরা যা নই তা প্রমাণ করার জন্য, নিজেকে জাহির করার জন্য আমরা অস্থির হয়ে পড়ি। প্রতিযোগিতায় পূর্ণ এ দুনিয়ায় মেকি চেহারা আর মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হলেও অন্যের সম্মান আর প্রশংসা কুড়োনোর প্রবণতাটা যেন বেড়েই চলেছে। এই আয়াত আমাদেরকে কৃত্রিমতার খোলস থেকে বের হয়ে আসার শিক্ষা দেয় এবং

সেসব মুনাফিক্বদের মুখোশ উন্মোচন করে, যারা নিজেরা যতোটা না তারিফের যোগ্য, তারচেয়েও বেশি গুণকীর্তন খুঁজে বেড়াতো।

একজন মুসলিমের নিজের উপর ততটুকু আত্মবিশ্বাসী হওয়া প্রয়োজন যতটা হলে সে নিজেকে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে দেখানোর প্রয়োজন বোধ করবে না। ইমাম আহমাদকে একবার প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তিনি কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জ্ঞানার্জন করেন কি না। উত্তরে তিনি যা বললেন সেখানে নিজেকে বড় দেখানো তো দূরে থাক, আল্লাহর জন্য বিশাল কিছু একটা করে ফেলছেন সেই ভাবটুকু পর্যন্ত ছিল না! তিনি কেবল বিনয়ভরে বলেছিলেন, "আসলে আমার কাছে হাদীসগুলো ভালো লেগেছিল, তাই আমি সেগুলো সংগ্রহ করতে শুরু করেছিলাম, এই আর কি!" আবু বকর আস-সিদ্দীক্ব ﵁ কে কেউ প্রশংসা করলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে দু'আ করতেন: "হে আল্লাহ! তারা আমাকে যা মনে করে, আমাকে তারচেয়েও উত্তম হওয়ার তাওফিক্ব দান করুন এবং তারা আমার সম্পর্কে যা জানে না, সেগুলোর জন্যে আমাকে ক্ষমা করে দিন।" অথচ নবী-রাসূলদের পরে দুনিয়ার বুকে জন্ম নেওয়া মানুষগুলোর মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ!

সুতরাং এটিই প্রমাণিত হচ্ছে যে, সালাফগণ মানুষের কাছে নিজেদেরকে খুব বড় মাপের কিছু প্রমাণে মোটেও ব্যস্ত ছিলেন না। সত্যি বলতে কি, তারা নিজেদের ভাবমূর্তি নিয়ে কোনো চিন্তাই করতেন না। তারা ছিলেন নিতান্তই অনাড়ম্বর সাদাসিধে বাসিন্দা। লোক দেখানোর ব্যাপারে অনাগ্রহী অকপট মাটির মানুষ। তাঁরা শুধুই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন।

আপনি যদি এই মানুষগুলোর মতো হতে চান তাহলে খুব বেশি কষ্ট করতে হবে না, শুধু আপনি যাদেরকে অভিভূত করার সংগ্রামে লিপ্ত, সেই মানুষগুলোকে তাদের সত্যিকার আসনে বসিয়ে দিলেই চলবে! হ্যাঁ, আমি বুঝাতে চাচ্ছি যে, তারাও ঠিক আপনার মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ। বীর্য ও ডিম্বাণু থেকে তাদের জন্ম। তারা আপনার মতোই দুর্বল, অসহায়, সীমাবদ্ধ এবং ত্রুটিপূর্ণ। এ সুবিশাল বিশ্ব চরাচরে তারা কতই না তুচ্ছ! আর তাদের তুলনায় আল্লাহ ﷻ কত বেশি শক্তিশালী, কতটা ক্ষমতাধর সেটা নিয়ে কখনো ভেবে দেখেছেন? তবে কে আপনার সময়, শ্রম ও মনোযোগ পাওয়ার অধিকতর দাবীদার? একবার যদি আপনার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভয় ও শ্রদ্ধা স্থান পায়, তাহলে দেখবেন, আস্তে আস্তে অন্যরা কে কী ভাবলো সেটা নিয়ে আপনি কম মাথা ঘামাচ্ছেন। তখন একমাত্র আল্লাহ তা'আলার দিকে আপনি অধিক মনোযোগী হয়ে উঠবেন। সত্যি বলতে কি, আপনি যদি এমনটি করতে পারেন, কিছু-না-চাইতেই দেখবেন যে

মানুষের চোখে আপনি মহৎ একজন হয়ে গেছেন। সবার অন্তরে স্থান করে নিয়েছেন। মানুষ সাধারণত খাঁটি ব্যক্তিত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয় যারা লোকের প্রশংসা কুড়োতে মরিয়া নয়। তারা যেমন, তেমনই থাকে। আপনি লক্ষ করবেন, এ মানুষগুলো নিজের ব্যক্তিত্বের কারণেই লোকের সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত হয়। লোকেরা তাকে এটা-সেটা ভাবুক এটা তার চাওয়া নয়।

এখানে প্রথম ব্যাপারটি জুড়ে ছিল এই নিজের ভাবমূর্তি নিয়ে অতিসচেতনতা অন্যদের উপর কী প্রভাব বিস্তার করতে পারে সে আলোচনা। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো, এই নিন্দনীয় স্বভাবটি স্বয়ং আপনার উপর কী প্রভাব ফেলে তা বোঝার চেষ্টা করা। আপনি যখন দেখবেন মানুষ আপনাকে যা মনে করেছে আপনি আসলে তা নন, তখন নিজের ভেতর মারাত্মক অশান্তি আর বিশৃঙ্খলা বোধ করবেন। অনেকটা নিজের সাথে নিজে যুদ্ধ করার মতো। বিশ্বের নামকরা সেলিব্রিটিদের মধ্যে হতাশা, মাদকাসক্তি এবং আত্মহত্যার আধিক্যের দিকে খেয়াল করুন! তারা যখন আবিষ্কার করে বাইরের জগতের সামনে তার যে মহান রূপ উপস্থাপন করা হয়, সেটার সাথে তার একান্ত ব্যক্তিগত জীবনের বিস্তর ফারাক আছে, তখনই একরাশ বিষণ্ণতা তাদের উপর জেঁকে বসে। তারা যে মেকি জীবনযাপনের ভান করছে, সেটি কেবল-ই একটি মিথ্যে ছলনা, একটি অলীক অভিনয়।এই তেতো অনুভূতি তাদেরকে কুরে কুরে খায়। নিজেরা বাস্তবে যা নয়, তারচেয়েও বড় করে যারা নিজেকে মানুষের সামনে হাজির করতে চায় তাদের সবার জীবনেই এই ব্যাপারটি আরেকটু ছোট পরিসরে ঘটে থাকে।

আপনি হয়তো ভাবছেন যে, মানুষকে বোকা বানাতে পেরে, নিজেদেরকে জাহির করে এ লোকগুলো খুব আনন্দবোধ করে। কিন্তু ২০১০ সালের জুন মাসে ‘সাইকোলজিকাল সায়েন্স’ (*Psychological Science*) নামক ম্যাগাজিনে প্রকাশিত একটি রিসার্চ অনুযায়ী তার উল্টোটাই প্রমাণিত হয়। এখানে একদল নারীর উপর একটি পরীক্ষা চালানো হয়। তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয় একটি করে ৩০০ ডলার মূল্যের ব্র্যান্ডের সানগ্লাস (ক্লো ব্র্যান্ডের সানগ্লাস)। অংশগ্রহণকারী নারীদের কিছু অংশকে বলা হয় তারা যে সানগ্লাসটি পরেছে, তা আসল ব্র্যান্ডের চশমা। আর অন্যদেরকে বলা হয় যে এগুলো আসলে নকল। এরপর তাদের সবার একটি গণিত পরীক্ষা নেওয়া হয়। সেখানে জিতলে তাদের ১০ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা দেওয়া হয়। সেই পরীক্ষায় তাদের নিজেদেরকেই নিজেদের পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করতে দেওয়া হয়। দেখা গেল, যারা জানতো তারা আসল ব্র্যান্ডের চশমা পরেছে, তাদের মাঝে মাত্র ৩০ ভাগ

নিজেদের নম্বর প্রদানে জালিয়াতি করেছে, আর যারা ভেবেছিল তারা নকল চশমা পরেছে, তাদের শতকরা ৭০ জনই মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে।

পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের কম্পিউটার স্ক্রিনের উপর কিছু বিন্দু গণনা করতে বলা হয়। বলা হয় যে, প্রত্যেকটি বিন্দুর অবস্থানের উপর পুরস্কারমূল্য নির্ভর করবে। এখানেও দেখা গেল, যারা নকল সানগ্লাস পরে আছে বলে ভেবেছে, তারা গণনাকৃত বিন্দুর অবস্থান নিয়ে অনেক বেশি মিথ্যের আশ্রয় নিয়েছে, অথচ যারা ভেবেছে তাদের সানগ্লাস আসল তারা এতোটা করেনি। তৃতীয় অংশ ছিল প্রশ্নোত্তর পর্ব যেখানে তাদেরকে নৈতিকতা, সততা প্রভৃতি বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হয়। এখানেও প্রকাশ পেল যারা জানতো তারা নকল জিনিস পরে আছে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যদের ব্যাপারে নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে। অন্যদেরকে অসৎ ও নীতিহীন মনে করে। চতুর্থ ভাগে তাদেরকে এমন কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয় যার মাধ্যমে বোঝা যায় একজন কতটা একাকিত্ব বোধ করছে। এখানেও একই ব্যাপার! যারা জানতো যে তারা আসল চশমা পরে আছে, তাদের তুলনায় যারা ভেবেছে যে নকল চশমা পরে আছে, তারা নিজেদেরকে বেশি একা মনে করছিল।

চমকপ্রদ এই পরিসংখ্যানটিও এ উপসংহার টানে যে, নকল জিনিসপত্র পরে একজন মানুষ কাজেকর্মে এবং মানসিকভাবেও তিক্ততা অনুভব করে। অন্যদিকে যারা জানে তারা আসলটাই পরেছে, তারা হয় অধিক সৎ, নীতিবান ও পরিতৃপ্ত।

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট - সেল নম্বর # ১০৮

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২৪)

আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের সূরা আলে ‘ইমরান এর ১৯৬-১৯৭ আয়াতে বলেন,

> “নগরীতে কাফেরদের চাল-চলন যেন তোমাদেরকে ধোঁকা না দেয়। এটা হলো সামান্য (কয়েকদিনের) সামগ্রীমাত্র-এরপর তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম। আর সেটি হলো অতি নিকৃষ্ট অবস্থান।”

পত্রিকায় আন্তর্জাতিক খবরের পাতা উল্টিয়ে শত্রুর হাতে আক্রান্ত মুসলিম দেশগুলোর খবর পড়ার সময় এই দুটো আয়াত আমার খুব মনে পড়ে। আমাদের বর্তমান বাস্তবতার নিরীখে এই দুটি আয়াত যেন আমাদের মনে প্রশান্তি ও ভরসা যোগাতে সবচেয়ে বেশি কার্যকরী। আপনি খবরের কাগজ একবার উল্টিয়ে দেখুন। সপ্তাহের প্রতিটি দিনেই পাকিস্তানে সিআইএ এর ড্রোন হামলার খবর, ফিলিস্তিনে নতুন কোনো বসতি স্থাপনের খবর, আফগানিস্তানের মাটিতে মার্কিন দখলদারিত্ব সম্প্রসারণ এবং এধরনের আরো অনেক খবর খুঁজে পাবেন। আপনার মনে হয়তো সামান্য হলেও হতাশা জেঁকে বসে। আপনি হয়তো ভাবেন, “এসবের শেষ কবে? যালিমদের পাশার দান কখন উল্টে যাবে?”

এই দুটি আয়াত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে, তা আমাদেরকে বর্তমান প্রেক্ষাপট ও পরিস্থিতির গতিপ্রকৃতি সঠিকভাবে অনুধাবন করতে সাহায্য করে। আপনার মনে হতেই পারে আল্লাহ ﷻ বুঝি এই দুটি আয়াত বিশেষভাবে আমাদের জন্য নাযিল করেছেন!

প্রথমত, আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে বলছেন, তিনি তার শত্রুদেরকে দুনিয়ার বুকে রাজত্ব দেবেন এবং তাতে মু’মিনরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এর মানে হলো যখন আপনার জীবনে দুঃসময় আসে, সেটি কোনো আকস্মিক ‘হ য ব র ল’ অবস্থা নয়। বরং আল্লাহ ﷻ এর দ্বারা আপনাকে শাণিত করে তুলতে চান। তিনি আপনাকে আরো বলিষ্ঠভাবে গড়ে তুলতে চান। এই কারণে তিনি আপনাকে ক্ষণিকের এই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে চালনা করেন। তেমনি, মুসলিমদের উপর কাফিরদের আধিপত্য আমাদের সকলের অপছন্দ হলেও এটি মূলত মুসলিম উম্মাহকে প্রশিক্ষিত ও শক্তিশালী করে তোলার একটি

পন্থা। এতে বিজয় লাভের আগে মুসলিমরা কঠিন সময় ও দুর্যোগ পাড়ি দিতে শেখে। ফলে অর্জিত বিজয়কে তারা যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে।

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ্ আমাদের আদেশ করছেন যাতে এই কুফফার সভ্যতার চাকচিক্য দেখে আমরা ধোঁকায় না পড়ি। আর এই ধোঁকা থেকে বাঁচতে যে বিষয়টি সবসময়ের জন্য মাথায় গেঁথে রাখতে হবে তা হলো, কুফফারদের এই রাজত্ব সাময়িক, আর তাদের চূড়ান্ত গন্তব্য জাহান্নাম, যা চিরস্থায়ী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ ﷻ দুনিয়ার বুকের সবচেয়ে ধনী আর বিলাসী ব্যক্তিটিকে জাহান্নামে একবার ডুব দিয়ে তুলে এনে জিজ্ঞাসা করবেন, "তুমি কি তোমার জীবনে কখনো কোনো কিছু উপভোগ করেছিলে?" সেই ব্যক্তি উত্তর দেবে, 'না'। কারণ জাহান্নামের সেই এক মুহূর্তের অভিজ্ঞতাই এতটা ভয়াবহ যে, নিমেষে সে তার দুনিয়ার জীবনের সমস্ত আরাম আয়েশের কথা ভুলে যাবে।

তেমনি কোনো যালেম ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতি যখন তাদের আধিপত্য আর প্রভাব-প্রতিপত্তির ঝলকানি দ্বারা বিশ্বের চোখ ধাঁধিয়ে দেয় এবং একই সাথে কুফর ও যুলুম-নির্যাতনের ধারা অব্যাহত রাখে, তাদের পরিণতিও ঠিক একই রকম হবে। এই চিরন্তন পরিণতির সাক্ষী ইতিহাস। দুনিয়াবী কোনো উৎকর্ষই এই পতন ঠেকাতে পারবে না। তাদের দুনিয়াবী পতন ছাড়াও এই আয়াতের আরো একটি উপকারী দিক হলো, জাহান্নামের গন্তব্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ ﷻ এই সাময়িক দুনিয়াবী জীবনের তুলনায় আখিরাতের জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং দীর্ঘস্থায়ীতা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন।

সবশেষে, আরো একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় আছে, যার কথা এই আয়াতে সরাসরি উল্লেখিত না হলেও আল-বুখারীর একটি হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। সেই হাদিসটিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, **"এটি আল্লাহর দায়িত্ব তিনি যদি কিছুকে উঁচুতে তুলে ধরেন তবে তিনি সেটিকে অবশ্যই নামিয়েও দেন"**। অন্য কথায়, যার উত্থান আছে, তার পতনও আছে। আমরা এক্ষেত্রে কিছুদিন আগে প্রকাশিত একটা চমৎকার বই পড়ে দেখতে পারি। বইটির নাম, *Why the West Rules – For Now: The Patterns of History and What They Reveal About the Future*। এই বইয়ে লেখক ইয়ান মরিস দুটো মৌলিক যুক্তির উপস্থাপনা করেছেন, প্রথমত, ইতিহাস জুড়ে যত সভ্যতা, তাদের উত্থান ও পতনের পেছনে যে কারণ সেগুলো কেউ কখনো নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত, ২০০ বছরেরও অধিক সময় ধরে আধিপত্য বিস্তারকারী পশ্চিমা সভ্যতার পতনও খুব দ্রুতই সংঘটিত হবে।

বইটিতে লেখক সেই ১২০০০ বছর আগের বরফ যুগের পর থেকে বর্ণনা শুরু করেছেন। তখন কৃষির ধারণা জন্ম লাভ করে আর বৃহৎ পরিসরে সুসংগঠিত সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তিনি বর্ণনা করেন, কীভাবে প্রয়োজনীয় গাছপালা ও গৃহপালিত প্রাণীর প্রাচুর্যের কারণে দুটি আদি ভৌগোলিক আবাস থেকে একের পর এক সভ্যতার জন্ম ও চতুর্মুখী সম্প্রসারণ হয়, এ দুটি এলাকা হলো পশ্চিম ইউরেশিয়া এবং ইয়াংজি ও ইয়েলো নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল যা বর্তমানে চীন নামে পরিচিত। মরিস উল্লেখ করেন, শুরুতে পশ্চিমারা প্রযুক্তিগত উন্নয়নে প্রাচ্যের তুলনায় প্রায় ২০০০ বছর এগিয়ে থাকলেও খ্রিষ্টপূর্ব ১০০০ এ এসে এই অগ্রযাত্রা স্তিমিত হয় এবং তারা সমানে-সমান হয় ওঠে। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর প্রাচ্য নেতৃত্বের আসনে অবতীর্ণ হয়। কারণ, এই রোমান সাম্রাজ্যই তৎকালীন সময়ে পশ্চিমা সভ্যতার প্রতিনিধিত্ব করত এবং তারাই ছিল সেই পশ্চিমা সভ্যতার সামাজিক উন্নয়নের চূড়া। এই অবস্থা ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত বিরাজমান থাকে। এই সময়েই ইউরোপ অন্ধকার যুগে প্রবেশ করে। অপরদিকে সুই রাজবংশের নেতৃত্বে চীন ঐক্যবদ্ধ হয় এবং পরবর্তী ১০০০ বছর পর্যন্ত তারা কর্তৃত্বের ছড়ি ধরে রাখে। ১৮ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত প্রাচ্যের এই অগ্রগামিতা টিকে থাকে। কিন্তু সেই সময়ে এসে আবার পশ্চিমারা প্রাচ্যের সমকক্ষ রূপে আবির্ভূত হয়। এর কারণ হলো ক্রমাগত যুদ্ধের মাধ্যমে পশ্চিমারা তাদের সামরিক প্রযুক্তিক্ষেত্রে ব্যাপক পারদর্শিতা লাভ করে। ১৮ শতকের শেষে, শিল্প বিপ্লবের প্রারম্ভিক পর্যায়ে দুটি সভ্যতার শক্তিমত্তার ভারসাম্যে পরিবর্তন আসে এবং তা পশ্চিমাদের দিকে হেলে যায়। ব্রিটিশ প্রকৌশলবিদগণ তাদের দেশে অবস্থিত বিপুল কয়লাখনির সুবাদে বাষ্পচালিত জাহাজ, ট্রেন এবং শিল্পকারখানায় প্রভূত উন্নতি সাধন করে। এর মাধ্যমে তারা অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে আধিপত্য অর্জনে সক্ষম হয়। ব্রিটিশদের এই আধিপত্য পরবর্তী ১০০ বছর (বিংশ শতাব্দীর পূর্ব অবধি) টিকে থাকে। এই ব্রিটিশ আধিপত্যই আধুনিক যুগের আমেরিকান আধিপত্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে।

মূল যে বিষয়টির উপর বইটি দৃষ্টিপাত করেছে তা হলো, দশ হাজারেরও বেশি সময় ধরে, কী করে একের পর এক সভ্যতার জন্মই হয়েছে যেন ধ্বংস হওয়ার জন্য! তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরের কিছু কারণে তাদের পতন ছিল অনিবার্য। কিন্তু তাদের প্রত্যেকের রাজত্বকালই ছিল মানবজাতির সামগ্রিক ইতিহাসের মাঝে একটি ছোট্ট পাতা মাত্র। সাময়িক ও সংক্ষিপ্ত।

লেখক এরপর উপসংহার টানতে বই এর নামের সাথে জুড়ে দেওয়া – 'পশ্চিমারা এখন শাসন করছে, কিন্তু কতদিনের জন্যে?' এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা

করেছেন। তার উত্তর ছিল এমন, যদি প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের উন্নতির ধারা এখন যেমনটা-আছে-তেমনটাই-থাকে, তবে আগামী শতাব্দীর শুরুতেই কবর রচিত হবে পশ্চিমা প্রতিপত্তির।

আল্লাহু 'আলাম।

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশান ইউনিট – সেল নাম্বার #১০৮

কুরআন এবং আপনি (পর্ব ২৫)

কুরআনে সূরা নিসার ১নং আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেছেন,

> “হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু’জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী...”

এই আয়াতে এক চিরন্তন বাস্তবতার কথা আছে। এই বাস্তবতাটি আপনাকে যেকোনো মহৎ কাজ করার ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যোগাবে। ভেবে দেখুন, আল্লাহ তা‘আলা সমগ্র মানবজাতিকে আহবান করে বলছেন, তিনি আমাদের সবাইকে কেবল একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে জন্ম দিয়েছেন। তাদের অন্তরঙ্গতা থেকে সন্তান জন্ম নিয়েছে, সেসব সন্তানদের আরো সন্তান-সন্ততি হয়েছে এবং এমনি করে ঈসা ﷺ এর সময়ে পৃথিবীর লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে দু’শ মিলিয়ন! সতের শতকের মাঝেই বিশ্বের জনসংখ্যা ৫০০ মিলিয়ন স্পর্শ করে আর উনিশ শতক নাগাদ এ সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে এক বিলিয়ন ছাড়িয়ে যায়। বিশ শতকে তা আবারো বেড়ে দ্বিগুণ হয়, অর্থাৎ দুই বিলিয়ন। আর আজকে পুরো দুনিয়াতে প্রায় সাত বিলিয়ন লোকের বাস। অর্থাৎ জনসংখ্যা বেড়েছে তিন গুণেরও বেশি। ধারণা করা হয় আগামী শতক আসতে আসতেই পৃথিবীতে লোকসংখ্যা দশ বিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। শত ভাষাভাষী হাজার কোটি মানুষ বিভিন্ন দেশ আর মহাদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এদের মাঝে রয়েছে বিভিন্ন জাতি, বর্ণ আর গোত্রের বৈচিত্র্য।এই বৈচিত্র্যময় বিশাল জনগোষ্ঠীর সূত্রপাত হয়েছে কেবল একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে। অথচ তারা দুনিয়ার বুকে এসেছিলেন আজ থেকে হাজার বছর আগে।

এ ব্যাপারটি একটি গভীর চিন্তার খোরাক যোগায়। আপনার একটিমাত্র কাজ আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ মনে হলেও এর ফলাফল হতে পারে অসামান্য! কোনো এক অজানা দিনে করা আপনার একটি ছোট্ট কাজ, একের পর এক ঘটনার জন্ম দিয়ে এক বিশাল পরিণতি সৃষ্টি করতে পারে। হয়তো কাজটি করার সময় সেদিন এমন পরিণতির কথা আপনি কল্পনাতেও ভাবেননি। বৃষ্টির প্রথম ছোট্ট ফোঁটাটা যখন পানির বুকে আছড়ে পড়ে তখন সে জায়গাটাকে কেন্দ্র করে ছোট্ট একটা ঢেউ ওঠে। সেই ঢেউটা তার চারপাশে মৃদু আলোড়ন তুলতে তুলতে ছড়িয়ে যায়।

তেমনি আপনার একটি ছোট্ট কাজ থেকেও জন্ম নিতে পারে অজস্র ঘটনা। ইংরেজিতে এর একটি নাম আছে, যাকে বলা হয় Domino Effect, তবে এর প্রকৃত নাম হওয়া উচিত জ্যামিতিক সংবৃদ্ধি (geometric progression)।

সমাজবিজ্ঞানীরা এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে মহামারির উদাহরণের আশ্রয় নেন। ধরুন, ভারত থেকে এক পর্যটক বাংলাদেশে বেড়াতে আসার সময় তার শরীরে এমন এক সংক্রামক ভাইরাস বয়ে এনেছে, যার সংক্রমণের হার ১০%। অর্থাৎ তার সাথে দেখা হওয়া প্রতি দশ জন লোকের এক জন এ জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হবে। বাংলাদেশের রাস্তাঘাটে প্রতিদিন প্রায় ৫০ জন লোক তার সংস্পর্শে আসলো, অতএব তাদের মাঝে পাঁচ জনকে সে সংক্রমিত করলো। পরদিন, সেই পাঁচ ব্যক্তির প্রত্যেকে আরো নতুন পঞ্চাশ জনের সংস্পর্শে আসলো এবং তাদের ১০% লোককে আক্রান্ত করলো। তাহলে, এখন আক্রান্ত ব্যক্তির পরিমাণ দাঁড়ালো নতুন ২৫ জন+প্রথম ৫ জন+পর্যটক নিজে অর্থাৎ মোট ৩১ জন। তৃতীয় দিনে এই ৩১ জন লোকের প্রতেকে আরো ৫০ জনের সান্নিধ্যে আসলো এবং তাদের ১০% কে আক্রান্ত করলো। সুতরাং তিন নম্বর দিনে নতুন আরো ১৫৫ জন জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হচ্ছে আর আক্রান্ত লোকের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১৮৬! হিসেব করলে দেখা যাবে চার নম্বর দিনে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা এক হাজার ছাড়িয়ে যাচ্ছে!

তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, এক ভারতীয় পর্যটকের শরীর থেকে হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি লোক সেই সংক্রামক ভাইরাসের বাহকে পরিণত হয়েছে চার দিনের মাথায়! তাহলে ভেবে দেখুন, এক সপ্তাহ, এক মাস বা এক বছর পরে এই সংখ্যাটি জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পেতে পেতে কোথায় গিয়ে ঠেকবে! ভারত থেকে যখন মাত্র একজন পর্যটক এ ভাইরাস নিয়ে বাংলাদেশের বিমানবন্দরে হাজির হয়েছিল, তখন এইকি বিশাল সংখ্যাটা আমরা কল্পনায়ও আনতে পেরেছিলাম?

দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতার মসনদ আকঁড়ে রাখার পর আমেরিকান ডলারে পালিত মুবারক সরকারের শক্তিশালী বলয় আজ ভেঙে পড়েছে। তিউনিসিয়ার বেন আলীর শাসনের পতন ঘটেছে। লিবিয়াতে প্রকৃতপক্ষেই একটি সশস্ত্র বিপ্লবের সূচনা হয়েছে (যদিও দুর্ভাগ্যক্রমে তারা বোকার মতো পশ্চিমাদের হস্তক্ষেপ ও সাহায্য কামনা করে বসেছে)। আজ আলজেরিয়া, বাহরাইন, জর্দান, সিরিয়া, ইয়েমেন এবং সৌদি আরবের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে। এটা একসময় ছিল চিন্তারও অতীত। সমগ্র আরব জুড়ে এখন যালেম শাসকদের বিরুদ্ধে দাউদাউ করে বিদ্রোহের আগুন জ্বলছে। এই শাসকরা যুগ যুগ ধরে

জনগণের রক্ত চুষে খেয়েছে, তাদের উপর অমানবিক অত্যাচার চালিয়েছে। এ ঘটনাগুলো ক্বিয়ামাতের পূর্বাভাস দেয়। এই ঘটনাগুলো প্রতিনিয়ত পৃথিবীর চেহারাকে পাল্টে দিতে থাকবে। কিন্তু এ সব কিছুর শুরু হয়েছিল কোথায়?

এই আগুনের সূচনা হয়েছিল একটি মাত্র স্ফুলিঙ্গ থেকে। আপাতদৃষ্টিতে একক, অপ্রাসঙ্গিক ও তুচ্ছ একটি কাজ থেকে। এ সবের শুরু হয়েছিল ডিসেম্বরের এক গড়পড়তা দিনে। সেদিন হতাশায় জর্জরিত এক বেকার যুবক তিউনিসিয়ার রাস্তায় নিজের গায়ে গ্যাসোলিন ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। অবশ্যই ইসলামের দৃষ্টিতে এ কাজ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, তবে এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে তার এই একটি কাজের সুদূরপ্রসারী ফলাফল। তার ছোট্ট একটি কাজ ছোট ছোট প্রতিবাদের জন্ম দেয়। সেখান থেকে একটি বিশাল আন্দোলন বেগবান হয়। ফলস্বরূপ তিউনিসিয়া সরকারের পতন ঘটে, পতন ঘটে মিসর সরকারের। এই ঘটনা অন্যান্য বহু দেশের লক্ষাধিক লোককে যালিম-সরকার বিরোধী আন্দোলনে নেমে পড়তে উৎসাহ যোগায়। এমনকি এই আগুনের আঁচ আমেরিকাকেও স্পর্শ করে! (ম্যাডিসন, উইসকনসিনের ঘটনা এখানে উল্লেখ্য - যেখানে জনগণ রাজনৈতিক দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে)। মুহাম্মদ বুয়াজিজি যখন নিজের গায়ে গ্যাসোলিন ঢেলে দিচ্ছিল, সে মুহূর্তে কেউ ভাবতেও পারেনি এ ঘটনা শেষ পর্যন্ত পুরো মধ্যপ্রাচ্যের চিত্রকে বদলে দেবে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও এ বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন।

আমেরিকায় কনকর্ড নামে এক এলাকা আছে। ম্যাসাচুসেটসে আমার বাসা থেকে গাড়ি করে কনকর্ড যেতে কয়েক মিনিট সময় লাগে। কনকর্ড হলো সেই শহর যেখানে ২০০ বছর আগে ব্রিটিশ দখলদারদের সাথে স্থানীয় আমেরিকানদের মোকাবিলা হয়। সেখান থেকে সূচিত হয় আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ। আর সেখান থেকেই যুক্তরাষ্ট্র নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এ সবকিছুর শুরু কোথা থেকে? এর সূচনা ১৭৭৫ সালের এপ্রিল মাসের কোনো এক দিনে, যেদিন পল রিভিয়া নামের এক আমেরিকান, ব্রিটিশ সেনাদের সশস্ত্র অভিযানের পরিকল্পনা আগেভাগে টের পেয়ে যান (তখন আমেরিকা ছিল ব্রিটিশদের ঔপনিবেশ)। তিনি জানতে পারেন, ব্রিটিশ বাহিনী লেক্সিংটন শহরে জন হ্যাংকক ও স্যামুয়েল অ্যাডামকে গ্রেপ্তার করে কনকর্ডে অতর্কিত আক্রমণ করে স্থানীয় সৈন্যবাহিনীর অস্ত্রশস্ত্র জব্দ করার পরিকল্পনা এঁটেছে। সে রাতে রিভিয়া খুব সাধারণ একটি কাজ করেন। তিনি একটি ঘোড়া নিয়ে বের হয়ে শহরে শহরে গেলেন এবং স্থানীয় লোকদের কাছে আগাম সতর্কবার্তা পৌঁছে দিলেন যে, পরদিন সকালে ব্রিটিশ সৈন্যরা অভিযানের পরিকল্পনা করেছে। লেক্সিংটন যাবার পথে প্রত্যেক শহরে

নেমে তিনি এই কাজটি করলেন। পরদিন সকালে ব্রিটিশরা সেখানে পৌঁছে আবিষ্কার করলো তাদের মোকাবিলার জন্য আগে থেকেই একদল মিলিশিয়া বাহিনী প্রস্তুত! লড়াই হলো। ব্রিটিশরা কনকর্ডে পরাজিত হলো এবং সূচনা হলো আমেরিকান মুক্তিযুদ্ধের। এই মিলিশিয়া মুক্তিবাহিনীই পরবর্তীতে সারা দেশে ব্রিটিশ হানাদারদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

উপরে বর্ণিত ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি যোগসূত্র আছে। দুনিয়ার চেহারা বদলে-দেওয়া, জাতির ভাগ্যের চাকা-ঘুরিয়ে দেওয়া এই বিশাল ঘটনাগুলোর শুরুটা হয়েছিল এক ব্যক্তির ছোট্ট একটি কাজ থেকে! অথচ সে ব্যক্তির হয়তো ধারণাই ছিল না তার সামান্য কাজটির পরিণতি একসময় কোথায় গিয়ে ঠেকবে! এই উদাহরণ গুলোর খুঁটিনাটি বিষয়গুলো এখানে তেমন জরুরি নয়। বরং এখান থেকে শেখার বিষয় হলো জ্যামিতিক সংবৃদ্ধির বিষয়টি। এটা আপনি প্রত্যাহিক জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন। পল রিভিয়ার ছোট্ট একটি কাজ আমেরিকান বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল। মুহাম্মদ বুয়াজিজির অভিমানি আত্মাহুতি আরব বসন্তের উত্থান ঘটিয়েছিল। শুধুমাত্র একজন পুরুষ ও নারীর সম্মিলন থেকে পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষের আগমন ঘটেছে। তেমনি করে দু'দিন আগে অচেনা সেই পথচারীর সাথে আপনার আলাপচারিতা বা আপনার কোনো বক্তৃতা, বন্ধুকে দেওয়া উপহারের বই, আপনার কোনো সাদাকাহ, অথবা আপনার কোনো কথা বা কাজের পরিণতি পরবর্তীতে অন্যদের জীবনে এমন সুদূরপ্রসারী প্রভাব রাখতে পারে যা আপনি সে সময় কল্পনাও করতে পারেননি। সূরা ইবরাহীমের ২৪ এবং ২৫ নম্বর আয়াতে আল্লাহ তা'আলা কী উপমা টেনেছেন তা লক্ষ্য করে দেখুন:

> "...পবিত্র বাক্য হলো পবিত্র বৃক্ষের মতো। তার শিকড় মজবুত এবং শাখা আকাশে উত্থিত। সে পালনকর্তার নির্দেশে অহরহ ফল দান করে..."

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সীরাহ থেকে একটি ঘটনার অবতারণা করে আমি আমার লেখা শেষ করছি। মদীনায় হিজরতের পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে ইসলামের বীজ বপন করার উদ্দেশ্যে মুস'আব ইবন উমাইরকে رضي الله عنه পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেন। মুস'আব رضي الله عنه সেখানে পৌঁছলেন এবং আসাদ বিন যুরায়রাহ নামের স্থানীয় খাযরাজ গোত্রীয় এক ব্যক্তির আতিথেয়তা গ্রহণ করলেন। তাদের দু'জনের প্রচেষ্টায় মদীনার বেশ কিছু লোক ইসলাম গ্রহণ করলো। একদিন এই দলটি জাফর গোত্রের কুয়ার পাশে বসে ছিল। তখন তারা মদীনার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলো। এই ব্যক্তি ছিলেন উসাইদ ইবন হুদাইর।

মুস'আব ﷺ তাঁকে তাঁদের মজলিসে বসে কথা শোনার আমন্ত্রণ জানান। আলোচনার এক পর্যায়ে উসাইদ ইসলাম গ্রহণ করলেন। উসাইদ এবার আরেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সাথে করে হাজির হলেন। তাঁর নাম সাদ ইবন মুয়ায। তিনিও ইসলাম গ্রহণ করলেন। বছরখানেক পর বনী কুরায়যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যেয়ে তিনি শহীদ হন। সাদ ইবন মু'আয ﷺ ছিলেন এমন একজন মুসলিম যার ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেন যে, সাদের মৃত্যুতে আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল। সাদ ইবন মুয়ায এরপরে নিয়ে আসলেন সাদ ইবন উবাদাহ কে। তিনিও তখনই ইসলাম গ্রহণ করেন।

ফলে মদীনার লোকেরা একে অপরকে বলতে থাকলো: "যদি উসাইদ ইবন হুদাইর, সাদ ইবন মুয়ায আর সাদ ইবন উবাদাহ উনারা সকলে মুসলিম হয়ে যান, তবে তো আমাদেরও তাই করা উচিত!" আর-রাহীকুল মাখতুম বইটিতে এভাবেই বলা হয়েছে:

"মুস'আব মদীনায় তাঁর দাওয়াহর কাজ অব্যাহত রাখলেন এবং সাফল্যের সাথে নিজের মিশন চালিয়ে যেতে থাকলেন। ফলে এক সময় এমন হলো যখন মদীনার আনসারদের প্রতিটি ঘরই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারীতে ভরে উঠল।"

মুস'আবের মিশন দ্বারা মদীনায় এভাবেই জন্ম হলো প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের। হিজরতের ভূমি, ইসলামের ভিত্তি যে মদীনা শহর, যেখান থেকে পুরো বিশ্বের কাছে ইসলামকে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, তা তৈরি হয়েছিল কেবল একজন লোকের প্রচেষ্টা থেকে - মুস'আব ইবন উমাইর ﷺ।

এটা জানা সত্যিই দুঃসাধ্য যে, আপনার সামর্থ্য ও প্রচেষ্টাগুলো কখন ঢেলে দিলে বা কার সাথে করলে তা কাজে লেগে যাবে। আপনি কখনোই জানবেন না আপনার ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কাজের পরিণতিও কতো বিশাল হয়ে যেতে পারে! সবসময় মনে রাখবেন এবং ইতিহাস থেকেও আমরা এই শিক্ষাটিই পাই যে, শুধুমাত্র একজন মানুষের পক্ষেও পৃথিবীকে বদলে দেওয়া সম্ভব...

তারিক মেহান্না
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি
আইসোলেশন ইউনিট - সেল # ১০৮

বাবর আহমাদ

বাবর আহমাদ

বাবর আহমাদ একজন ৩৮ বছর বয়সী ব্রিটিশ মুসলিম। তিনি বিশ্বব্যাপী ‘সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ’ এর অংশ হিসাবে দীর্ঘতম সময় বিনা অভিযোগে কারাবন্দী ব্রিটিশ মুসলিম নাগরিক।

বাবর আহমাদ ১৯৭৪ সালের মে মাসে লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেন। মেধাবী বাবর ‘ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন’ থেকে প্রকৌশলী হিসেবে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। গ্রেফতারের আগ পর্যন্ত তিনি ‘ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন’ এর ‘ইম্পেরিয়াল কলেজ’ এর আইটি ডিপার্টমেন্টে কাজ করেছেন।

২০০৩ সালের ডিসেম্বরে বাবর ‘অ্যান্টি টেরোরিজম অ্যাক্ট’ এর আওতায় তাঁর লন্ডনের বাড়ি থেকে গ্রেফতার হন। তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রচন্ড নির্যাতন চালানো হয়। পুলিশ স্টেশনে পৌঁছানোর আগেই তাঁর কানে এবং প্রস্রাবের সাথে রক্তক্ষরণসহ ৭৩ টি ফরেনসিক্যালি রেকর্ডেড আঘাত করা হয়। একই সাথে তাঁকে মানসিকভাবে লাঞ্ছিত করা হয় এবং তাঁর ধর্ম নিয়ে হাসিঠাট্টা করা হয়। ছয় দিন পর তাঁকে কোনো অভিযোগ ছাড়াই মুক্তি দেওয়া হয়।

মুক্তির পরপরই তিনি পুলিশ কর্মকর্তাদের পাশবিকতাকে দায়ী করে একটি অভিযোগ ফাইল জমা দেন। পুলিশ কর্মকর্তারা তা অস্বীকার করে। শেষ পর্যন্ত ২০০৯ সালের মার্চে মেট্রোপলিটন পুলিশ ২০০৩ সালে গ্রেফতারকালে বাবরের উপর নৃশংস শারীরিক হামলা এবং ধর্মীয়ভাবে লাঞ্ছিত করার বিষয়টি লন্ডনের ‘লয়্যাল কোর্ট অফ জাস্টিস’ এর কাছে স্বীকার করে।

২০০৪ সালের ৫ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র সরকারের অনুরোধে বিতর্কিত ‘এক্সট্রাডিশান আইন ২০০৩’ এর অধীনে লন্ডন থেকে তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়।‘এক্সট্রাডিশান আইন ২০০৩’ এমন একটি আইন যেখানে যুক্তরাষ্ট্র বিনা প্রমাণেই ব্রিটেনের যেকোনো নাগরিককে এই আইনের অধীনে হস্তান্তরের দাবি করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র দাবি করে, ১৯৯০ এর দশকে বাবর আহমাদ সন্ত্রাসীদের সমর্থক ছিলেন।

আহমাদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের সাহায্য করা, তালিবানদের সমর্থন দেওয়া, আমেরিকানদের খুন করার ষড়যন্ত্র ও অর্থপাচারের অভিযোগ আনা হয়।মার্কিন আদালতে দায়েরকৃত একটি হলফনামায় বর্ণনা করা হয় যে, বাবর আহমাদ 'আযযাম ডটকম' নামে একটি ওয়েবসাইট পরিচালনার সাথে যুক্ত যেটা চেচনিয়ান ও তালিবান মুজাহিদদের সমর্থন দিয়েছে।

মার্কিন সরকার আরো দাবি করে যে, আহমাদের কাছে কিছু গোপন সামরিক দলিল ছিল যাতে আমেরিকান নৌবাহিনীর একটি গ্রুপের চলাচল ও পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা ছিল।

২০০৪ সালের জুলাই এ যুক্তরাজ্যের 'ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস' এবং ২০০৬ সালের সেপ্টেম্বরে যুক্তরাজ্যের এটর্নি জেনারেল লর্ড গোল্ডস্মিথ ঘোষণা দেয় যে, বাবর আহমাদকে যুক্তরাজ্যের আইনের অধীনে কোনো অপরাধের সাথে অভিযুক্ত করার মতো পর্যাপ্ত প্রমাণ নেই।

তারপরও তারা আহমাদকে মুক্তি দেয়নি। ২০১২ সালের অক্টোবরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তরের আগ পর্যন্ত তাঁকে কারাগারেই অন্তরীণ রাখা হয়। তাঁরা আহমাদের ফাইলটিকে জটিল এবং সমস্যাসম্বলিত হিসেবে আখ্যা দেয়।

২০০৫ সালের ১৬ই নভেম্বর ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি চার্লস ক্লার্ক তাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হস্তান্তরের অনুমোদন দেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুক্তরাজ্যের এক্সট্রাডিশন চুক্তির বিষয়টি নিয়ে বিশেষ করে বাবর আহমাদের ইস্যুতে 'হাউস অফ কমন' এবং 'হাউস অফ পার্লামেন্টে' অনেক আলোচনা-সমালোচনা চলতে থাকে। ব্রিটেনের হাজার হাজার লোক বাবর আহমাদের পক্ষে দাঁড়ায়। হাজার হাজার লোক বাবরের পক্ষে পিটিশানে স্বাক্ষর করে যেন বাবরকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে তুলে না দিয়ে লন্ডনেই তাঁর বিচার করা হয়।

বাবর আহমাদও আপিল করেছিলেন, কিন্তু তিনি হেরে যান।

মানবাধিকার বিষয়ক ইউরোপিয়ান কোর্ট (The European Court of Human Rights) তাঁর হস্তান্তর বিষয়ে অনুমতিসূচক রায় দেওয়ার পর অবশেষে অক্টোবর ৫, ২০১২তে বাবরকে অ্যামেরিকার হাতে তুলে দেওয়া হয়। এমনকি ব্রিটিশ হাইকোর্টও এই রায়ের বিরুদ্ধে জুডিশিয়াল রিভিউর ব্যাপারে বাবার আহমাদের

অনুরোধকে প্রত্যাখ্যান করে। বর্তমানে তিনি কানেকটিকাটে অ্যামেরিকার জিম্মি হয়ে আছেন।

অক্টোবর ৬, ২০১২ তে বাবর আহমাদ কানেকটিকাটের একটি আদালতে আফগানিস্তান এবং চেচনিয়ায় 'সন্ত্রাসী'দের সহায়তার অভিযোগে নিজেকে নির্দোষ হিসাবে দাবি করেন। ডিসেম্বর ৬, ২০১৩তে দি গার্ডিয়ান রিপোর্ট করে যে, বাবর আহমাদ 'সন্ত্রাসী'দের বৈষয়িক সহায়তার অভিযোগে নিজেকে দোষী স্বীকার করে আপিল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

ব্যথার কথা

সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ ﷻ বলেন,

> "তারা তাদের মুখ দিয়ে সেসব কথা বলে যা তাদের হৃদয়ে নেই।" [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৬৭]

আমাদের পুণ্যবান সালাফগণ বলতেন,

> *"মুখের কথা কান পর্যন্তই পৌঁছে, কিন্তু অন্তরের কথা, অন্তরে গিয়ে কড়া নাড়ে।"*

আজকাল অনলবর্ষী ভাষণ ও ভাষার অলংকারে অলংকৃত বক্তৃতার অভাব নেই, অথচ সেগুলো শ্রোতার মনে বিন্দুমাত্র দাগ কাটতে পারে না। কতই না বই ও প্রবন্ধ লেখা, যেগুলো কুরআনের আয়াত, উক্তি আর সাক্ষ্যপ্রমাণে ভরপুর। কিন্তু তবুও সেগুলো ব্যর্থ হয় পাঠকদের একটু নাড়া দিতে! কত কবিতার স্তবক লিখা হয় তবুও সেগুলো লোকেদের অন্তরে কোনো প্রভাব রাখতে ব্যর্থ হয়। যেন সেগুলো শক্ত বরফচাঁইয়ের উপর পতিত হয়ে টপটপ করে গড়িয়ে পড়া ঠান্ডা পানির ফোঁটা। কত সালাহ আদায় করা হয় কুরআনের শ্রুতিমধুর সুললিত তিলাওয়াতে, তবু সেটা মানুষের জমে যাওয়া অন্তরকে ঈমানের দীপশিখায় এতটুকু গলাতে পারে না, পারে না চোখের কোণে এতটুকু অশ্রু এনে দিতে। অথচ 'উমার বিন খাত্তাব رضي الله عنه যখন সালাতে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তিনি ও তার মুসল্লীরা এত বেশি করে কাঁদতেন যে, পেছনের কাতার থেকে ফোঁপানোর আওয়াজ শোনা যেত! কেন? তার কাছে যে কুরআন ছিল তা কি আমাদের কুরআন থেকে আলাদা কিছু?

নবী-তনয়া ফাতিমা আয-যাহরা رضي الله عنها যতবার আল্লাহর কথা বলতেন ততবার কেন তার নারী শ্রোতাদের চোখে পানি চলে আসত? তিনি যে আল্লাহর কথা বলতেন, সেই আল্লাহর কথা তো আমরাও বলি, তবু আমাদের কেন এমন হয় না?

কেন ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারাকের লেখা কবিতার আলোচিত সেই পঙক্তি - হে দুই হারামের প্রার্থনাকারীরা - শুনে 'আলিম ফুদাইল বিন ইয়াদের হৃদয়

এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে চোখ ভিজে যেত? অথচ এমন হাজারো পংক্তি আজ শুধু বইয়ের পাতায় নিষ্প্রাণ চেয়ে থাকে।

আর কেনই বা ইবন তাইমিয়্যাহ ﷬, ইবন আল ক্বাইয়িম ﷬, ইবন আন-নুহাস ﷬, সায়্যিদ কুতুব ﷬, আব্দুল্লাহ আযযাম ﷬ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের বই বিশ্বের কোটি মানুষকে উজ্জীবিত ও প্রেরণা দান করতে থাকে, অথচ তাদের থেকেও জ্ঞানী লেখকদের লেখা এমন প্রচুর বই আছে যেগুলো বইয়ের দোকানের তাকেই পড়ে থাকে, কদাচিৎ মানুষ সেগুলো পড়ে?

এর কারণ হলো, এই মানুষগুলো যখন কিছু বলেন, লেখেন বা আবৃত্তি করেন, তাদের হৃদয়ের বেদনা, ত্যাগ আর কষ্টের কথা সেই লেখনী, কথন আর আবৃত্তিতে ভেসে ওঠে। যে ব্যক্তি তার হৃদয়ে, তার শিরায়, তার রক্তে ব্যথা অনুভব করেন, তিনিই পারেন তার কথার দ্বারা তার আবেগকে শ্রোতার হৃদয়ে ঢেলে দিতে। যে লেখক, যে গল্পকার তার জীবনে কোনো পরীক্ষা বা কষ্টের সম্মুখীন হননি, তিনি কেবল কথার পর কথাই বলে যান। না থাকে সেই কথার কোনো মূল্য, না থাকে সেই কথায় কোনো প্রাণ। কেননা, তাদের এই কথার জন্ম তো হয়েছে আরাম-আয়েশের মাঝে বেড়ে ওঠা নিষ্প্রাণ এক হৃদয়ে। তাদের কথাগুলো তাদের মুখের কথা, কলমের কথা, জিহবার কথা। কিন্তু মনের কথা নয়, আবেগের কথা নয়। যদি তারা প্রাঞ্জলতম আর অলংকারপূর্ণ সব শব্দ দিয়েও তাদের কথা সাজায়, তবুও, বাস্তবতা হলো তাদের শরীর ও মন সে কথাগুলোর উপর ‘আমল করেনি। তাদের কথাগুলো বরফের টুকরোর মতো। শীতল ও কঠিন এই শব্দগুলো কোমলতম হৃদয়েও বিন্দুমাত্র আলোড়ন সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়।

আর অন্যদিকে আছে একদল সত্যিকারের মু’মিন, যেমন সাহাবাগণ ﵃ এবং সেসব ব্যক্তি যারা ন্যায়ের পথে সাহাবিদের ﵃ অনুসরণ করেছেন, করছেন এবং ক্বিয়ামত দিবস পর্যন্ত যারা সাহাবিদের ﵃ অনুসরণ করে যাবেন। তারা ও তাদের আপন লোকেরা অনুভব করেছেন ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও দারিদ্র্যের কষ্ট, তারা হয়েছেন প্রত্যাখাত, গৃহ ও দেশ থেকে হয়েছেন নির্বাসিত। তারা প্রিয়জন থেকে দূরে থাকার বিরহ ভোগ করেছেন, বঞ্চিত হয়েছেন পার্থিব সব ভোগ্যবস্তু থেকে, বরণ করে নিয়েছেন বন্দীত্ব, নির্যাতন, শারীরিক ও মানসিক কষ্ট এবং মৃত্যুর জ্বালা। এজন্যই তারা জান্নাতের পথে জ্বলন্ত মশাল।

> “এরা হচ্ছেন তারা যাদের আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছেন। অতএব, তাদের উদাহরণ হতে শিক্ষা নাও” [সূরা আল আন’আম, ৬: ৯০]

এই চরম কষ্ট, অনুভূতি আর আবেগের তীব্রতা আমরা উপলব্ধি করতে পারি সাইদ কুতুবের ﵀ কথায়, যিনি তার কথার উপর 'আমল করে জীবন দিয়েছেন। তার সেই বিখ্যাত উক্তি:

> *"নিশ্চয়ই আমাদের কথাগুলো থেকে যাবে প্রাণহীন, নিস্ফলা আর ভাবাবেগহীন, যতদিন না আমরা সেই কথাগুলোর উপর 'আমল করে মৃত্যুবরণ করি, আর তখনই আমাদের কথাগুলো জীবন্ত হবে! আর মৃত অন্তরে প্রাণের সঞ্চার করবে, তাদেরকে করে তুলবে সজীব ও প্রাণবন্ত..."*

বাসনা ও বিপর্যয়

তিরমিযীতে আবু হুরায়রাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

> “আল্লাহ যখন জান্নাত সৃষ্টি করলেন তখন তিনি জিবরীলকে সেখানে পাঠিয়ে বললেন, “দেখে এসো জান্নাত এবং জান্নাতের আরাম-আয়েশ যা আমি তাঁর অধিবাসীদের জন্য তৈরি করেছি”। জিবরীল গিয়ে তা দেখে এলেন এবং আল্লাহ কে বললেন, “আপনার বড়ত্বের শপথ, যে-ই শুনবে সে-ই এতে প্রবেশ করবে (অর্থাৎ এতে প্রবেশ করতে যা করা দরকার তাঁর সবই করবে)। তারপর আল্লাহ জান্নাতকে আদেশ দিলেন দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-আপদ ও অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে যেতে। তিনি জিবরীলকে বললেন, “ফিরে যাও এবং দেখে আসো সেই জান্নাত ও তার অধিবাসীদের জন্য আমি কী প্রস্তুত করে রেখেছি”। জিবরীল জান্নাতে ফিরে গিয়ে একে বিপদ আপদ ও অপছন্দনীয় জিনিস দিয়ে ঘেরা অবস্থায় পেলেন। তিনি ফিরে এসে আল্লাহকে বললেন, “আপনার বড়ত্বের শপথ, আমি ভয় করি যে কেউই এতে প্রবেশ করবে না। (অর্থাৎ সে এটি এড়ানোর জন্য যা করা দরকার তা-ই করবে)”।
>
> অতঃপর আল্লাহ জিবরীল কে বললেন, “জাহান্নামে যাও এবং দেখে এসো এর শাস্তিসমূহ যা আমি এর অধিবাসীদের জন্য তৈরি করেছি”। জিবরীল জাহান্নামের দিকে দেখলেন এবং তার কাছে তা অত্যন্ত ভয়ংকর লাগলো, তাই তিনি আল্লাহ্কে বললেন, “আপনার বড়ত্বের শপথ, যে-ই এর কথা শুনবে সে-ই এটি থেকে বাঁচতে চাইবে”। তারপর আল্লাহ জাহান্নামকে আদেশ দিলেন কামনা ও বিলাসিতা দিয়ে পরিবেষ্টিত হয়ে যেতে এবং জিবরীলকে বললেন, “ওখানে ফিরে যাও”। জিবরীল সেখানে গেলেন ও বললেন, “আপনার বড়ত্বের শপথ, কেউই এ থেকে বাঁচতে পারবে না”।

আপনার জীবন কী জান্নাত অভিমুখী নাকি জাহান্নাম – এই প্রশ্নের জবাব পেতে আপনার জীবনের দিকে লক্ষ করুন। যদি আপনি আল্লাহর ইবাদাত করেন আর

আপনার জীবন কষ্ট আর অপছন্দনীয় জিনিস দ্বারা পূর্ণ থাকে, তবে সেটি আপনার জন্য ভালো লক্ষণ। মানুষ কী অপছন্দ করে? সে অপছন্দ করে ভয়, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, তৃষ্ণা, নিরাপত্তার অভাব, আশ্রয়ের অভাব, বন্দীত্ব, বঞ্চনা, আপনজনের বিচ্ছেদ, একাকীত্ব, অনিশ্চয়তা এবং এরকম আরো অনেক কিছু, যা দিয়ে জান্নাত ঘেরা। জীবনে এসবের উপস্থিতি নির্দেশ করে যে একজন মু'মিন জান্নাতের পথে আছে কিনা।

এবার ভাবুন কোন জিনিসগুলো একজন ব্যক্তি তার জীবনে পেতে চায় বা ভালোবাসে? সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, সুপ্রশস্ত বাড়ি, নিরাপত্তা, প্রচুর খাদ্য ও পানীয়, দামী কাপড়, প্রিয়জনের সান্নিধ্য – এরকম আরো অনেক কিছু। জাহান্নাম কিন্তু এসব দিয়েই ঘেরা। মু'মিনের জীবনে এসবের উপস্থিতি জানান দেয়, সে ধ্বংসের পথে অভিমুখী কিনা।

এজন্য অনেক ধনী সাহাবি ﷺ সূরা আহকাফের এই আয়াতগুলো পড়ার সময় অঝোরে কাঁদতেন (সূরা আল 'আহকাফ, ৪৬: ২০)

> "এবং সেই দিন কাফিরদের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে, বলা হবে, 'তোমরা পার্থিব জীবনে আনন্দ ফুর্তি করেছো, এবং তা উপভোগ করেছো, অতএব এই দিনে তোমাদের চরম লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে ভূষিত করা হবে কারণ তোমরা পৃথিবীর বুকে অনধিকারমূলকভাবে অহংকারী ছিলে এবং নিশ্চয় তোমরা অবাধ্য।"

উমার বিন আল খাত্তাব, আব্দুর রাহমান বিন আউফ এবং অন্যেরা ﷺ এই আয়াতটি প্রায়ই উল্লেখ করতেন, এমনকি খুব সামান্য খাওয়া দেখে আনন্দিত হলে তখনও।

কামনার অনুসরণ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। এজন্য সালাফরা বলতেন, "যদি আল্লাহর আনুগত্য করতে চাও তাহলে তোমার নাফসকে (প্রবৃত্তি, কামনা) অমান্য কর"। যেমনটা ইমাম আশ শাফি'র একটি কবিতায় আছে (আব্দুল্লাহ্ বিন মুবারক ও এটি উদ্ধৃত করেছেন বলে জানা যায়), "নাফসের জন্য সবচেয়ে উপকারী হচ্ছে তাকে অমান্য করা"।

অতএব, যদি আল্লাহকে মান্য করতে চান, তাহলে আপনার মনের সাথে কথা বলুন এবং আপনার প্রবৃত্তি যা করতে আদেশ দেয় তার উল্টো কাজটি করুন।

যদি আপনার প্রবৃত্তি আদেশ দেয় সালাত না পড়ে ঘুমাতে, উঠে পড়ে সালাত আদায় করুন। যদি আপনার প্রবৃত্তি কৃপণতার আদেশ দেয়, তাহলে আপনার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটি খরচ করুন। আল্লাহ ﷿ সূরা আলে-ইমরানে বলেন (৩:৯২), "তুমি কখনোই সত্যিকারের তাক্বওয়া অর্জন করতে পারবে না, যতক্ষণ না যা তুমি ভালোবাসো তা থেকে খরচ করছো"। যদি আপনার প্রবৃত্তি ঘরে সালাত পড়তে আদেশ দেয়, তবে মাসজিদে চলে যান। যদি আপনার প্রবৃত্তি আদেশ দেয় অসুস্থ মুসলিম ভাইকে দেখতে না গিয়ে ঘরে বসে আরাম করতে তো উঠে চলে যান এবং তাকে দেখে আসুন, কারণ আল্লাহকে আপনি তার সাথে পাবেন।

অতএব, নিজের জীবনকে নিয়ে ভাবুন এবং নিজেই নিজের বিচারক হোন। আল্লাহ যদি আপনার উপর বিলাসিতার উপর বিলাসিতা, সম্পদের উপর সম্পদ, আরামের উপর আরাম ঢেলে দেন, তার মানে কোনো একটা সমস্যা আছে আর এমন হওয়া আপনার জন্য দুশ্চিন্তার বিষয়। উপরন্তু, এমন প্রাচুর্যের ছড়াছড়ি যদি আপনি আল্লাহর প্রতি অবাধ্য ও তাঁর আদেশ সমূহের প্রতি উদাসীন থাকা অবস্থায় ঘটে, তবে এটি আপনার আসন্ন ধ্বংসের আলামত। বিলাসিতা ও আরাম-আয়েশ মানুষকে আল্লাহর ব্যাপারে বিস্মৃত করে এবং স্বীয় দায়িত্বের ব্যাপারে গাফেল করে।

অপরদিকে, আপনি সাধ্যমত আল্লাহর উপাসনা ও তাঁর আদেশসমূহের প্রতি মনোযোগী হওয়া সত্ত্বেও যদি আপনার জীবন বিপদ-আপদ ও অপছন্দের জিনিসে ভরে যায়, তবে খুশী হোন। কারণ এটি একটি শুভ লক্ষণ যে, আপনি জান্নাতের পথে আছেন। বিপদ-আপদ মু'মিনকে আল্লাহর কথা স্মরণ করায় এবং আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর দিকে মুখ ফেরাতে সাহায্য করে। একটি বহুল প্রচলিত কথা হলো: "কষ্ট জীবনের কাছে যতটা অপছন্দের, আত্মার জন্য ততটাই উপকারের আর আরাম জীবনের কাছে যতটা পছন্দের, আত্মার জন্য তা ততই ক্ষতির কারণ।"

কাজেই, হে আল্লাহর পথের বন্দী, দুঃখ করবেন না যখন আপনাকে নিম্ন মানের খাদ্য ও ছেঁড়া কাপড় পরতে দেওয়া হয়, পরিবার আর প্রিয়জন থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হয়। দুঃখ করবেন না যদি দেখেন অন্যরা সম্পদ ও সন্তানে আপনাকে ছাড়িয়ে যায়, বরং খুশি হোন! কারণ, আপনি তো সেই জান্নাতের পথেই আছেন যা এতটা দুঃখ-কষ্ট দিয়ে আবৃত যে, ফেরেশতা জিবরীল পর্যন্ত আশংকা করেছিলেন যে কেউই এতে প্রবেশ করতে সমর্থ হবে না।

১৩ শতকের বিখ্যাত ‘আলিম আল–‘ইযয্ বিন আব্দুস সালাম বলেন, “দুঃখ-কষ্ট ও দুর্ভোগ মানুষকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর দিকে ধাবিত করে, যেখানে সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি তাকে আল্লাহর কাছ থেকে দূরে ঠেলে দেয়, যেমনটা আল্লাহ ﷻ আল-কুরআনে বলেন,

> “এবং যখন বিপদ মানুষকে স্পর্শ করে, সে আমাদের ডাকে, শায়িত বা উপবিষ্ট বা দন্ডায়মান অবস্থায়। কিন্তু যখন আমরা তার উপর হতে বিপদ সরিয়ে দেই, সে এমনভাবে চলাফেরা করে যেন সে কোনোদিন বিপদে পড়ে আমাকে ডাকেনি।” [সূরা ইউনুস, ১০: ১২]

হাসান আল বাসরি رحمه الله বলেন,

> *“তোমার উপর বিপদ আপতিত হলে সেটি ঘৃণা কোরো না, কেননা তুমি যা অপছন্দ করছ, সেটি হয়তো তোমার নাজাতের কারণ এবং যা তুমি পছন্দ করছ তা হয়তো তোমার ধ্বংসের কারণ।”*

সবশেষে বর্ণিত আছে যে, আলী বিন আবি তালিব رضي الله عنه বলেছেন,

> *“হে আদম সন্তান! ধনী হওয়ার ব্যাপারে খুশী হয়ো না এবং দারিদ্র্যের ব্যাপারে দুঃখী হয়ো না। দুর্দশার সময়ে দুঃখ করোনা এবং সমৃদ্ধির ব্যাপারে আনন্দ কোরো না। কারণ স্বর্ণ যেভাবে আগুনে পরীক্ষিত হয়, মুত্তাক্বীরা তেমনি পরীক্ষিত হন দুঃখ-কষ্ট দ্বারা। কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে না যদি না তুমি পছন্দের জিনিসকে ত্যাগ করার ক্ষমতা রাখো। ধৈর্যের সাথে ঘৃণিত জিনিসকে সহ্য করার ক্ষমতা রাখো এবং যা তোমার উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে তা পালনের সর্বাত্মক চেষ্টা কর।”*

কষ্ট ও পুরস্কার

> “আর (স্মরণ কর) আইয়ুবের ﷺ কথা, যখন সে তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেন: আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।” [সূরা আম্বিয়া, ২১: ৮৩]

কুরআনে বর্ণিত সকল নবীর মাঝে এমন একজন নবী আছেন যার দাওয়াতী কার্যক্রম ও অনুসারীদের ব্যাপারে কুরআনে কোনো উল্লেখ নেই। সেই নবী হলেন হযরত আইয়ুব ﷺ, ইংরেজিতে তিনি ‘জব (Job)’ নামে পরিচিত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসতে পারে যে, আল্লাহর বাণী প্রচার করাই যদি নবীদের কাজ হয় তাহলে একজন নবীর দাওয়াতী কাজের কথা উল্লেখ না করার পেছনে যুক্তি কী? এর জবাব হচ্ছে কুরআনে যেকোনো কিছুই বর্ণিত হওয়ার পিছনে একটি কারণ আছে, কোনো কিছুই অনাবশ্যক নয়। আইয়ুব ﷺ এর বিশেষত্ব হলো তার সবর, ধৈর্য ও দৃঢ়তা, যার থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার বিষয় আছে। প্রশ্ন হচ্ছে কী সেই কাহিনী?

আল্লাহ আইয়ুব ﷺ কে দু হাত ভরে স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সন্তান দিয়েছিলেন, এবং এগুলো ফিরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে তিনি তাঁকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তাঁর সন্তানেরা প্রাণ হারালো, তাঁর গবাদিপশু মরে গেল, খামার ধ্বংস হয়ে গেল এবং তিনি সব রকম রোগে আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে একটি অসুখ ছিল এমন যে, পোকামাকড় তার শরীরের ক্ষতস্থান ভক্ষণ করতে লাগলো। বছরের পর বছর এভাবেই পেরিয়ে গেল। তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এবং সমাজের লোকেরা একে একে তাঁকে বর্জন করল। রোগ সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে তারা তাঁকে দেখতে যাওয়া বন্ধ করে দিল। স্বামীর ছোঁয়াচে রোগ স্ত্রীকেও আক্রান্ত করতে পারে এই আশঙ্কায় তাঁর স্ত্রীকেও (যিনি নিজের ও স্বামীর জন্য অর্থ উপার্জনে বাইরে যেতেন) এই ভয়ে সামাজিকভাবে বয়কট করা হলো। এত কিছুর পরেও আইয়ুব ﷺ ছিলেন ধৈর্যশীল এবং কৃতজ্ঞ।

একদিন তাঁর স্ত্রী এই দুঃখ-কষ্টের ভার সহ্য করতে না পেরে কেঁদে উঠে বললেন, “আর কতদিন এই দুর্দশা চলবে? কখন এই দুঃসময় শেষ হবে? কেন আপনি আপনার রবকে বলছেন না এই কষ্ট থেকে আমাদের মুক্তি দিতে?” আইয়ুব ﷺ এটি শুনে রাগান্বিত হয়ে স্ত্রীকে বললেন, “এই কষ্টের আগে কত দিন যাবত আমরা আল্লাহর অনুগ্রহ উপভোগ করেছি?”

তাঁর স্ত্রী জবাবে বললেন, “৭০ বছর।”

আইয়ুব ﷺ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “আর কত বছর ধরে আল্লাহ্ আমাদের এভাবে পরীক্ষা করেছেন?”

তাঁর স্ত্রী উত্তর দিলেন, “৭ বছর।” (অন্য বর্ণনাতে আছে তিন বা আঠারো বছর, যাই হোক না কেন মূল বিষয় হচ্ছে এর মেয়াদ ছিল ৭০ এর অনেক কম)

আইয়ুব ﷺ প্রত্যুত্তরে বললেন, “৭০ বছর ধরে আল্লাহর নি’আমত ভোগ করেছি, আর মাত্র ৭ বছর হলো তিনি আমাদের পরীক্ষা নিচ্ছেন, এ ব্যাপারে আল্লাহকে নালিশ করতে আমার লজ্জা হচ্ছে। নিশ্চয়ই তোমার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়েছে। যাও অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও।”

অতঃপর বহুদিন পর আইয়ুব ﷺ তাঁর সেই বিখ্যাত দু’আটি করেন, তবে সেটাও ছিল পরোক্ষভাবে এবং বিনয়ের সাথে, তাতে অনুযোগের কোন সুর ছিল না। যা কুরআনের ২১ নং সূরার ৮৩ নং আয়াতে আছে

> “আর (স্মরণ কর) আইয়ুবের কথা, যখন সে তাঁর প্রতিপালককে আহ্বান করে বলেছিলেন: আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।”

আল্লাহ তাঁর দু’আর জবাব দেন এবং তাঁর স্বাস্থ্য, সম্পদ ও সন্তান ফিরিয়ে দেন। উপরন্তু, তাঁর ধৈর্যের জন্য তাঁর জন্য নি’আমত আরও বাড়িয়ে দেন।

হে আল্লাহর পথের বন্দী, কতদিন ধরে আপনি কারাগারে? এক বছর? পাঁচ বছর? দশ বছর? বিশ বছর? আর আল্লাহর অনুগ্রহ ভোগ করেছেন আপনি কত বছর ধরে?

কত বছর আপনি স্বাধীনভাবে রাস্তায় হেঁটেছেন? কতগুলো বছর আপনি পরিবার-পরিজন আর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ উপভোগ করেছেন? কত বছর ধরে সুস্বাদু সব খাবার খেয়েছেন, সবচেয়ে উত্তম পানীয় পান করেছেন, সুন্দর সব পোশাক পরেছেন? আপনি দেখবেন আপনি যতদিন কারাগারে আছেন তার থেকে বেশি সময় ধরে আপনি আল্লাহর নি’আমতরাজি ভোগ করেছেন। এরপরেও কোন সাহসে আপনি অন্যদের কাছে আল্লাহর জন্য কারাভোগ নিয়ে অনুতাপ আর

অভিযোগ করছেন? আপনি কি মানুষের কাছে নিজের অবস্থা সম্পর্কে মাতম করে লজ্জিত হন না? আপনি কি সেসব সময়ের কথা ভুলে গেছেন যা আল্লাহর অনুগ্রহের মধ্যে কাটিয়েছেন?

> “মানুষ অবশ্যই অতি মাত্রায় যালিম, অকৃতজ্ঞ।” [সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৩৪]

মহা আরশের অধিপতির শপথ, আপনি যদি আল্লাহর রাহে ১০০০ বছরও একাকী কক্ষে বন্দীদশায় কাটিয়ে দেন, তা আপনার বুড়ো আঙ্গুলের কৃতজ্ঞতা আদায়ের জন্য যথেষ্ট হবে না, যা দিয়ে আপনি খান, পড়েন, লেখেন, কুড়ান, আঁকড়ে ধরেন, জিনিসপত্র সামলান। রাসূল ﷺ কি বলেননি, **“যদি একজন মানুষের মুখকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মাটিতে ফেলে ছ্যাঁচড়ানো হয় তবুও পুনরুত্থান দিবসে সে আফসোস করবে এই ভেবে যে সে যথেষ্ট ভালো কাজ করেনি”**।

আপনার ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকুন। যখন আপনি আপনার বন্দীত্বের প্রতিটি দিনকে অনুগ্রহ ও দয়া না ভেবে নির্যাতন ও শাস্তি হিসেবে মনে করবেন, তখন প্রতিটি মুহূর্ত আপনি ব্যথা অনুভব করবেন। আইয়ুব ﵇ যদি তাঁর অবস্থার ব্যাপারে তাঁর রব্বের কাছে অনুযোগ করতে লজ্জিত বোধ করেন, তবে আপনার কী কারণ থাকতে পারে মানুষের কাছে পরিবার পরিজনের ব্যাপারে অভিযোগ করতে? সেসব সুস্বাদু খাবারের কথা ভাবুন যা আপনি খেয়েছেন, সেসব অসাধারণ স্থানের কথা ভাবুন যেখানে আপনি ভ্রমণ করেছেন। আল্লাহর অনুগ্রহের ব্যাপারে কৃতজ্ঞ হতে শিখুন, তিনি আপনাকে আরো দেবেন।

> “যখন তোমাদের প্রতিপালক ঘোষণা করেন: তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দিব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।” [সূরা ইবরাহীম, ১৪: ৭]

আপনি যদি সাম্যের ভিত্তিতে সবকিছু হিসেব করেন তবে অন্তত আপনার কারাগারের বাইরে যতদিন কেটেছে ঠিক ততদিন কারাবাসের আগ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে এ অবস্থা থেকে মুক্তি চাওয়ার কথা না! তাই আপনি যদি কারাগারের বাইরে ৩০ বছর কাটান, তাহলে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করার আগে অন্তত ৩০ বছর কারাবাস করা উচিত! কিন্তু না, আল্লাহ তার চেয়ে দয়ালু। আপনার যদি সহ্য করতে না পারেন, তবে তাঁর কাছে, একমাত্র তাঁর কাছেই অভিযোগ করুন। তারপর ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, যতক্ষণ না তিনি সাড়া দেন।

মনকে প্রবোধ দিন ইয়াকুব ﷺ এর দুআর মাধ্যমে যা তিনি তার পুত্রের জন্য করেছিলেন,

> “আমি আমার বেদনা ও আমার দুঃখ শুধু আল্লাহর নিকট নিবেদন করছি...” [সূরা ইউসুফ, ১২: ৮৬]

মন জুড়ানো মুহূর্ত

আল্লাহ আযযা ওয়াজাল কুরআনে বলেন:

> “অবশ্যই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ। যারা বিনয়-নম্র নিজেদের সালাতে।” [সূরা আল মু’মিনুন ২৩: ১-২]

এবং

> “তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের (আসর) ব্যাপারে যত্নবান হও এবং বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও।” [সূরা বাকারা, ২: ২৩৮]

রাসূল ﷺ বলেন, **“সালাত ইসলামের খুঁটি”**।

আল-মিরাজের দিনে রাসূলুল্লাহকে ﷺ আল্লাহ عزوجل পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের যে আদেশ দান করেছিলেন, তা ছিল তাঁর এবং সমগ্র উম্মাহর প্রতি আল্লাহর তরফ থেকে এক অসামান্য উপহার! সালাতকে কখনোই আমরা এভাবে দেখতে পারব না যে, সালাতের দ্বারা আমরা আল্লাহকে ‘পুরস্কৃত’ করছি বা কোনোরূপ প্রতিদান দিচ্ছি। কেননা আমাদের পক্ষে আল্লাহকে প্রতিদান দেওয়া সম্ভব নয়, না সালাতের সাহায্যে, না অন্য কোনো কাজের মাধ্যমে। বরং সালাতের বিধান দেওয়া হয়েছে যেন আমরা এর মাধ্যমে উপকৃত হতে পারি। সালাত ইসলামের একটি খুঁটি কিংবা একটি ফরয দায়িত্ব থেকেও বেশি কিছু: এটি আপনার সাথে গোটা বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তা‘আলার যোগাযোগের মাধ্যম।

সালাতকে একটি ‘হটলাইন’ এর সাথে তুলনা করা যায় যা দিয়ে আপনি যেকোনো সময় আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। এজন্য সালাফগণ বলতেন "যদি আপনি আল্লাহর সাথে কথা বলতে চান, তাহলে সালাত আদায় করুন আর যদি আপনি চান আল্লাহ আপনার সাথে কথা বলুক, তাহলে কুরআন পড়ুন”। সালাত হলো যাবতীয় সমস্যা থেকে মুক্তির পথ, অস্থিরতায় প্রশান্তি। এটি আপনাকে স্বস্তি দেবে, শান্ত করবে, আস্থা যোগাবে। সালাতের মাধ্যমে আপনি যেকোনো বিষয়ে আল্লাহর সাহায্য চাইতে পারবেন - হোক তা যুদ্ধের মতো গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় অথবা রান্না বা কাপড়ের দাগ তোলার মতো তুচ্ছ কোনো

কাজে! সালাত যেকোনো বিষয়ে আল্লাহর দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ পাওয়ার উপায়। লোকে সঙ্গ পেতে বা বিনোদনের খোঁজে অনেক সময় এমনিতেই টেলিভিশন বা রেডিও ছেড়ে রেখে দেয়, হয়তো সে শুনছেও না বা দেখছেও না। নিঃসন্দেহে সালাহ এসব "সঙ্গের" চাইতে উত্তম সঙ্গ দান করে।

সালাত আপনাকে সুযোগ করে দেয় আল্লাহর সামনে অন্তরটা মেলে ধরবার, তাঁর কাছে নিরাপদ আশ্রয়স্থল খোঁজার। লম্বা সফরের পর, বা কোনো বিপদে পড়লে, অথবা অসুস্থতায় কিংবা পথ হারিয়ে যাওয়ার পর ফিরে আসতে পেরে সন্তান যেভাবে বাবার বুকে পরম নির্ভরতায় আশ্রয় নেয়, সালাতও তেমনি আল্লাহর কাছে আশ্রয় পাওয়ার মাধ্যম। আল্লাহর দয়া ও ক্ষমতার মাঝে হৃদয়ের প্রশান্তি খুঁজে পাওয়ার মাধ্যম। সালাতের উপকারিতার শেষ নেই, তবে তা পেতে হলে আপনাকে এর জন্য দাম দিতে হবে, এবং তাতে বিনিয়োগ করতে হবে।

আপনার সালাতকে মনে করুন একটি ঘোড়ার মতো। যখন আপনার ঘোড়ার বয়স অল্প, তখন আপনি না এতে চড়তে পারেন, না পারেন অন্য কাজে ব্যবহার করতে। কিন্তু আপনি যদি একে ভালোভাবে দেখাশোনা করেন, প্রতিদিন পরিষ্কার করেন, প্রশিক্ষণ দেন, খাওয়া-দাওয়া ও যথাযথ পরিচর্যা করেন, এর ওপর খরচ করে একে বড় করতে থাকেন, তাহলে দেখতে পাবেন যে কাজটি কষ্টসাধ্য হলেও এই ঘোড়াটিই একসময় পরিণত হয়ে আপনার জন্য এক শক্তিশালী, বিশ্বস্ত ও বাধ্য ঘোড়ায় রূপান্তরিত হয়েছে। যখনই আপনার প্রয়োজন হবে, এটি আপনার খেদমতে হাজির থাকবে। সফরে, যুদ্ধে কী বিপদ থেকে পালাতে যখনই দরকার পড়বে আপনি এর পিঠে চড়তে পারবেন।

অনুরূপ আপনার সালাত। আপনার সালাত যখন দুর্বল, অল্পবয়সী ও অপরিণত, তখন সেটাকে বোঝার মতো মনে হবে। প্রথম প্রথম সালাতের জন্য এ কাজগুলো করা খুব কঠিন মনে হবে: ওযু করা, সময়মতো আদায় করা, অর্থ-না-জানা সূরাগুলো মনোযোগ দিয়ে পাঠ করা ও মুখস্থ আওড়ে যাওয়া, কিংবা ব্যস্ততা বা ক্লান্তির মাঝেও সালাত আদায় করা ইত্যাদি। তবে আপনি যদি লেগে থাকেন, অনেক চেষ্টা করেন, তাহলে চরম প্রয়োজনের মুহূর্তে আপনার সালাতই আপনাকে সাহায্য করবে। সালাত আপনাকে দেবে অন্তরের প্রশান্তি, স্থিরতা, দৃঢ়তা, শক্তি, সুখ, আশাবাদ ও সাহস। আর কেবল তখনই আপনার সালাত আপনার বোঝা হওয়ার পরিবর্তে পরম উপভোগ্য বিষয়ে পরিণত হবে।

কিছু লোক অভিযোগ করে যে, তারা বছরের পর বছর সালাত আদায় করছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সালাত তাদের কোনো উপকারে আসেনি! বাস্তবতা হলো - সালাত তাদেরকে উপকার করতে ব্যর্থ হয়নি, বরং তারাই ব্যর্থ হয়েছে সঠিকভাবে সালাত আদায় করতে। সালাত আপনাকে কখনোই ব্যর্থ করবে না যদি না আপনি প্রথমে সালাতকে ব্যর্থ করে দেন। ভেবে দেখুন, আপনি কি এমন একজন যার কাছে সালাত উপভোগ্য নয়, বরং বোঝাস্বরূপ? যদি তা-ই হয়, সালাতের আগে পরে নিজের কাজের প্রতি লক্ষ্য করুন। আপনি কি তাড়াহুড়া করে সালাত আদায় করতে যান? কোনোরকমে সালাত আদায় করেন যাতে করে যত দ্রুত সম্ভব সালাত থেকে উঠে চলে আসতে পারেন? ভাবুন, সালাতের মাঝে কি আপনি তড়িঘড়ি করেন? সালাম ফেরানোর পরেই চট করে উঠে পড়েন? এই ব্যাপারগুলো যদি ঘটে থাকে, তাহলে বলা যায় যে, আপনি সালাত থেকে উপকৃত হচ্ছেন না।

আল্লাহ ﷻ সূরা বাকারায় বলেন:

> "তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের (আসর) ব্যাপারে যত্নবান হও এবং বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হও।" [সূরা বাকারা, ২:২৩৮]

সুতরাং ধীরেসুস্থে সালাতের দিকে যান, শান্তভাবে সালাত আদায় করুন। তাহলেই আপনি শান্তি পাবেন। আপনার মন যদি সারা দিনের কাজকর্ম ও চিন্তার জগতে ঘুরপাক খায়, তাহলে একটু সময় নিন একে শান্ত করতে। আপনার অস্থির মনকে ভাবুন এক কাপ চায়ের মতো, যা চামচ দিয়ে নাড়া দেওয়া হয়েছে। চামচ সরিয়ে নেওয়ার সাথে সাথেই এটি থেমে যায় না, একটু সময় নেয়। একইভাবে, সালাত আদায় করার আগে যা করছিলেন, সে সব কাজ বন্ধ করে একটু শান্ত হয়ে বসুন। প্রয়োজন থাকলে প্রাকৃতিক কাজ সেরে নিন, তারপর সুন্দর করে ওযু করুন। পরিপাটি করে চুল আঁচড়ে নিন ও কাপড় পরিচ্ছন্ন কিনা দেখে নিন। শত হোক, আপনি কিছুক্ষণের মাঝে নিজেকে বিশ্বজগতের মালিকের সামনে উপস্থাপন করতে যাচ্ছেন!

- আযান দিন, যদি ইতিমধ্যে দেওয়া না হয়ে থাকে, তারপর সুন্নাহ সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়ান।

- সুন্নাহ আদায়ের পর সালাতের স্থানে বসেই কিছু যিকির করুন।

- যখন আপনি নিশ্চিন্ত বোধ করবেন এবং ফরয সালাতের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত হবেন, তখন দাঁড়িয়ে সালাত শুরু করুন। ধীরে ধীরে, সালাতের প্রতিটি কাজের মাঝে যথেষ্ট পরিমাণ সময় নিয়ে সালাত আদায় করুন। শারীরিক, মানসিক ও আত্মিকভাবে প্রশান্ত অবস্থাতেই কেবল ফরয সালাত আদায় করুন।

- সালাত শেষ হয়ে গেলেই উঠে দৌড় দিবেন না, একটু সময় নিয়ে সালাহ-পরবর্তী যিকির আদায় করুন।

যখন আপনি আপনার সালাতে প্রচুর সময় ও শ্রম দিতে শুরু করবেন, তখনই আপনার জন্য সালাত বোঝা হওয়ার বদলে আনন্দের ক্ষণ হয়ে দাঁড়াবে। সালাতে দাঁড়িয়ে এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেও তখন আপনি বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করবেন না। আপনি এক ওয়াক্ত সালাতের পর পরবর্তী ওয়াক্তের জন্য অধীর হয়ে থাকবেন এবং ওয়াক্ত হওয়া মাত্র আদায় করে ফেলবেন। সালাতরত অবস্থায় আপনার মনে হবে যদি এ সালাত সারাজীবন ধরে চলতে থাকতো, আর কখনো শেষ না হতো! এ পর্যায়ে পৌঁছে সালাতের গুরুত্ব আপনার কাছে খাওয়া, পান করা ও যেকোনো বিনোদনের চেয়ে বেশি দামী মনে হবে, আপনি সালাত ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবতেও পারবেন না। আর সে সময়েই আপনার কাছে সালাতকে মনে হবে সেই সবল সুঠাম ঘোড়ার মতো, যার পিঠে যখন ইচ্ছা তখনই চড়ে যাওয়া যায়।

আকঁড়ে ধরো সময়কে

সূরা আল লাইল:

> ১.শপথ রজনীর, যখন তা' আচ্ছন্ন হয়ে যায়, ২.শপথ দিনের, যখন তা' আলোকিত হয়, ৩.এবং শপথ তাঁর যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন- ৪.অবশ্যই তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন মুখী। ৫.অনন্তর যে দান করে ও মুত্তাকি হয়, ৬. যা উত্তম তাকে সত্য মনে করল, ৭. অচিরেই আমি তাঁর জন্য সুগম করে দেবো সহজ পথ। ৮. পক্ষান্তরে কেউ কার্পণ্য করল ও বেপরোয়া হলো। ৯. আর উত্তম জিনিসকে মিথ্যা মনে করল, ১০. অচিরেই তার জন্য আমি সুগম করে দেবো কঠোর পরিণামের পথ। ১১. এবং তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না, যখন সে পতিত হবে(জাহান্নামে)। ১২. আমার দায়িত্ব শুধু পথ নির্দেশ করা, ১৩. আর নিশ্চয়ই আমি পরকাল ও ইহকালের মালিক। ১৪. আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি; ১৫. নিতান্ত হতভাগ্য ব্যতীত কেউ তাতে প্রবেশ করবে না, ১৬. যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়; ১৭. আর তা হতে অতি সত্বর মুক্ত রাখা হবে বড় মুত্তাকিদেরকে, ১৮. যে স্বীয় সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য, ১৯. এবং তার প্রতিকার ও অনুগ্রহের প্রতিদান হিসেবে নয়, ২০. বরং শুধু তার মহান প্রতিপালকের মুখমণ্ডল(সন্তোষ) লাভের প্রত্যাশায়; ২১. সে তো অচিরেই সন্তোষ লাভ করবে। [সূরা আল লাইল, ৯২: ১-২১]

কিছু কিছু ঘটনা চামড়ার চোখে দেখলে ছোট মনে হয়, কিন্তু এ ঘটনাগুলোর জন্যই সাদামাটা পৃথিবী অসাধারণ হয়ে ওঠে। এমনই এক অসাধারণ কাহিনীকে ঘিরে এই সূরাটি নাযিল হয়। নবীজি ﷺ জীবিত থাকা অবস্থাতেই ঘটনাটি ঘটেছিলো, ইবনে আব্বাস ؓ থেকে ইবন আবি হাতিম কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন:

এক মুসলিমের এক বাগান ভর্তি খেজুর গাছ ছিল। বাগানের পাশেই ছিল এক দরিদ্র লোকের পরিবার। গাছের ডালগুলো সেই গরিবখানার আঙিনায় ঝুলে ঝুলে থাকতো। বাগানের মালিককে প্রায়ই দেখা যেত গরিব লোকটির বাড়িতে আসা-যাওয়া করতে। সে যেত তার বাগানের খেজুর পাড়তে। মাঝেসাঝে দু' একটা খেজুর গরিব লোকটির ঘরের মেঝেতেও পড়তো। বাড়ির বাচ্চারা সেগুলো তুলে

নেওয়ার হাতছানি সামলাতে পারতো না। কিন্তু বাচ্চাদের হাতে খেজুর দেখামাত্রই বাগানের মালিক এসে খপ করে ওগুলো কেড়ে নিতো! আর যদি দেখতো যে, কেউ ইতিমধ্যে খেজুর মুখে পুরেছে তাহলে তো কথাই নেই, রীতিমত আঙ্গুল বাঁকিয়ে মুখের ভেতর থেকে সেই খেজুর টেনে বের করে আনতো সে! এ ঘটনা কিছুকাল চলার পর সেই গরিব লোক আল্লাহর রাসূল ﷺ এর কাছে নালিশ জানালো। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাগান মালিকের সাথে দেখা করতে গেলেন। তিনি ﷺ তাকে একটি প্রস্তাব দিলেন, বললেন: "তোমার খেজুর বাগানে যে গাছের ডালগুলো অমুক ব্যক্তির আঙিনায় ঝুলে থাকে, ঐ গাছটি আমাকে দিয়ে দাও; বিনিময়ে তোমাকে জান্নাতের একটি খেজুর গাছের সুসংবাদ দেওয়া হচ্ছে।"

কিন্তু বাগান মালিক বললো, আমি আপনাকে এটি দিয়েই দিতাম, "কিন্তু ব্যাপার হলো আমার খেজুর বাগানের সব গাছের মধ্যে এই গাছটার মতো ভালো খেজুর কোনোটাতেই হয় না", এই বলে সে চলে গেলো।

বাগান মালিক আর আল্লাহর রাসূল ﷺ এর এই কথোপকথন আরেক লোক শুনছিলেন। বাগান মালিক চলে যাবার পরপরই লোকটি নবীজি ﷺ এর কাছে এসে উৎসুক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি ঐ ব্যক্তিকে যে প্রস্তাব দিয়েছেন, সেই একই প্রস্তাব কি আপনি আমাকেও দেবেন?" রাসূলুল্লাহ ﷺ জবাব দিলেন "হ্যাঁ"।

এ কথা শুনে লোকটি ছুটে গেলো ঐ বাগান মালিকের বাড়িতে। এই লোকটির নিজেরও অনেকগুলো খেজুর গাছ ছিল। সে বাগান-মালিককে বললো: "তোমার যে গাছের ডালগুলো অমুকের বাড়ির আঙিনায় ঝুলে থাকে, সে গাছের বদলে আল্লাহর রাসূল ﷺ জান্নাতের একটি খেজুর গাছের ওয়াদা করেছেন।" বাগানের মালিকের সেই একই জবাব: "আমার সব খেজুর গাছগুলোর মধ্যে এই গাছটার চেয়ে বেশি ফল আর কোনো গাছ দেয় না।" লোকটি জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কি গাছটি বিক্রি করবে?" বাগানমালিক বললো, "না। তবে আমি যে দাম চাইবো তা যদি কেউ দিতে রাজি থাকে, তাহলে বেচতে পারি। কিন্তু আমার মনে হয় না ঐ দামে কেউ এই গাছটি কিনতে রাজি হবে।"

"কেন তুমি কতো চাও?" লোকটি প্রশ্ন করলেন।

"চল্লিশটি খেজুর গাছ", বাগান মালিকের সোজাসাপ্টা উত্তর।

"চল্লিশটি খেজুর গাছ! এই একটি গাছের বিনিময়ে? তুমি তো অতিরিক্ত দাম চাইছো!"

বাগান-মালিকের কথা শুনে লোকটি বিস্ময়ে থ হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর বললেন, "ঠিক আছে। আমি তোমাকে চল্লিশটি খেজুর গাছ-ই দেবো, তুমি যদি সত্য কথা বলে থাকো তো একটি চুক্তি সই করো।" বাগানমালিক কথামতো কিছু সাক্ষী যোগাড় করে চুক্তি সই করলো। লোকটি চুক্তিপত্র হাতে নিয়ে তক্ষুণি গেলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে। বলে উঠলেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি ঐ বাগানের মালিকের থেকে এই গাছটি কিনে নিয়েছি, এখন এটি আপনার!"

নবীজি ﷺ তখন গরিব লোকটির কাছে ফিরে গেলেন, তাকে বললেন, "এই গাছটি এখন থেকে তোমার ও তোমার পরিবারের!..." ঠিক এই মুহূর্তে সাত আসমানের ওপর থেকে আল্লাহ ﷻ এ আয়াতগুলো পাঠাতে লাগলেন, "শপথ রাতের যখন তা ঢেকে ফেলে".. সূরাতুল লাইলের প্রথম আয়াত থেকে শুরু করে একেবারে শেষ আয়াত পর্যন্ত!

আল্লাহু আকবার!

কতো দুর্ভাগা সেই বাগান মালিক যে সামান্য এক খেজুর গাছের বদলে জান্নাতের একটি গাছের মালিক হওয়ার প্রস্তাবকে ফিরিয়ে দিতে পারে? আর কতো সৌভাগ্যবান সেই বান্দা যে কিনা মাত্র ৪১টি গাছের বিনিময়ে জান্নাতে নিজের জন্য জায়গা কিনে নেন? (জান্নাতে একটি গাছের ওয়াদা পাওয়ার অর্থ জান্নাতে যাওয়ারই ওয়াদা পেয়ে যাওয়া, কারণ জান্নাতে না থাকলে তো আর সেই গাছকে উপভোগ করা যাবে না)

এই বান্দা একটি ভালো কাজের খোঁজ পেয়েছিলেন যা তাকে সরাসরি জান্নাতে পৌঁছে দেবে। আর তাই এমন দুর্লভ মুহূর্তটি তিনি তৎক্ষণাৎ আঁকড়ে ধরেন। আর একটু দেরি করলে বা বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেই হয়তো সুযোগটি হাতছাড়া হয়ে যেত, হয়তো অন্য কেউ লুফে নিত এমন অসামান্য এক প্রস্তাব!

আল্লাহর এই বান্দাটি হলেন আবু বাকর رضي الله عنه। আবু বাকর رضي الله عنه তাঁর জীবনে অসংখ্যবার এমন অবস্থার মুখোমুখি হয়েছেন। এমন একটিবারও হয়নি যে, তিনি ভালো কোনো কাজের সুযোগ পেয়েও সেটাকে হাতছাড়া হতে দিয়েছেন। বরং তিনি এরকম প্রতিটি মুহূর্তকে আঁকড়ে ধরেছেন। যখন তিনি কৃষ্ণাঙ্গ বিলাল رضي الله عنه

কে উমাইয়া বিন খালাফের হাতে নির্মমভাবে নির্যাতিত হতে দেখছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে উমাইয়ার থেকে কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেন। মক্কার অনেক মুসলিম দাস-দাসীকে তিনি এভাবেই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন, যাদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য কেউ ছিল না, না তাদের পরিবার, না কোনো গোত্র। আবু বাকর তাদেরকে কিনে মুক্ত করে দিতেন। আবু বাকরের বাবা ছেলের কাজে অবাক হয়ে বলেছিলেন, "বাবা! তুমি এই দুর্বল দাসগুলোকে কিনে কিনে আজাদ করে দিচ্ছো কেন? এদেরকে তোমার কাছে রেখে দিলেও তো অন্তত তোমার কিছু কাজে আসবে।"

আবু বাকর ﷺ তখন তার বাবাকে বলেছিলেন, "বাবা, আমি তো শুধুই আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ পাওয়ার আশায় এমনটা করছি।"

আল্লাহ عزوجل প্রতিদিন এমন কতো সুযোগ আমাদের সামনে এনে দেন, কিন্তু আমরা ক' জন সেগুলো লুফে নিই? আমরা কী করে বুঝবো যে এই কাজটিই আমাদের জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম নয়? হতে পারে, এই কাজটি করেই আমরা জান্নাতে যেতে পারতাম! নবীজি ﷺ তো আমাদের এমন এক ব্যক্তির কথাও বলেছেন, যে রাস্তা থেকে নিছক একটা কাঁটাওইয়ালা গাছের ডাল সরানোর জন্যে জান্নাতে দাখিল হয়েছেন! আর আমরা জেনেছি সেই পতিতা নারীর কথা যার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে গিয়েছিল কেবল একটি তৃষ্ণার্ত কুকুরকে পানি পান করিয়ে। আর কতো লোকই না জান্নাতে দাখিল হয়েছেন দাসমুক্ত করার জন্য বা বন্দীর মুক্তিপণ দেওয়ার জন্য!

কোনো ভালো কাজকেই কখনো উপেক্ষা করবেন না। হোক না তা ভাইকে পানি এনে দেওয়া, প্রতি সালাতের পরে যিকির করা, অন্যের মালপত্র একটু টেনে দেওয়া, বা হাসিমুখে কথা বলা। অথবা হোক তা কোনো কারাবন্দীর মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করা! কোনো ভালো কাজকেই ছোট ভাববেন না, কারণ সেটাই হতে পারে আপনার নাজাতের ওয়াসিলা, আপনার জান্নাত পাওয়ার উপায়! আলিমরা বলেন, আখিরাতের জন্য কাজ করতে যেন সঙ্কোচ না হয় আমাদের। সময়কে আঁকড়ে ধরুন।

দেরি হয়ে যাওয়ার আগেই।

জেল পালানো

কারাগারের প্রকোষ্ঠ থেকে হঠাৎ হঠাৎ পালিয়ে যাওয়ার তিনটি উপায় আছে। আপনি যখন খুশি তখনই এর যেকোনোটি প্রয়োগ করতে পারেন!

১)

প্রথম উপায়টি হলো কুরআন পড়া। এর মাধ্যমে আল্লাহ আপনাকে কারা প্রকোষ্ঠ থেকে বের করে নিয়ে এক অদ্ভুত ভ্রমণে নিয়ে যেতে পারেন। কখনো তিনি আপনাকে নিয়ে যাবেন লক্ষ কোটি বছর আগের নিঃশব্দ সময়ে যখন এ বিশ্বচরাচর জন্ম নেয়নি। কখনো নিয়ে যান হাজার বছর আগে সেসব নবীদের যুগে, যারা আপনার আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন। কখনো তিনি আপনাকে ঘুরিয়ে দেখান নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর যুগ। মনে হবে আপনি যেন সাহাবাদের رضي الله عنهم মাঝেই বাস করছেন! কখনো তিনি আপনাকে নিয়ে যান আরেকটি কারাগার পরিদর্শনে। জাহান্নামের চিরস্থায়ী কারাগার। কখনো বা নিয়ে যান ভবিষ্যতে, হাজার বছর পরের কোনো এক সময়। আপনি হয়তো থাকবেন বিচার দিবসে, আল্লাহর আদালতের কাঠগড়ায়, যেখানে কোনো ব্যারিস্টার নেই, উপদেষ্টা নেই। নেই কোনো মিডিয়া বা মানবাধিকার। সেখানে কারারক্ষীরা হবে কঠোর, কর্কশ ফেরেশতাগণ। আর প্রায়শই আল্লাহ আপনাকে তাঁর একান্ত সান্নিধ্যে নিয়ে যাবেন এবং বর্ণনা করবেন তাঁর সুমহান মাহাত্ম্য।

২)

দ্বিতীয় উপায়টি হচ্ছে আপনার নিজের অতীতে ফিরে যাওয়া, যতটা আপনার স্মৃতিতে কুলোয়। ফিরে যান পাঁচ বছর আগে, দশ বছর আগে কিংবা তার আগে পরে যেকোনো সময়ে। ফিরে যান আপনার বিয়ের দিনে, গ্র্যাজুয়েশনের দিনে! অথবা সেই দিনে যেদিন আল্লাহ আপনাকে ইসলামের আলো দেখিয়েছেন। অথবা ঘুরে আসুন আপনার প্রথম সন্তান জন্মের দিনে, আপনার আনন্দের ও দুঃখের মুহূর্তগুলোতে। কিন্তু অতীত নিয়ে আফসোস করবেন না, স্মৃতিচারণ করে কখনো বলবেন না, "ইশ! যদি এমনটা হতো", আল্লাহ যা কিছু আপনার ভাগ্যে লিখে রেখেছেন তা নিয়ে প্রশ্ন করবেন না।

৩)

তৃতীয় উপায় হচ্ছে আপনার ভবিষ্যতে চলে যাওয়া, কল্পনার অসীম জগতে বিচরণ করেই দেখুন না! ভাবুন আচ্ছা, কী হবে যদি আপনি আর কখনো জেল

থেকে মুক্ত হতে না পারেন? যদি আগামীকালই মুক্তি পান তাহলে কী হবে? যদি আরো তিন বছর জেলে থাকতে হয় তাহলে কীভাবে কী করবেন? ভবিষ্যতের ভাবনা আপনাকে ক্ষণিকের জন্যে হলেও মুক্তির স্বাদ দেবে।

কল্পনার ডানা মেলে

কালো মেঘ

আল্লাহ عَزَّ وَجَلَّ পবিত্র কুরআনে বলেন,

> "যখন ইবরাহীম عليه السلام বলল, "আমার প্রতিপালক! আমাকে দেখান কী করে আপনি মৃতকে জীবন দান করেন"। তিনি বললেন, "তুমি কি বিশ্বাস কর না (যে আমি তা করতে পারি)? সে উত্তর দিল, "অবশ্যই, তবে শুধু আমার হৃদয়কে পরিতৃপ্ত করার জন্য..." [সূরা বাকারা, ২: ২৬০]

আয়াতের বাকি অংশে বর্ণিত হয়েছে কী করে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমকে عليه السلام একটি নিদর্শন দেখিয়ে তার হৃদয়কে প্রশান্ত করলেন। যদিও তিনি আগে থেকেই তাতে বিশ্বাস করতেন। আপনি সত্যের উপর আছেন এবং আল্লাহ আপনার পক্ষে - এই ব্যাপারে নিজেকে আশ্বস্ত করার জন্য কখনো কখনো আপনার ইচ্ছা হতে পারে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো নিদর্শন দেখার। যদি আপনি কখনো এমন অনুভব করেন, তাহলে উযু করে দুই রাক'আত সালাত পড়ে আল্লাহর কাছে দুআ করুন আপনাকে নিদর্শন দেখাতে। তারপর জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকান। কারাবন্দী এক ভাই তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এভাবে:

"আমি আল্লাহর কাছে একদিন একটি নিদর্শন দেখতে চাইলাম। সেদিন আমি নিজের ঈমানে কিছুটা দুর্বলতা অনুভব করছিলাম। আমি জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালাম। আমি আল্লাহর সৃষ্টির প্রশংসা করছিলাম, এমন সময় হঠাৎ এক খণ্ড বিশাল কালো মেঘকে কারাগারের দিকে ধেয়ে আসতে দেখলাম। এটি ছিল বিরাট ও দেখতে ভয়ানক। ধীরে ধীরে মেঘটা এসে কারাগার ছেয়ে ফেলল। যাই হোক, এটি যেমন ধীরে ধীরে এসেছিল আবার ধীরে ধীরে একটু পর চলেও যায়। মেঘটার ছায়াও আস্তে আস্তে উধাও হয়ে যায়। আমার মনে হলো, আল্লাহ আমাকে বলছেন–তোমার অবস্থা যতই খারাপ হোক না কেন, পরিস্থিতি যত ভয়ংকরই হোক না কেন, এর থেকে নিষ্কৃতি আছেই। সেই কালো মেঘ যেমন চিরতরের জন্য কারাগারটিকে ছেয়ে ফেলতে পারেনি, খারাপ সময়ও চিরস্থায়ী হয় না, প্রতিটি কষ্টের পরেই স্বস্তি আছে। আল্লাহ কুরআনে বলেন, "নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে। অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি আছে" [সূরা ইনশিরাহ, ৯৪: ৫-৬]।

একটি কষ্ট দুটো স্বস্তিকে পরাস্ত করতে পারে না। রাত যতই লম্বা হোক না কেন, এরপরে একটি ভোর আছে এবং রাতের অন্ধকারতম অংশের পরই ভোর আসে।

ভাঙা পা

ইবন 'উমার ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, **"মযলুমের দু'আকে ভয় কর, কারণ তা আলোর চেয়েও দ্রুত গতিতে আসমানে পৌঁছে"**। (আল-হাকিম, সহীহ)। অন্য এক বর্ণনায় আছে, **"মযলুমের দু'আকে ভয় কর, যদিও সে কাফির হয়। কারণ তার এবং আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই"**। (আহমাদ, সহীহ)

সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত একটি ঘটনা থেকে আমরা জানতে পারি, এক মহিলা একবার সাঈদ ইবন যায়িদ ﷺ কে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করলো। সাঈদ ইবন যায়িদ ﷺ ছিলেন জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবির ﷺ একজন। বিচারের কাঠগড়ায় তাদের উপস্থিত করার পর সাঈদ ﷺ দুআ করলেন, "হে আল্লাহ! আপনি যদি তাকে মিথ্যাবাদী বলে জানেন, তবে তাকে অন্ধ করে দিন এবং তার ঘরকেই তার কবর বানিয়ে দিন"। বর্ণনাকারী বলেন, "পরবর্তীতে আমি সেই মহিলাকে অন্ধ অবস্থায় দেখেছি, সে দেয়াল ধরে হাঁটতো ও বলতো, "সাঈদের দুআ আমাকে গ্রাস করেছে"। একবার সে তার ঘরের উঠানে একটি কুয়ার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাতে পড়ে যায়। ফলে তার ঘরই তার কবরে পরিণত হয়।

একবার লন্ডনের এক কারাগারে অন্যায়ভাবে বন্দী এক মুসলিম ভাই তার সেলে সালাত আদায় করছিলেন। সেলটা ছিল খুবই ছোট এবং তাকে বন্ধ দরজা বরাবর এমনভাবে সিজদাহ করতে হতো যে, কেউ দরজা খুললে তার সামনে সিজদার স্থানে দরজা চলে আসবে। সেই ভাই খাওয়া দাওয়া শেষে থালাবাসন দরজার কাছে রাখলেন যাতে সালাতে ব্যাঘাত না ঘটিয়েই কারারক্ষী সেগুলো নিয়ে যেতে পারে। তার সালাতের সময় এক অতিকায় কারারক্ষী থালাবাসন নিয়ে যেতে এল। সে ঐ ভাইকে প্রার্থনারত অবস্থায় দেখল এবং ইচ্ছা করেই পুরো দরজা এমনভাবে খুললো যাতে করে থালাগুলো সেই ভাইয়ের জায়নামাজে গিয়ে পড়ে। উপরন্তু সে তার বড় কালো ইস্পাত মোড়ানো বুট নিয়ে সিজদাহের স্থান গিয়ে দাঁড়ালো। সে ভাই সালাত আদায়রত অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও রক্ষীটি খুব রুঢ়ভাবে থালাবাসনগুলো তার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য তাগিদ দিতে থাকল। সেই ভাই সালাহ ভঙ্গ না করে সেই অবস্থাতেই সিজদায় গেলেন। প্রহরীটির বুটের তোয়াক্কা না করে বুটের পাশে মাথা রেখেই সেই সিজদায় ভাই দুআ করলেন, "হে আল্লাহ!

তুমি জানো এই দুর্বৃত্ত কীভাবে আমার প্রতি অবিচার করেছে ও আমার সালাতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। হে আল্লাহ! এর পা ভেঙ্গে দাও!" সালাত শেষে সেই ভাই প্রহরীদের রুমে গিয়ে সেই প্রহরীর ব্যাপারে অভিযোগ করলেন। কিন্তু সেই প্রহরী নিজের দোষ তো স্বীকার করলই না, উল্টো সে কারাবন্দী ভাইকে দোষারোপ করে চলল। ভাই বললেন, "আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করলাম। তিনিই তোমাকে দেখে নেবেন"।

একথা বলে শেষ করতে না করতেই একটি ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটে। ইস্পাতের একটি ক্যাবিনেট ঐ প্রহরীর ঠিক পায়ের উপরেই পড়ে। সে বাচ্চাদের মতো চিৎকার ও কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। সব কারাবন্দী এসে জড়ো হয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল কী হয়েছে। অন্য প্রহরীরা তার কাছে ছুটে গিয়ে তাকে স্ট্রেচারে শুইয়ে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। বেশ কিছু দিন পর সেই প্রহরী সুস্থ হয়ে কাজে ফিরে আসে। বলাই বাহুল্য, সে আর কখনো কারো সালাতে ব্যাঘাত ঘটায়নি। সালাত শেষ হওয়া আর প্রহরীদের রুমে যাওয়া- সে ভাইয়ের দুআ কবুল হতে এই দুইটি ঘটনার মাঝের খুব অল্প সময়ই লেগেছিল।

> "মযলুমের দুআকে ভয় কর, কেননা নিশ্চয়ই তা আলোর থেকে দ্রুত বেগে আসমানে পৌঁছে যায়"। (আল হাকীম, সহীহ)

সম্মান ও মর্যাদার পথ

একজন কবি বলেন, "মহানুভবতা কী এক টুকরো খেজুর যে এক নিমেষে খেয়ে নেবে? প্রকৃতপক্ষে, ক্যাকটাসসম তিক্ততা আস্বাদন না করে কেউ মহানুভবতা অর্জন করতে পারে না"।

ইমাম আশ-শাফি বলেছেন, "কেউ ততদিন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না, যতদিন না সে পরীক্ষিত হয়"।

হে কারাবন্দী, ভেবে দেখুন তো, কী থেকে আপনি বঞ্চিত? কারাগারের দেয়াল ভেদ করতে পারলে আপনি দেখতে পেতেন আপনি খুব তুচ্ছ কিছু জিনিস থেকে বঞ্চিত: খাবার পানীয়, নিদ্রা, সামাজিকতা, কেনাকাটা এই তো! চারপাশের মানুষগুলো এসব নিয়েই ব্যস্ত, অথচ বিচার দিবসে এগুলো কোনোই কাজে আসবে না।

যাই হোক, পানাহার কিন্তু আপনিও করেন, তবে অন্যরা যে খাবার খায় তা নয়। আপনি যা খান, তা খাবার সৌভাগ্য রাজা-মহারাজা ও তাদের পুত্রদের কপালেও জোটে না, কেননা আপনি ভোগ করেন সম্মান আর মর্যাদার স্বাদ, যা থেকে অন্যরা বঞ্চিত! স্বর্ণ আর রুপার বিনিময়েও এই মর্যাদা তারা লাভ করতে পারবে না। আপনিও ঘুমান। কিন্তু আপনি ঘুমান শান্তিতে, কেননা আপনি তো জানেন আপনার এ ঘুমের প্রতিদান কারাগারের বাইরের কারো রাত জেগে সালাত আদায় থেকেও বেশি। সামাজিকতা আপনিও পালন করেন, তবে তা আল্লাহর ফেরেশতাদের সাথে, যিকর করার মাধ্যমে। আর সেলের বাইরে আপনি দেখা পান আল্লাহর সেইসব বান্দার যারা কিনা আল্লাহর আউলিয়া বা বন্ধু, যাদেরকে বন্দী করা হয়েছে এজন্য যে তারা দ্বীনের উপর অটল। কেনাকাটা তো আপনিও করেন। আপনি কিনে নিচ্ছেন আল্লাহর দেওয়া জান্নাত, নিজের জীবন ও সম্পদের মূল্যে। আপনি জীবনের পাতাগুলো পুড়িয়ে দিয়ে জান্নাতের পথকে আলোকিত করছেন। আল্লাহ বলেন,

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে"। [সূরা আত-তাওবা, ৯: ১১১]

একজন 'আলিম বলেন, "মহান তো সে, যে আত্মমর্যাদা সমুন্নত রাখতে ভয়কে জয় করে আর কষ্টকে কাঁধে তুলে নেয়।" দাম যাই হোক, তা পরিশোধ করতে তারা প্রস্তুত, এমনকি যদি তা মৃত্যু হয়, তবুও, কেননা মৃত্যুর পেয়ালাতে একবারই চুমুক দিতে হবে, কিন্তু তাদের কথা আর কাজগুলো প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে বারংবার।

গুরাবা

নবী ﷺ বলেন, **"ইসলাম অপরিচিত অবস্থায় শুরু হয়েছিল এবং এটি অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে, যেভাবে তা শুরু হয়েছিল; অতএব, অপরিচিতের জন্য সুখবর"**। [বুখারি, মুসলিম]

গুরাবা (অপরিচিত) এর একটি ব্যাখ্যা হলো এমন যে, তারাই গুরাবা যারা দ্বীন পালনের কারণে নিজেদের আপনজনের কাছে অপরিচিত হয়ে গেছে।

একজন সাহাবি ﵁ ছিলেন যিনি প্রায় তার ছোট ছেলেকে নিয়ে নবী ﷺ এর মজলিসে আসতেন। একবার টানা কিছুদিন সেই সাহাবিকে ﵁ দেখতে না পেয়ে

নবী ﷺ খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে সেই সাহাবির ﵁ ছোট ছেলেটি মারা গেছে। তাই নবী ﷺ তাকে দেখতে গেলেন ও জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোনটি পছন্দ কর? আজীবন তোমার পুত্রের সাথে কাটাবে, আর সে জীবিত থাকা অবস্থাতেই তোমার মৃত্যু হোক নাকি তুমি ধৈর্য ধরবে এবং দেখতে চাও বিচার দিবসে জান্নাতের প্রতিটি দরজায় তোমার ছেলে তোমার আগেই পৌঁছে গেছে ও তোমার জন্য তা খুলে রেখেছে? সেই সাহাবি দ্বিতীয়টি বেছে নিলেন। নবী ﷺ বললেন, "তবে তোমার জন্য তাই হবে"। অন্য সাহাবাগণ ﵃ জিজ্ঞেস করলেন, "এটা কি শুধু এই ব্যক্তির জন্য নাকি আমাদের জন্যও প্রযোজ্য?" নবী ﷺ বললেন, "তোমাদের সবার জন্যও"।

এটি এমন এক সাহাবির ﵁ কাহিনী যিনি তার বালক পুত্রের সঙ্গ হারিয়েছিলেন মৃত্যুর মাধ্যমে। এরপরও তিনি ধৈর্যশীল ছিলেন। তাহলে সেই ব্যক্তির পরিণতি কী হবে যে কিনা তার দ্বীন পালন করতে গিয়ে পিতামাতা, স্ত্রী, ভাইবোন, সন্তান ও পরিবারের সঙ্গ হারিয়েছে? যদিও এই হাদীসে কারাবন্দীদের কথা নেই, তারপরও আল্লাহর কাছে দু'আ করতে দোষ নেই যে, ক্বিয়ামতের দিন যেন আপনার একই সৌভাগ্য হয়, আপনি তাকিয়ে দেখবেন আপনার পরিবারের মানুষগুলো জান্নাতের দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে, আপনার জন্য!

জীবন দিয়ে কেনা

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

> "নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাসীদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে" [সূরা আত-তাওবাহ, ৯: ১১১]

একজন লোক যদি একটি কাপড় অন্য একজনের কাছে পারস্পরিক সম্মতিতে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করে দেয়, তখন ক্রেতার কাছে কাপড় পৌঁছে দেয়া মাত্র সেই লেনদেন সম্পন্ন হয়ে যায়। যদি উভয় পক্ষই এ শর্তে সম্মত হয় যে ক্রেতা কাপড়ের মূল্য পরে নির্ধারিত কোনো সময়ে পরিশোধ করবে, তাতেও কাপড়টি বিক্রি হয়ে গেছে বলেই ধরে নেওয়া হবে। বিক্রয় সম্পন্ন হয়ে যাওয়ার পর তখন বিক্রেতার কি আর পণ্যের ব্যবহারের উপর শর্তারোপ করার কোনো অধিকার থাকে? উদাহরণস্বরূপ, সে কি বলতে পারে যে কাপড়টি শুক্রবারে পরা যাবে না? অথবা ঘুমুতে যাওয়ার সময় এটি পরা যাবেনা? অবশ্যই না। লেনদেন সম্পন্ন হয়ে গেছে এখন ক্রেতা যেভাবে ইচ্ছা তা ব্যবহার করতে পারে। তিনি যদি চান তিনি তা রাখতে পারেন, পরতে পারেন, ছুঁড়ে মারতে পারেন, বিক্রি করতে পারেন, কাউকে দিয়েও দিতে পারেন। এটা এখন তাঁরই সম্পত্তি, তিনি যা খুশি করতে পারেন।

হে বন্দী! আল্লাহ কি আপনার আত্মা আপনার সম্মতিতে আগেই কিনে নেননি? তবে কেন আপনি এখন ক্রেতার উপর শর্তারোপ করতে চাইছেন? আল্লাহ আপনার আত্মা নিয়ে যা খুশি করার অধিকার রাখেন, তবে কেন আপনি বলছেন কারাগার নয়, আমি তো তড়িঘড়ি করে জান্নাত চেয়েছিলাম? এ কথা আপনার মুখে মানায় না, কেননা তিনি তো আপনার আত্মা কিনেই নিয়েছেন! কী-ই বা হবে যদি আপনাকে জান্নাতে প্রেরণের পূর্বে তিনি কিছুদিন বন্দী করে রাখেন?

তিনি তো আপনাকে নিয়ে যা খুশি করার ক্ষমতা রাখেন, কেননা জান্নাতের বিনিময়ে তিনি আপনার জান মাল কিনে নিয়েছেন ইতিপূর্বেই। আর আপনিই তো প্রতিদিন অন্তত সতেরবার করে এই দুআ করেছেন, "আমাদের সরল পথে পরিচালিত করুন, তাদের পথে যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন...(নবীগণ, শহীদগণ, সত্যবাদীগণ ও সৎগণ), আপনিই তো আল্লাহর কাছে চেয়েছেন যেন

তিনি আপনাকে নবীগণ ও উল্লেখিত তিন দলের পথে পরিচালিত করেন। তবে কেন আজ আপনি অভিযোগ করছেন যখন আল্লাহ্ আপনার দুআ কবুল করেছেন ও আপনাকে সরল পথ দেখিয়েছেন? যদি আপনি বাস্তবিকই আপনার আত্মা আল্লাহ্র তরে বিলিয়ে দেন তবে নিশ্চিত থাকুন, যে আল্লাহ তাঁর অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না এবং আপনার কষ্টের বিনিময় দিতেও ব্যর্থ হবেন না।

হারিয়ে যাওয়া উট

আল্লাহ কুরআনে বলেন,

> “মুমিন লোকদের জন্য এখনও কি সময় আসেনি যে, সে আল্লাহর স্মরণ এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাঁর সম্মুখে অবনত হবে? এবং পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মতো যেন তারা না হয়, বহুকাল অতিক্রান্ত হয়ে গেলে যাদের হৃদয় কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাদের অধিকাংশই ফাসেক।” [সূরা হাদীদ, ৫৭: ১৬]

আরবের এক বেদুঈন ব্যক্তি মরুভূমিতে সফরের সিদ্ধান্ত নিল। যাত্রা শুরুর কিছুদিন আগে থেকে সে তার উটকে ভালো মতো পানি ও খাবার দিয়ে উটটিকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত করছিলো। এরপর সে নিজ হাতে উটের পিঠে মালামাল চাপিয়ে একদিন যাত্রা আরম্ভ করল। উটটি সেই জন্ম থেকেই বেদুঈন লোকটিরই ছিল এবং কখনো কোনো ঝামেলা করেনি।

যাত্রার কিছুদিন পর সেই বেদুঈন মরুভুমির মাঝে এক অদ্ভুত বালুর পাহাড় আবিষ্কার করলো। পাহাড়টা ছিল অর্ধ-চন্দ্রাকৃতির। পাহাড়ের পায়ের কাছে ছায়া। মরুভূমির বুকে এই দুর্লভ ছায়া খুঁজে পেয়েই সে সিদ্ধান্ত নিল এখানে বসে কিছুক্ষণ জিরিয়ে নেওয়া যাক। সে উট থেকে নেমে উটটিকে বসিয়ে এর পাগুলো বেঁধে দিল, যেন এটি কোথাও চলে যেতে না পারে। এরপর শান্তির এক ঘুম দিল। কিন্তু অল্পক্ষণ পর ঘুম থেকে উঠেই সে হতবাক। প্রচণ্ড বিস্ময় ও আতঙ্কের সাথে আবিষ্কার করলো, তার উটটি যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠলো সে! এরপর পাগলের মতো এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করে উটটি খুঁজতে লাগলো। উটটা যে শুধু তার সফরের দরকারি জিনিসগুলো বয়ে বেড়াচ্ছিলো তা নয়; বরং লোকটির বেঁচে থাকার সব সম্বল তখন ঐ উটের পিঠে বাঁধা। উটের সাথে সাথে বেদুঈনের খাওয়া-দাওয়া আর পানীয় ও অজানায় হারিয়ে গেল। এভাবেই কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। বেদুঈন ব্যক্তিটি তখন আরো মরিয়া হয়ে খুঁজছে। সে টের পেল তার শরীর ক্ষুধায় ভেঙে পড়ছে, প্রতিটি রক্তবিন্দু তৃষ্ণায় কাতর! কিন্তু চারিদিকে ডেকে ডেকেও সে উটটির কোনো সাড়াশব্দ পেল না। সবখানে খুঁজে দেখলো, কিন্তু উটের কোনো চিহ্ন নেই তো নেই। আরো কয়েক ঘণ্টা পর তার অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করলো।

হতাশায় মাথায় হাত দিয়ে সে সেখানেই বসে পড়লো, বুঝলো বেঁচে থাকার আর কোনো আশা নেই। জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা এখন শুধু কিছু সময়ের ব্যাপার। সে টের পাচ্ছিল তার জান বেরিয়ে যাচ্ছে। জীবনের সমস্ত আশা ছেড়েই দিল সে! কিন্তু ভাবলো, মরতে যখন হবে, তখন ছায়ার নিচে মৃত্যু হলে খারাপ হয় না। বহু কষ্টে প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে সে সেই ছায়ায় নিচে পৌঁছুলো যেখানে সে প্রথমবার ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং সেখানে পোঁছেই জ্ঞান হারালো।

একটু পর তার হুঁশ ফিরলো। সে জেগে উঠে দেখলো তার উটটি ঠিক তার সামনে দাঁড়ানো! আনন্দের আতিশয্যে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে সে চিৎকার করে বলে উঠলো, “হে আল্লাহ! আমি তোমার রব আর তুমি আমার বান্দা!”

সহীহ মুসলিমে বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, **“আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবাতে ঐ লোকের চেয়েও বেশি খুশি হন যে মরুভূমিতে উট হারিয়ে ফেলেছিল এবং তা খুঁজে পেয়ে আনন্দের আতিশয্যে চিৎকার করে বলে ওঠে, “হে আল্লাহ! আমি তোমার রব আর তুমি আমার বান্দা!”**

হে কারাবন্দী! আপনি কেন কারাগারে? পরিচয় বিভ্রাট? ষড়যন্ত্র? শক্ত প্রমাণের অভাব? মিথ্যা অভিযোগ? ভুল সময়ে ভুল জায়গায় থাকা? অন্য কারো দোষে? হতে পারে আপনার বন্দীত্বের পেছনের কারণটি সাজানো, কিন্তু নিজেকে সৎভাবে জিজ্ঞেস করুন, “আমি কি আমার প্রতিপালকের বিরুদ্ধে গিয়ে পাপ ও অপরাধ করা থেকে নিষ্পাপ?” যখন আপনি অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করেছিলেন, তখন কি সেটা অন্যের দোষ ছিল? যখন আপনি কোন অশ্লীল দৃশ্য উপভোগ করছিলেন, সেটা কি কোনো পরিচয় বিভ্রাটের মামলা ছিল নাকি সেটা আসলে আপনিই ছিলেন? যখন আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে হারাম কিছু ভোগ করছিলেন বা পান করেছিলেন, তখন কি কেউ ষড়যন্ত্র করে আপনাকে ফাঁসিয়েছিল? তবে কেন আপনি মিথ্যা অপবাদের অভিযোগ করেন যখন আপনি হাজারটা অপরাধে দোষী, যেগুলোর কথা এসব অভিযোগকারীরা জানেও না? আপনি কি বুঝতে পারেন নি যে, আল্লাহ তা‘আলাই তাঁর অসীম দয়ায় আপনাকে বন্দীত্বের এই পরীক্ষায় এনে হাজির করেছেন যেন আপনি তাওবাহ করে হৃদয়কে ধুয়ে মুছে নিতে পারেন সেই সব অপরাধ থেকে যেগুলোতে আপনি নিঃসন্দেহে দোষী...।

হয়তো আপনি কোনো অসতর্ক মুহূর্তে পাপ করেছেন, হয়তো আপনি লজ্জিত, হয়তো আপনার ইচ্ছা করছে মাটির সাথে মিশে যেতে, হয়তো আপনি সেই উট হারানো লোকটির মতো হতাশ! কোনো ব্যাপার নয়। আল্লাহর দিকে ফিরে আসুন,

আল্লাহর কাছে তাওবাহ করুন, আপনার অন্তরটা খুলে ধরুন, চোখের পানিকে ছেড়ে দিন। আপনি তাকে আপনার সামনেই পাবেন, আর আপনি দেখবেন যে আল্লাহ তা'আলা আপনার তাওবায় সেই ব্যক্তির চেয়েও বেশি সন্তুষ্ট যে মরুভূমিতে তার উট খুঁজে পেয়েছিল।

ঈমানরত্ন

আল্লাহ কুরআনে বলেন:

> “হে আমার পুত্র, তোমার স্বপ্নের বৃত্তান্ত তোমার ভাইদের নিকট বর্ণনা কোরো না, করলে তারা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবে, শয়তান তো মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।” [সূরা ইউসুফ, ১২: ৫]

যদি কেউ আপনাকে আপনার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদের নাম লিখতে বলে, আপনি কি লিখবেন? আপনার শরীর? গাড়ি? পরিবার? গহনা? বাড়ি? চুল? আপনার চাকরি? অর্থবিত্ত? কিংবা আপনার কাপড়চোপড়? হয়তো এ ধরনের কিছুই। তবে রূঢ় বাস্তবতা হলো এর কোনোটিই আপনার আখিরাতে কাজে আসবে না। আর চাইলেও আপনি এগুলো কবরে নিয়ে যেতে পারবেন না। তবে প্রত্যেক মানুষের কাছে এমন একটি বিশেষ সম্পদ আছে, যা পৃথিবীর জীবনে, কবরের অন্ধকারে আর পরকালে শুধু যে কাজে আসবে তা নয়, বরং ওজনের পাল্লায় এর ভার বাকি সব সম্পদকে ছাড়িয়ে যাবে। সে সম্পদটি হলো ঈমান।

ঈমান কী – এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হবে, মূসা ﷺ এর দু’আতে যখন আল্লাহ তা‘আলা সাগরকে দু’ভাগ করে দিয়ে তাঁর উম্মাতকে রক্ষা করেন, তখন মূসার ﷺ অন্তরে যা ছিল তা হচ্ছে ঈমান। জালুতকে কতল করার সময়ে দাউদের ﷺ অন্তরে যা ছিল সেটি হলো ঈমান। ঈসা ﷺ যখন আল্লাহর কাছে আকাশ থেকে টেবিল ভর্তি খাবার পাঠানোর দু’আ করেছিলেন, যা থেকে হাজারো লোক দু’বেলা পেটপুরে আহার করবে, সেই মুহূর্তে উনার হৃদয়ে যা ছিল তা হচ্ছে ঈমান। আর ঈমান হলো যা রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়ত্ত্ব করেছিলেন, যার কারণে তিনি ও তাঁর সাহাবিরা ﷺ হতে পেরেছিলেন পুরো বিশ্বের নেতা।

আপনি আপনার প্রিয় বস্তুটিকে চুরি-ডাকাতি বা ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে কীভাবে নিরাপদে রাখেন? যারা আপনার থেকে আপনার সম্পদ ছিনিয়ে নিতে চায়, তাদের থেকে একে কিভাবে রক্ষা করেন? নিশ্চিত বলা যায় যে আপনি আপনার মহামূল্যবান জিনিসটি বাঁচাতে দরকার হলে জান লাগিয়ে দেবেন। কিন্তু জীবনের সবচেয়ে অমূল্য সম্পদ ঈমানকে রক্ষা করতে আপনার প্রচেষ্টা কতখানি?

যদি আপনার ঈমান এক বিশাল হীরার খণ্ড হতো, যার মূল্য অসামান্য! আপনি কীভাবে একে চোর-ডাকাত আর শত্রুর নজর থেকে বাঁচাতেন? ভেবে দেখুন বড় বড় কোম্পানি কিংবা জাদুঘরগুলোই বা কিভাবে তাদের অমূল্য রত্নের দেখাশোনা করে। তারা হয়তো সেটি পেলে বাক্সের মাঝে তালা মেরে রেখে দিত। এরপর সেই তালাবদ্ধ বাক্সকে কোনো নিরাপদ ধাতব কম্পার্টমেন্টে রাখা হতো, যেখানে থাকবে অত্যাধুনিক সব ডিভাইস। এরপর কম্পার্টমেন্টটি রাখা হবে অগ্নি-নিরোধক কোনো সিন্দুকে, সেখানেও থাকবে একাধিক নিত্যনতুন মেকানিজম। এর বাইরে থাকবে অদৃশ্য লেজার-বীম, সার্বক্ষণিক ক্যামেরার নজরদারি। কার সাধ্যি আছে এত কিছু পাড়ি দিয়ে হীরার কাছে পৌঁছানোর!

এবারে আপনার ঈমানকে সেই একই স্থানে কল্পনা করুন তো! ধাতব বাক্সটি হলো আপনার সালাত, ওযু হলো সে বাক্সের তালা। বাক্সটি ঘিরে আছে লোহার কম্পার্টমেন্ট, অগ্নি-নিরোধক সেইফ, লিভার মেকানিজম ইত্যাদি ইত্যাদি। চিন্তা করুন, এগুলো যেন একে একে আপনার ওপর আল্লাহর আদেশ-নিষেধ, আপনার ফরয ইবাদত, আপনার কষ্ট করে মেনে চলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এক একটি সুন্নাহ- আপনার করা যিকির, দিনভর দু'আ, আপনার নফল ইবাদত, তাহাজ্জুদ সালাহ, সাদাক্বাহ ইত্যাদি।

এর ওপর আছে অ্যালার্ম সিস্টেম, তা যেন আপনার কাজগুলো ধরে রাখার ব্যাপারে সতর্ক করছে। এমনি করে নিরাপত্তার যতোগুলো স্তর সেই বাক্সকে ঘিরে রেখেছে, সেগুলো দিয়ে আরও ভালো কিছু কাজ, আরো ভালো কোনো ইবাদতের কথা বোঝানো হচ্ছে, মানে এবং পরিমাণে। এই নেক আমল আর ইবাদতগুলোই আপনার ঈমানকে রক্ষা করবে।

শয়তান আপনার সবচেয়ে বড় শত্রু। প্রতিটি দিন, প্রতিটি মুহূর্তে সে এই চেষ্টাই করে চলেছে যে কীভাবে আপনার ঈমানকে ধ্বংস করে দেবে। কীভাবে আপনার ঈমানকে উপড়ে ফেলবে। কিন্তু সে একটি জিনিস জানে - সে জানে একলাফে আপনার হীরার মতো দৃঢ় ঈমানের ধারে কাছে আসা সম্ভব নয়। তাকে অনেকগুলো শক্তিশালী স্তর ভেদ করে এই অমূল্য ঈমানরত্নের কাছে পৌঁছুতে হবে। তাই সে ওঁৎ পেতে থাকে কখন আপনি আপনার নিরাপত্তা বলয়ে একটুখানি ঢিল দেবেন। আপনার একটি নেক আমল ছুটে যাওয়ার অর্থ আপনার নিরাপত্তার বলয়টি একটু করে খসে পড়া। আপনার দ্বারা একটি হারাম কাজ ঘটার অর্থ ঈমান বিনষ্টের দিকে শয়তানের এক ধাপ এগিয়ে আসা। আপনার গুনাহর আকার ও মাত্রা নির্ধারণ করবে শয়তান কতো বেশি তার লক্ষ্যের দিকে এগোতে সফল।

আপনার ঈমানকে সুরক্ষা দেওয়ার জন্য আপনি যত বেশি সংখ্যক স্তর তৈরি করবেন এবং সেগুলো যত বেশি মজবুত হবে, শয়তানের দ্বারা সেগুলো ভেঙে আপনার ঈমান-ভঙ্গের দিকে পৌঁছুনো হবে ততটাই কঠিন। আপনি যদি আপনার সালাতে ক্ষতি হতে দেন, যদি এমন হয় যে, আপনি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করছেন না, দেরী করে সালাহ আদায় করছেন কিংবা তাড়াহুড়ো করে পড়ছেন, তাহলে বুঝতে হবে এটি ভয়ানক বিপদের আভাস। ঈমান থেকে কুফরে পা দেওয়ার একেবারে শেষ বিন্দুতে হয়তো পৌঁছে গেছেন আপনি। ঈমান আপনার সবচেয়ে দামি সম্পদ। কোনো মানুষ, জ্বীন বা কোনো শক্তির সাধ্য নেই যে, সে আপনার সম্মতি ছাড়া আপনার সালাতকে ছিনিয়ে নেবে। এই পৃথিবীর ক্ষমতাধর লোকেরা হয়তো আপনার থেকে আপনার স্বাধীনতা, আপনার অর্থকড়ি, পরিবার, সম্পদ, ঘরবাড়ি বা আপনার শরীরের কিছু অঙ্গ-প্রত্যঙ্গঁকে কেড়ে নিতে পারবে, কিন্তু আপনার ঈমানকে কেড়ে নেওয়ার শক্তি কারো নেই।

ঈমানকে গড়ে তুলুন।

ঈমান গড়ে তুলুন, একে শক্তিশালী করুন, সমৃদ্ধ করুন এবং একবার একে গড়ে তোলার পর সযত্নে এর রক্ষণাবেক্ষণ করুন। প্রতিটি নিরাপত্তা কার্যক্রমের রক্ষণাবেক্ষণ দরকার। আপনি যদি কোনো নিরাপত্তা বলয়কে সঠিকভাবে দেখাশোনা করে রাখতে না পারেন, তাহলে শয়তানের সামনে একে খুলে দেওয়া হলো। আর তখন সে যদি আপনার ঈমানকে কেড়ে নিতে সফল হয়ে যায়, তাকে দোষ দিবেন না। দোষ দিন নিজেকে।

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ رحمه الله

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ ﷺ

কিছু মানুষকে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য তার নাম-পরিচয়-পেশাই যথেষ্ট নয়, বরং তারা বেঁচে আছেন তাদের অসামান্য কাজ, ত্যাগ এবং প্রজ্ঞার কারণে, ইসলামের ইতিহাসে এমনই এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব হলেন শাইখুল ইসলাম তাক্বি আদ-দীন আহমাদ ইবন তাইমিয়্যাহ ﷺ । তিনি ছিলেন একাধারে একজন আলেম, একজন মুজতাহিদ এবং একজন মুজাহিদ। তাঁর অসামান্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে যুক্ত হয়েছিল তাঁর নির্ভীকতা আর সত্য বলার সাহস; আর এটাই তাঁকে অন্য সকলের থেকে আলাদা করে দেয়। তিনি একাধারে শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদে নেতৃত্ব দিয়েছেন, ভ্রান্ত আক্বীদা-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছেন এবং সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় এসবের কোনোটিই তাঁকে তাঁর ‘ইলমের চর্চা থেকে বিরত রাখতে পারেনি, আর তাই তিনি এই উম্মাহকে উপহার দিয়েছেন শতাধিক মূল্যবান কিতাব, যার দ্বারা আজো উম্মাহ উপকৃত হচ্ছে। তিনি হতে পেরেছিলেন মুসলিমদের হৃদয়ের খুব কাছের একজন।

কিন্তু দুঃখজনক ইতিহাস এই, উম্মাহর অটল আস্থা দেখে ও ভালোবাসা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে অন্যান্য আলেম অন্ধ গোঁড়ামি ও জিদের বশে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন। যার পরিণাম স্বরূপ তাকে মিশরের কারাগারে অবরুদ্ধ হতে হয়। এই বইতে সংযুক্ত চিঠিগুলো তার মিশরের কারাগারে থাকাকালীন সময়ে লেখা চিঠি। কারাগারের রুদ্ধতা ও নিঃসঙ্গতাকে পাশ কাটিয়ে তিনি তাঁর মায়ের কাছে, ভাইদের কাছে ও সঙ্গীদের কাছে চিঠি লিখেছেন। তাঁর চরিত্রের ব্যক্তিগত কিছু দিক এ চিঠিগুলোতে ফুটে উঠেছে। ক্ষমাশীলতা, কর্তব্যপরায়ণতা, মায়ের প্রতি ভালোবাসা ইত্যাদি যা একজন মুসলিমের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত, সেগুলোই তাঁর মাঝে পরিলক্ষিত হয়।

কারাগারে থেকেও উনি কুরআন পড়তেন, তাফসীর রচনা করতেন এবং লেখালেখির কাজও অব্যাহত রাখেন। ফলে একসময় তাকে কলম ও খাতা দেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। তবে সুযোগ কেড়ে নিয়ে কখনোই ইবন তায়মিয়্যাহর ﷺ মতো মানুষদের থামানো যায়নি। উম্মাহর মাঝে তিনি যে আলো জ্বালিয়ে গেছেন, তা আজো সকল বাধা অতিক্রম করে আপন দীপ্তিতে ছড়িয়ে চলেছে।

পত্র ০১: মায়ের কাছে ইবন তাইমিয়্যাহর ﷺ চিঠি

(এই চিঠিতে তিনি মিশরে অবস্থান করার জন্য মায়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। দ্বীনের স্বার্থে তাঁকে তাঁর মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকার কারণে তাঁর অন্তরের ব্যাকুলতা এই চিঠিতে প্রকাশ পেয়েছে)

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

এ পত্র আমার সম্মানিত ও প্রিয়তম মায়ের কাছে তাঁর পুত্র আহমাদ ইবন তাইমিয়্যাহর পত্র। আল্লাহ ﷻ তাঁর ওপর সীমাহীন রহমত, প্রশান্তি ও স্বস্তি বর্ষণ করুন এবং তাঁকে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের তালিকায় স্থান দিন, আমীন!

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ, সকল প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য, তিনি সমস্ত প্রশংসার দাবীদার! আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো ইলাহ নেই, তিনিই প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দা ও রাসূল, নবীদের মোহর এবং মুত্তাকীদের ইমাম শেষ নবী মুহাম্মদের ﷺ ওপর রহমত বর্ষণ করুন।

নিঃসন্দেহে, আল্লাহর রহমত অপরিসীম! তাঁর সাহায্যের কোনো শেষ নেই! আল্লাহর ﷻ অফুরন্ত অনুগ্রহের জন্য লাখো শুকরিয়া জানাই; দু'আ করি যেন তিনি আমাদের ওপর আরো বেশি দয়া বর্ষণ করেন!

মা, আপনার নিশ্চয়ই অজানা নেই, অত্যন্ত জরুরি কারণেই মিশরে আজ আমার অবস্থান। এই কাজটি না করা হলে আমাদের দ্বীন ও জীবন ফিতনার মুখোমুখি হতো। আপনি তো জানেন, আমি তো কখনোই আপনার কাছ থেকে দূরে থাকতে চাইনি। যদি পাখির ডানায় ভর করে চলে আসা যেতো, তবে তাই করতাম। কিন্তু তাইমিয়্যাহ যে আজ আপনার কাছে নেই, তার একটা কারণ আছে। আপনি যদি মুসলিম উম্মাহর সামগ্রিক পরিস্থিতি গভীরভাবে বিবেচনা করতেন, তাহলে আমি নিশ্চিত যে, আপনি আমার সাথে দ্বিমত করতেন না, আজ যেখানে আছি সেখানেই আপনি থেকে যেতে বলতেন। তারপরেও, আমি এখানে স্থায়ীভাবে থেকে যাবো বলে নিয়ত করি নি। বরং আমি আল্লাহর কাছে চেয়েছি যেন আপনাকে ও আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দেন। আর আমি আল্লাহর কাছে আপনার সুস্থতার জন্যেও

দু'আ করি। আমি দু'আ করি তিনি যেন তাঁর রহমতের ছায়া দিয়ে আমাদের এবং বাকি সব মুসলিমকে ঢেকে রাখেন, আমাদের সবাইকে নিরাপদে রাখেন।

আল্লাহ তা'আলা আমার জন্যে তাঁর দয়া, করুণা, রহমত ও হিদায়াতের দরজাটি যে এভাবে খুলে দেবেন তা আমি কল্পনাও করতে পারি নি। তারপরেও আমি প্রত্যহই আপনার কাছে সফর করার চিন্তায় ইসতিখারা নামাজ পড়ে চলেছি। আমাকে যদি কখনো সুযোগ দেওয়া হয় যে আপনার কাছে আসতে চাই নাকি অন্য কোনো কাজ, তাহলে আমি নির্দ্বিধায় বলবো আপনার কাছে আসার বদলে দ্বীনের কম জরুরী বিষয় বা কোন দুনিয়াবী কাজকে প্রাধান্য দেওয়া আমি ভাবতেও পারি না। তবে এখনকার বিষয়টি আলাদা, এ কাজটি এতটাই গুরুত্ববহ যে তা ছেড়ে আমি আসতে পারছি না, কেননা এইমুহূর্তে মিশর ছেড়ে চলে আসার মাঝে সামগ্রিক ও ব্যক্তিগত ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে[১], এখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা এর সাক্ষী। তারা যা জানে, তা অন্যেরা অনুধাবন করবে না।

আমি আপনাকে অনুরোধ করবো যে, আপনি নিরলসভাবে আল্লাহর কাছে দু'আ করতে থাকুন! তাকে বলুন যেন তিনি দয়া করে আমাদের জন্য সবচেয়ে উত্তম পথটি নির্ধারিত করে দেন। কেননা তিনিই সর্বজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়, তিনি সবকিছু জানেন আর আমরা জানি না। এবং তিনিই সর্বশক্তিমান; আর আমরা তাঁর দুর্বল, অসহায় কিছু বান্দা। আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন:

> "ইসতিখারা করা এবং আল্লাহর ফায়সালায় খুশি হওয়া আদম সন্তানের জন্য এক আনন্দের বিষয়। আর ইস্তিখারা ছেড়ে দেওয়া এবং আল্লাহর ফায়সালায় অখুশি হওয়া আদম সন্তানের জন্য দুর্ভোগের বিষয়[2]"।

---

[1] ইবনে তাইমিয়্যাহকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরা তাঁর আক্বীদার ব্যাপারে ভ্রান্ত আক্বীদার অভিযোগ তুলেছিল। এপ্রসঙ্গে শাইখ মুহাম্মদ আবু যাহরাহ "ইবনে তাইমিয়্যাহ" গ্রন্থে মন্তব্য করেন, সাধারণ ক্ষতির আশঙ্কা বলতে বোঝানো হয়েছে, এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে উম্মাহর মাঝে ফিতনাহ এবং বিভ্রান্তি তৈরি হওয়া। আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে বিপদের আশঙ্কা বলতে বোঝানো হয়েছে, একজন আলেম হিসেবে তাঁর উপর উম্মাহকে দিকনির্দেশনা দেওয়ার দায়িত্ব রয়েছে। তিনি তা ছেড়ে আসলে, ব্যক্তিগত দায়িত্ব পালনে উদাসিনতা দেখানো হবে। উপরন্তু তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের এবং নিজেকে সঠিক প্রমাণের অধিকার আছে।

[2] শাইখ হামিদ আলফাকি এই হাদীস সম্পর্কে বলেছেন যে আত-তিরমিযী থেকে এটি বর্ণিত হয়েছে, হাদিসটি হাসান গারীব। আহমাদ থেকেও এটি বর্ণিত হয়েছে, আবু ইয়া'লা এবং আল-হাকিমের মতে এর ইসনাদ সহীহ। (আল-'উকুদ উদ-দুররিয়্যাহ, পৃ: ২৫৭)

নিশ্চয়ই মুসাফির ব্যবসায়ী তার অর্থকড়ি হারাবার ভয়ে কোনো স্থানে অবস্থান নেয় এবং সুযোগ বুঝে আবার যাত্রা আরম্ভ করে। আমাদের অবস্থাও এমন, মাঝপথে ছেড়ে চলে আসবার মতো নয় আর এই বিষয়টি এতটাই গুরুতর যে তা বুঝিয়ে বলতে পারা আমার সাধ্যের বাইরে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি বা ক্ষমতা নেই।

পরিশেষে বলবো, বাসার ছোট ও বড় সবাইকে আমার সালাম জানাবেন এবং প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনদের প্রত্যেকের কাছে এক এক করে আমার সালাম পৌঁছে দেবেন। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ!

সকল প্রশংসা আল্লাহর। মুহাম্মদ ﷺ, তাঁর পরিবার এবং সাহাবাদের رضي الله عنهم ওপর আল্লাহর عز وجل রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক!

পত্র ০২: ছাত্র ও ভাইদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ ﵀ -এর এই চিঠিটি দামেস্কে অবস্থানরত তাঁর ছাত্র ও ভাইদের উদ্দেশ্যে লেখা:

(শাইখুল ইসলাম ছিলেন সৎকাজে আদেশ এবং অসৎকাজে নিষেধের এক অনন্য প্রতীক। তাঁর প্রতি মানুষের অকৃত্রিম ভালোবাসা, অগাধ শ্রদ্ধা এবং আনুগত্য দেখে কিছু 'আলিম ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে মিশরের সুলতানকে তাঁর ব্যাপারে ক্ষেপিয়ে তোলে এবং ষড়যন্ত্র করে তাঁকে কারাবন্দী করায়। এতদসত্ত্বেও ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ ﵀ তাদের প্রতি কঠোরতা দেখাননি কিংবা তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তীতে প্রতিশোধ নেওয়ার সুযোগ সত্ত্বেও ক্ষমা করে দিয়েছেন। সে প্রেক্ষাপটেই এ চিঠিটি লেখা। আমরা দেখতে পাই এ চিঠিতে প্রজ্ঞা, মর্যাদা ও ক্ষমাশীলতার এক চমৎকার সমন্বয়।)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সত্যিই, সর্বাধিক প্রশংসার যোগ্য একমাত্র আল্লাহ, যিনি আমাকে বিশাল পুরস্কার দান করেছেন এবং অগাধ পাণ্ডিত্য দিয়েছেন যা আমাকে তার শুকরিয়া আদায় করতে এবং তার ইবাদাতে অবিচল থাকতে এবং যে কোনো পরিস্থিতিতে তার প্রতি কর্তব্য পালনে ধৈর্যশীল হতে বাধ্য করেছে। ধৈর্য ধারণ করা স্বয়ং একটি দায়িত্ব, যা কষ্ট অপেক্ষা স্বাচ্ছন্দ্যের সময় বেশি পালন করতে আল্লাহ ﷻ আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন-

> "আমি যদি মানুষকে (একবার) আমার রহমতের স্বাদ আস্বাদন করাই এবং পরে (কোনো কারণে) যদি তা তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিই, তাহলে সে নিরাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়ে। আবার কোনো দুঃখ-দৈন্য তাকে স্পর্শ করার পর যদি তাকে আমি অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই, তখন সে বলতে শুরু করে (হ্যাঁ), এবার আমার থেকে সব বিপদ-মসিবত কেটে গেছে, (আসলে) সে (অল্পতেই যেমন) উৎফুল্ল (হয়ে উঠে, তেমনি সহজেই আবার) অহংকারী (হয়ে যায়), কিন্তু যারা পরম ধৈর্য ধারণ করে এবং নেক আমল করে, এরাই হচ্ছে সেসব লোক, যাদের জন্যে রয়েছে (আল্লাহর) ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।" [সূরা হুদ, ১১: ৯-১১]

হে আমার ভাইয়েরা, তোমরা তো জান যে আল্লাহ, যিনি শক্তিতে সমুচ্চ, তিনি এমন এক ব্যাপারে[৩] আমাকে অনুগ্রহ করেছেন, যে অনুগ্রহ তিনি সাধারণত তার সৈনিকদের জন্য সংরক্ষণ করে রাখেন তার বাণীকে সমুন্নত করার জন্য, তার দ্বীনকে বিজয়ী করার জন্য, আহলুল-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ কে শক্তিশালী করতে এবং বিদ'আত ও গোমরাহিতে[৪] নিমজ্জিত মানুষদের অপদস্থ করার জন্য। সুন্নাহ থেকে উৎসারিত দিকনির্দেশনা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। এর মাধ্যমে অসংখ্য মানুষকে সত্য বোঝান সম্ভবপর হয়েছে এবং তারা আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ এর পথে ফিরে এসেছে। তোমাদের জেনে রাখা উচিত এ দ্বীনের এক গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো মুসলিমদের হৃদয়কে এক করা এবং তাদের চাওয়ার মাঝে সঙ্গতি সৃষ্টি করা। মহান আল্লাহ্ বলেন-

> "তোমরা আল্লাহ্ তায়ালাকে ভয় করো এবং (এ নির্দেশের আলোকে) নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক সংশোধন করে নাও।" [সূরা আল 'আনফাল, ৮: ১]

> "তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং কখনো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১০৩]

> "তোমরা (কখনো) তাদের মতো হয়ে যেয়ো না, যাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন আসার পরও তারা বিভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে এবং (নিজেদের মধ্যে) নানা ধরনের মতানৈক্য সৃষ্টি করেছে।" [সূরা আলে ইমরান, ৩:১০৫]

একইভাবে, সুন্নাহর মূলভাবগুলোর একটি হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আনুগত্য। এইজন্য, মুসলিম এ বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে এসেছে, আবু হুরায়রা কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন –

---

[৩] তাঁর বিচার ও পরবর্তীতে মিশরে তাঁর কারাবন্দীর ঘটনার প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। এ ঘটনার মাধ্যমে যদিও তিনি আপাতদৃষ্টিতে পরীক্ষিত ও শাস্তিপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন, তথাপি এর মাধ্যমে একটি বিরাট কল্যাণ কারাগারকে আলোকিত করে এবং তার দাও'আহ এমন একটি জায়গায় পরিচিতি লাভ করে যা পূর্বে কখনো ঘটেনি।

[4] ইবনে তাইমিয়্যাহ তাদের আহলু-বিদ'আ ওয়াল-ফিরকা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

> “আল্লাহ তোমাদের উপর তিনটি কারণে সন্তুষ্ট হন। (প্রথমত) যখন তোমরা তাঁর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করো। (দ্বিতীয়ত) যখন তোমরা সকলে মিলিত ভাবে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর থেকে বিচ্যুত না হও এবং (তৃতীয়ত) যখন তোমরা ভালো শাসকদের পরামর্শ দাও যাদেরকে আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত করেছেন।”

এছাড়াও, জায়িদ বিন থাবিত ﷺ এবং ইবনে মাস‘উদ ﷺ, যারা ছিলেন ‘আলিম সাহাবি তাদের থেকে বর্ণিত যে, আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন–

> “আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কথা শোনে এবং অন্যদের কাছে তা পৌঁছে দেয়। এমনটা হতেই পারে, জ্ঞানের বাহক নিজে জ্ঞানী নয়, অথবা যার কাছে সে জ্ঞান পৌঁছে দিচ্ছে, সেই ব্যক্তি জ্ঞানের বাহক অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী। তিনটি জিনিস মুসলিমদের হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করে। ইখলাস বা আল্লাহর জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করা, শাসকবর্গদের উপদেশ দেওয়ার দায়িত্বভার গ্রহণ করা এবং মুসলিমদের সাথে জামাতবদ্ধ থাকা”।

এই নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে ব্যক্তিগত অবস্থান থেকে আমি এই কথাই বলব, আমি চাই না আমার জন্য কোনো মুসলিম প্রকাশ্যে অথবা অপ্রকাশ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হোক। এটি সকল মুসলিমদের জন্যই প্রযোজ্য তবে আমাদের সহযোগী ও পরিচিত ভাইদের জন্য আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। তারা নিন্দিত হোক বা দোষী সাব্যস্ত হোক - এর কোনোটিই আমি চাই না, কেননা তারা সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। বস্তুত, মানুষ তিনটি শ্রেণীর মধ্যে যেকোনো এক শ্রেণির অন্তর্গত হবেই: একজন সঠিক মুজতাহিদ, যিনি তার সঠিক ইজতিহাদের কারণে পুরস্কৃত হন, দ্বিতীয়ত একজন ভ্রান্ত মুজতাহিদ, যিনি পুরস্কৃত হন তবে তার ভুলের জন্য ক্ষমাপ্রাপ্ত হন এবং তৃতীয় শ্রেণি হলো একজন পাপী। তৃতীয় শ্রেণি সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যেন আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন, আমাকে এবং বাকি সকল মুসলিমদেরও ক্ষমা করেন[৫]।

---

[৫] এটি ক্ষমার একটি মহৎ দৃষ্টান্ত, এবং এটি শুধুমাত্র এমনই একজন বিদ্বান ব্যক্তি প্রদর্শন করতে পারেন যিনি সন্দেহাতীতভাবে রাসূলদের নীতি পুরুষানুক্রমে আয়ত্ত করতে পেরেছেন।

সুতরাং, যারা ভুল করেছে এবং উপরোক্ত নীতির অনুসরণ করেনি আমরা তাদের সাথে আরও ভালো ব্যবহার করব[৬]। যদিও আমি তাদের সম্পর্কে জানি যারা বলবে "এই ব্যক্তি ভুল করেছে" এবং "এই ব্যক্তি যা তার করা উচিত ছিল তা করেনি", অথবা "শায়খের ক্ষতির জন্য এই ব্যক্তিই দায়ী"। যে কথার কারণে ভাইয়েরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেগুলো আমি ক্ষমা করছি না, আর যারা এসব কথা বলে আমি তাদেরও ক্ষমা করছি না।

তোমাদের এটাও জেনে রাখা উচিত যে, আমরা একে অপরকে সহযোগিতা করার জন্য সকলে একত্রিত হয়েছি, আর পূর্বের যেকোনো সময়ের চেয়ে আজ আমাদের পরস্পরের সহযোগী হওয়া জরুরি হয়ে পড়েছে। সুতরাং দামেস্ক ও মিশরে যে অপরাধ তারা করেছে তার জন্য তাদের ক্ষতিসাধন করা ভুল হবে। সত্য এই যে, দুই মু'মিনের তুলনা হলো দুই হাতের ন্যায়, যা একে অপরকে পরিষ্কার রাখে। এবং এও সত্য যে কিছু ময়লা শুধুমাত্র কঠিনভাবে ঘষামাজার মাধ্যমেই পরিষ্কার করা সম্ভব, তবে কঠোরতা তখনই অনুসরণীয় যদি তা মুসলিমদের মাঝে ভালোবাসা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম বলে প্রতীয়মান হয়। কোনো মু'মিন যেন অন্য মু'মিনকে সাহায্য করতে কৃপণতা না করে। আমাদেরই কিছু ভাই যদি অতীতে আমাদেরকে অবজ্ঞা করেও থাকে, তারা আমাদের কাছে ফিরে এসেছে আর তাই তাদের মর্যাদা আজ আরো উন্নীত হয়েছে। আর তোমাদের জেনে রাখা উচিত, ঈমানদারদের মাঝে এ ধরনের ভুল বোঝাবুঝি শয়তানের ওয়াসওয়াসাতেই হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন,

> "অবশেষে মানুষই তা বহন করে নিল; নিঃসন্দেহে সে (মানুষ) একান্ত যালেম ও (এ আমানত বহন করার পরিণাম সম্পর্কে) একান্তই অজ্ঞ। আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ, মুশরিক নারীদের (এ আমানতের দায়িত্বে অবহেলার জন্যে) কঠোর শাস্তি দেবেন এবং মুমিন পুরুষ, মুমিন নারীদের উপর (আমানতের দায়িত্ব পালনে ভুল ত্রুটির জন্যে) ক্ষমাপরবশ হবেন; নিঃসন্দেহে

---

[৬] তিনি সম্ভবত দামেস্কে অবস্থানরত তার সেই ভ্রাতৃগণ ও সহযোগীদের প্রতি নির্দেশ করেছেন যারা এই ফিতনায় দৃঢ়তার পরিচয় দেয়নি এবং তাদের শায়খের কথা শোনেনি। তিনি তাঁর সহযোগীদের তাদের ক্ষতি করতে নিষেধ করেছেন এবং একই সাথে তাদের প্রতি তার কোনও খারাপ অনুভূতি নেই এই কারণে তিনি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন। এর পরিবর্তে তিনি তাদের উপযুক্তভাবে সম্মান করেন এবং তাদেরকে আল্লাহর জন্যই ভালোবাসেন।

> আল্লাহ তা‘আলা একান্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।” [সূরা আল আহযাব, ৩৩: ৭২-৭৩]

এমনকি, যত বাড়াবাড়ি হয়েছে এবং ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে[৭], সেগুলো ভালোর জন্যই, আল্লাহ বলেন,

> “যারা এ (নবী পরিবার সম্পর্কে) মিথ্যা অপবাদ নিয়ে এসেছে, তারা তো (ছিল) তোমাদের একটি (ক্ষুদ্র) দল; এ বিষয়টি তোমরা তোমাদের জন্য খারাপ ভেবো না; বরং (তা হচ্ছে) তোমাদের জন্য (একান্ত) কল্যাণকর, এদের মধ্যে প্রতিটি ব্যক্তি যে যতটুকু গুনাহ করেছে (সে ততটুকুই তার ফল পাবে), আর তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি (এ কাজে) অংশগ্রহণ করেছে, তার জন্যে আযাবও রয়েছে অনেক বড়।” [সূরা আন-নূর, ২৪: ১১]

যারা আমার সাথে অন্যায় করেছে, আমি তাদের ক্ষমা করে দিয়েছি। যারা আল্লাহর হক্ব নষ্ট করেছে, তারা যেন আল্লাহর কাছে তাওবা করে, আল্লাহ তাদের ক্ষমা করে দেবেন। তারা যদি তা না করে, তবে আল্লাহর বিধান তাদের উপর প্রয়োগ করা হবে। যদি মানুষকে তাদের ভুলের জন্য ধন্যবাদ দেওয়া হতো, তবে আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিতাম কেননা এই ভুলের মাঝে আমাদের কল্যাণ নিহিত আছে দুনিয়া এবং আখিরাতে[৮]। কিন্তু সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর ফায়সালার মাঝে কল্যাণ সন্ধান করা উচিত। ঠিক একই ভাবে, যাদের নিয়ত সহীহ এবং যারা ভালো কাজ করে তারা ধন্যবাদ এবং প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু যারা খারাপ কাজ করে, আমরা আল্লাহকে বলি তিনি যেন তাদেরকে ক্ষমা করে দেন।

তথাপি, বান্দার হক্ব এবং আল্লাহর হক্ব, সবই আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে এবং এ ব্যাপারে তার ফায়সালাই চূড়ান্ত।

---

[৭] ভুল বোঝাবুঝি বলতে এখানে বলা হয়েছে, ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহর কথাকে বক্রভাবে উপস্থাপন করা এবং তাঁর সাথে অন্য ‘আলিমদের আপত্তিকর আচরণের কথা।

[৮] কল্যাণ বলতে তিনি বোঝাচ্ছেন বিদআতীদের গোমরাহী তুলে ধরা এবং প্রকৃত সত্যকে মানুষের কাছে উপস্থাপন করার বিষয়টি, যা এই ঘটনার সূত্র ধরে ঘটেছে।

আমাদের ইফকের[৯] ফিতনা ভুলে যাওয়া উচিত নয়, যে ঘটনায় আবু বকর আস-সিদ্দীক্ব ﵁ এর একটি সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কুরআনে আয়াত নাযিল হয়। আবু বকর ﵁ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তিনি মিসতাহ ইবন আছাছাহকে আর কখনো সাহায্য করবেন না যা তিনি ইতিপূর্বে করে আসছিলেন। এর কারণ 'আইশা ﵂ এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ ছড়াবার সাথে এই মিসতাহ জড়িত ছিলেন, কিন্তু আল্লাহ বলেন,

> "তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্নীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষক্রটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা কর না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।" [সূরা আন-নূর, ২৪: ২২]

এই আয়াত নাযিল হবার পর আবু বকরের প্রতিক্রিয়া ছিল, "অবশ্যই! আল্লাহর শপথ, আমি চাই আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করুন"। আবু বকর ﵁, মিথ্যা অপবাদের শিকার 'আইশা ﵂ এর পিতা, এরপরই, মিসতাহকে সাহায্য করতে ছুটে যান।

> "হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোনো তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ-তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী। তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রসূল এবং মুমিনবৃন্দ-যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র। আর যারা আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী।" [সূরা আল মায়িদা, ৫: ৫৪-৫৬]

---

[৯] ইফক্ব হল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী 'আইশার ﵂ সতীত্বের ব্যাপারে মদীনার মুনাফিক্বদের মিথ্যা অপবাদের কাহিনী।

ওয়া 'আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

এবং সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সমগ্র বিশ্বের অধিপতি, শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক আমাদের নেতা মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর।

পত্র ০৩: সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি

আলেক্সান্দ্রিয়ার কারাগার থেকে সঙ্গীদের উদ্দেশ্যে লেখা শাইখ উল ইসলামের চিঠি:

(এ চিঠিতে তিনি তার সঙ্গীদেরকে আল্লাহর দিকে ফিরে যাওয়া এবং তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করার জন্য নাসীহা দিয়েছেন।)

পরম করুণাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

> "অল্পদিনের মধ্যেই তোমার মালিক তোমাকে (এমন কিছু) দেবেন যে, তুমি (এতে) খুশী হয়ে যাবে।" [সূরা আদ দুহা, ৯৩: ৫]

দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ আমার সঙ্গীদের রহম করুন, আমি তোমাদের বলতে চাই, এই কারাগারে আমি এক পরম সুখে আছি যা আগে কখনও ছিলাম না। মহান আল্লাহ তাঁর প্রাচুর্যের দরজা আমার জন্য প্রশস্ত করে দিয়েছেন। আল্লাহর এই অনুগ্রহ কেবলমাত্র তারাই ভোগ করতে পারবে যারা সত্যিকারের ঈমান ও তাওহীদকে উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং যারা লাভ করেছে এমন দুটি জিনিস যা লোকেরা আকাঙ্ক্ষা করে: ঈমান এবং 'ইলম। এই আনন্দ, তৃপ্তি আর উত্তেজনার কথা তোমাদের আমি বলে বোঝাতে পারব না, কেবল আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং শুধুমাত্র সঠিক উপায়ে তাঁরই ইবাদাত করলেই এগুলো লাভ করা সম্ভব। বস্তুত এগুলো পরম ক্ষমতাবান ও মর্যাদাসম্পন্ন আল্লাহ প্রদত্ত উচ্চতর আধ্যাত্মিক প্রাজ্ঞতা আর জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ।

এক শাইখ বলতেন, "মাঝে মাঝে আমি নিজের আনন্দ দেখে অবাক হই, জান্নাতীরাও যেন ভাগ্যবান যদি তারা এমন সুখ পেতে পারে"। আরেক শাইখ বলতেন, "এমন কিছু সময় আছে যখন 'ইলম ও ঈমান আমার হৃদয়কে আনন্দে ভাসিয়ে দেয়। দুনিয়ার অনুগ্রহ কখনোই পরকালের অনুগ্রহের সমান নয়, তবে এই মুহূর্তগুলোর কথা ভিন্ন"। রাসূল ﷺ তাই বিলালকে বলতেন, "হে বিলাল, আমাদেরকে স্বস্তি দাও তোমার আযান দ্বারা"।

নীরস লোকেরা বলতে পারে, সালাতের মাঝে স্বস্তি খোঁজার কী আছে? কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বলেন,

> "ধৈর্যের সাথে সাহায্য প্রার্থনা কর নামাযের মাধ্যমে। অবশ্য তা যথেষ্ট কঠিন। কিন্তু বিনয়ীদের পক্ষেই সম্ভব।" [সূরা বাকারা, ২: ২৪৫]

খশিয়া হলো আল্লাহর কাছে পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এটি হলো অন্তরের এক প্রশান্ত অবস্থা যা উৎসারিত হয় আল্লাহর উপর আন্তরিক ও বাহ্যিক ভরসা থেকে। রাসূল ﷺ বলতেন, **"দুনিয়ার নারী আর সুগন্ধী থেকেও আমার কাছে তা অধিক প্রিয়",**

এরপর তিনি বলতেন,

"যা হলো সেই শান্তি ও আনন্দ, যার উৎস সালাহ"।

লোকেরা এই হাদীসের প্রথম অংশ বলেই থেমে যায়, অথচ আল্লাহর রাসূল ﷺ প্রথম কথাটি বলেই থেমে যাননি, ইমাম আহমাদ বা ইমাম নাসা'ঈ কেউই তা করেননি। তারা এই কথার ব্যাখ্যা করেছেন যে, মনোযোগ সহকারে ইবাদাতের যে আনন্দ, তা দুনিয়ার অন্য যেকোনো কিছু (নারী, সুগন্ধী) থেকে অধিক অর্থপূর্ণ।

হৃদয়ের মাঝে নফসের কুমন্ত্রণা বাসা বাঁধে। শয়তান মনের কামনা-বাসনাকে উস্কে দেয় আর আকর্ষণীয় ভাবে উপস্থাপন করে মানুষের কাছে। সে মনের মাঝে সন্দেহের বীজ বপন করে আর জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে অন্য কিছুকেও ভালোবাসে, তীব্র যন্ত্রণা তাকে গ্রাস করে দুনিয়া এবং আখিরাতে। যদি সে ব্যক্তি নিজের লালসা অবৈধ পন্থায় পূর্ণ করে, তবে সে শাস্তি লাভ করবে, আর যদি সে নাও করে, তবু নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা ও কষ্ট তাকে পেয়ে বসবে, কেননা তার হৃদয় আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুকে ভালোবেসেছে।

কাজেই পরিপূর্ণ সুখ এবং পরম আনন্দের দেখা মিলবে না যদি না কেবল আল্লাহকে ভালোবাসা হয় এবং তাঁর আদেশ পালন করা হয়। আর এই ভালোবাসা হৃদয়ে জন্ম নেবে তখনই যখন অন্য সবকিছুকে ত্যাগ করা হয় আর এটাই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর দাবি। এটাই ইবরাহীম عليه السلام এবং অন্য সকল নবীর عليهم السلام দাওয়াতের মূলকথা। নবী মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর সাহাবিদের رضي الله عنهم উদ্দেশ্যে বলতেন,

> "বল, আমরা আছি ইসলামের ফিতরাতের উপর, ইখলাসের উপরে, আমাদের নবী মুহাম্মদ ﷺ আনীত দ্বীনের উপরে, আমাদের পিতা

> ইবরাহীমের দেখানো পথের উপর, যিনি সত্যিকারের বিশ্বাসী ছিলেন এবং কখনোই মুশরিক ছিলেন না”।

তথাপি মানুষ বড়ই দুর্বল ও অজ্ঞ, তাদের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ বলেন-

> “আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার সামনে এই আমানত পেশ করেছিলাম, অতঃপর তারা একে বহন করতে অস্বীকার করল এবং এতে ভীত হলো; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয়ই সে জালেম – অজ্ঞ।” [সূরা আল আহযাব, ৩৩: ৭২]

সুতরাং যারা আল্লাহর প্রতি, তাঁর সাফল্যপ্রাপ্ত ও বিজয়ী বাহিনীর প্রতি অনুগত, তাদের লক্ষ্য হলো তাওবা, অনুশোচনা। আর তাই এই দ্বীন হলো আল্লাহর এককত্বের দৃঢ়োক্তিজ্ঞাপন ও তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনার এক মিশেল।

> “...তোমাদের মাবুদ হচ্ছেন একজন, অতএব তাঁর ইবাদতের দিকেই সোজা হয়ে থাক এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর...” [সূরা ফুস্‌সিলাত, ৪১: ৬]

কাজেই, আদেশ পালন এবং নিষেধ থেকে দূরে থাকা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা তাওহীদের অংশ। যখন আল্লাহর কোনো বান্দা তাওহীদ দ্বারা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহর উপর তার পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা থাকে, তখন আল্লাহও তাকে রক্ষা করেন, তাকে সুখ ও আনন্দ দান করেন এবং তাকে করুণা করেন। বিপরীতক্রমে, যারা শিরক করে, ভয় তাদের হৃদয়কে গ্রাস করে নেয় যেমনটা আল্লাহ বলেছেন, যারা একগুয়েঁমি করে সত্যকে অস্বীকার করে তাদের হৃদয়ে,

> “খুব শীঘ্রই আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করবো” [সূরা আলে ইমরান, ৩: ১৫১]

একইভাবে একটি সহীহ হাদিসে পাওয়া যায়-

> “দুর্ভোগ তাদের, যারা দিনারের পূজারী, দুর্ভোগ তাদের, যারা দিরহামের পূজারী। দুর্ভোগ তাদের যারা লোক দেখানো পোশাকের পূজারী এবং দুর্ভোগ তাদের যারা বাহারি পোশাকের পূজারী। তার

উপর আপতিত হোক কষ্ট আর দুর্দশা, সে যদি কখনও বিপদে পড়ে, তবে কখনোই যেন রেহাই না পায়"।

যখন আল্লাহর নবী ইবরাহীম ﷺ কে মূর্তি দ্বারা শাসানো হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন,

"তোমরা যাকে আল্লাহ তা'আলার সাথে অংশীদার বানাও, তাকে আমি কীভাবে ভয় করবো, অথচ তোমরা আল্লাহ তা'আলার সাথে অন্যদের শরীক করতে ভয় পাও না, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা কোনো প্রমাণপত্র তোমাদের কাছে পাঠাননি; (এ অবস্থায় তোমরাই বলো,) আমাদের এ উভয় দলের মধ্যে কোন দলটি (দুনিয়া ও আখিরাতে) নিরাপত্তার অধিকারী? (বলো!) যদি তোমাদের কিছু জানা থাকে।" [সূরা আল আন'আম, ৬: ৮১]

এজন্যেই ইমাম আহমাদ ﵀ এক লোককে বলেছিলেন, "যদি তোমার বিশ্বাস সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে তোমার কাউকে ভয় করা উচিত না"। অধিকন্তু প্রতিটি আমল যা মুসলিমরা রাসূলুল্লাহর ﷺ নির্দেশ অনুযায়ী করে থাকে, তাতে তারা প্রতিদান পাবে আল্লাহর এ আয়াত অনুসারে,

"তুমি দুশ্চিন্তা করো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" [সূরা আত-তাওবা, ৯ : ৪০]

আমরা অনেকবার দেখেছি এবং উপলব্ধি করেছি, আমাদের সাথে আল্লাহ ছিলেন। তিনি কুরআনে বলেছেন তিনি থাকবেন এবং তাঁর সাহায্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হবে। বিপরীতভাবে, মুহাম্মাদ ﷺ কে যে প্রত্যাখ্যান করবে, তার প্রতিদান হবে নিম্নরুপ:

"নিশ্চয়ই তোমার প্রতি শত্রুতা পোষণকারীই শিকড়-কাটা (যাবতীয় কল্যাণ থেকে)।" [সূরা আল-কাউসার, ১০৮ : ৩]

আবু বাকর ইবন 'আয়াশ বলেছেন, "আহলুস সুন্নাহরা বেঁচে থাকেন এবং বেঁচে থাকে তাঁদের মর্যাদা। অপরদিকে বিদ'আতীদের মৃত্যুর সাথে সাথেই তাদের মানুষ ভুলে যায়। এর কারণ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা সেটা পছন্দ করে

না। তাই তাদেরকে সেভাবেই নির্বংশ করে ফেলা হয়’’। যারা রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাহ প্রচার করে তারা আল্লাহর ওয়াদার অংশীদার হবে:

> “আর আমি তোমার (মর্যাদার) জন্য তোমার স্মরণকে সমুন্নত করেছি।” [সূরা আল-ইনশিরাহ। ৯৪ : ৪]

পরিশেষে বলতে চাই, এখানে থাকা অবস্থায় আল্লাহ আমাকে যে বরকত দিয়েছেন তা ছিল প্রাচুর্যময় এবং আমি তাঁর নি’আমাতরাজি গুণতে অক্ষম। তবে সঙ্গীসাথীদের থেকে আমার দূরত্ব আমাকে পীড়া দেয় কেননা আমি চাই তারা যেন সেই আনন্দ ও সুখ অর্জন করুক যার জন্যে তারা সংগ্রাম করে। আর আমি চাই তারা যেন আল্লাহর প্রতি আরও অনুগত হয়ে যায় এবং জিহাদের মাধ্যমে সর্বোচ্চ মর্যাদা হাসিল করে নেয়।

আমি আমার সঙ্গীসাথীদের বলতে চাই যে, আমার উপর আল্লাহর নি’আমাতরাজি বেড়েই চলেছে। যদিও আমি তাদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে থাকতে না পারি এবং তাদের সাহায্য না করতে পারি, তবুও আমি রাত-দিন আল্লাহর কাছে তাদের মঙ্গল কামনা করে দুআ করে যাচ্ছি তাদের প্রতি দায়িত্বস্বরূপ। আমি তাদের প্রত্যেককে নির্দেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করতে এবং তাঁর প্রতি সচেতন হতে, একমাত্র তাঁরই ওপর ভরসা করতে, তাঁর পথে জিহাদ করতে এবং তাদের প্রত্যেকের দু’আ এবং আমলসমূহ যেন হয় আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ﷺ এর নির্দেশ অনুসারে।

হে আল্লাহ! সকল মু’মিন-মু’মিনাদের প্রতি ক্ষমাশীল হোন! তাদের অন্তরকে একাত্ম করুন এবং তাদের মধ্যকার পার্থক্যসমূহ দূরীভূত করুন। আপনার ও তাদের শত্রুদের বিপক্ষে তাদের বিজয়ী করুন এবং প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল গুনাহসমূহ থেকে তাদের মুক্ত রাখুন।

হে আল্লাহ! সাহায্য করুন আপনার দ্বীন, কিতাব এবং মু’মিন বান্দাদের। হে আল্লাহ! কুফফার ও মুনাফিকদের শাস্তি দিন যারা আপনার পথে বাধা সৃষ্টি করতে চায় এবং দ্বীনকে বদলে দিতে চায়।

হে আল্লাহ! সীমালংঘনকারীদের উপর আপনার অবিরত আযাব দিন। হে আল্লাহ! মেঘসমূহের সঞ্চালনকারী, কুরআন নাযিলকারী এবং জোটবদ্ধদের উপর

আঘাতকারী! তাদের আঘাত করুন, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিন, তাদের পায়ের নীচের মাটি কাঁপিয়ে দিন এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ! আমাদের সহায়তা করুন এবং আমাদের বিপক্ষে কাউকে সহায়তা করবেন না। আমাদের পক্ষে পরিকল্পনা করুন এবং আমাদের বিপক্ষে নয় এবং আমাদের সাহায্য করুন জালিমদের পরাস্ত করতে।

হে আল্লাহ! আমাদের অন্তর্ভুক্ত করুন কৃতজ্ঞ, অনুগত বান্দাদের মাঝে এবং যারা আপনার কাছেই ফিরে যাবে তাদের মাঝে।

হে আল্লাহ! আমাদের তাওবা কবুল করুন এবং আমাদের গুনাহসমূহ মুছে দিন। আমাদের বিচারবুদ্ধিকে শক্তিশালী করুন এবং আমাদের জিহ্বাকে সংশোধন করে দিন। আর আমাদের অন্তরের রোগসমূহকে দূরীভূত করে দিন।

আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, সুন্নাহর প্রতি সাহায্যে যিনি সদা অবিচল, বিদ'আতীদের জন্যে যার শাস্তি স্পষ্ট এবং অবশ্যম্ভাবী। রাহমাত ও শান্তি বর্ষিত হোক মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার এবং সাহাবিগণের ﷺ ওপর।

আমরা কি শুধুই দু'আ করে যাব?

আমরা কি শুধুই দু'আ করে যাব?

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম

> "নিঃসন্দেহ তাঁরা সৎকাজে প্রতিযোগিতা করত, তাঁরা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তাঁরা আমার কাছে বিনয়ী ছিল।" [সূরা আম্বিয়া, ২১: ৯০]

কারাগারে আসার পর থেকে আমি অনেকগুলো চিঠি পেয়েছি। এ চিঠিগুলোর মূলভাবও খুব কাছাকাছি আর তা হলো দু'আ ব্যতীত অন্য কিছু করতে না পারার অক্ষমতা। "আমরা খুব অসহায়, দু'আ ছাড়া আমাদের কিছু করার নেই" বা "আমাদের কিছু করার নেই, তাই আমরা তোমার জন্য শুধু দু'আই করছি" - প্রায়ই এরকম অনেক কথা আমরা শুনতে পাই। এসকল কথাবার্তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করে আমি কিছু অসারতা খুঁজে পেয়েছি।

শুরুতেই বলে নেই দু'আ অন্যতম একটি ইবাদাত যা আল্লাহর কাছে খুবই প্রিয়। এক মুসলিম অপর মুসলিম ভাইকে দিতে পারে এমন সর্বোত্তম উপহার হচ্ছে দু'আ। দু'আ হচ্ছে মু'মিনের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। এটি দিয়ে মু'মিন সকল জুলুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে। তবে আমরা কুরআন বা হাদীসে বাহ্যিক প্রচেষ্টা ছাড়া শুধু দু'আর উপস্থিতি খুব কমই দেখতে পাই। বরং কুরআন, হাদীস, রাসূল ﷺ এর জীবন, সাহাবাদের ﷺ জীবন বা সালাফদের জীবনে আমরা প্রায় সকল ক্ষেত্রেই দু'আকে বাহ্যিক কাজের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় দেখতে পাই। তাঁরা সকলেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দু'আ করেছেন এবং সে অনুযায়ী কাজ করেছেন।

উদাহরণস্বরূপ, উহুদের যুদ্ধে রাসূল ﷺ এবং মুসলিমরা মদীনায় বসে থেকে দু'আ করেননি বরং তারা শত্রুকে মোকাবেলা করার জন্য উহুদের ময়দানে জড় হয়েছেন। এরপর যুদ্ধের শুরুতে, যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এবং যুদ্ধের শেষে প্রতিটা সময় দু'আ করেছেন। মদীনাতে কর্তৃত্ব অর্জন করার পর রাসূল ﷺ ইসলামকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য শুধু বসে বসে দু'আ করেননি বরং তিনি বিভিন্ন প্রচারক, আলিম ও দা'ঈ কে ইসলামের দিকে ডাকার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেছেন

এবং এসকল চেষ্টার শুরুতে এবং শেষে তিনি দু'আ করেছেন। কুরআন এবং হাদীসে এরকম আরও অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে।

উপরে বর্ণিত আয়াতে আল্লাহ ﷻ চেষ্টার সাথে দু'আকে উল্লেখ করেছেন। তিনি চেষ্টা ছাড়া শুধুমাত্র দু'আকে উল্লেখ করেননি। প্রচেষ্টা ছাড়া দু'আকে তখনই উপস্থাপন করা হয়েছে যখন অন্য সকল প্রচেষ্টার পথই বন্ধ থাকে।

ব্যাপারটা আরও ভালোভাবে বুঝার জন্য ইউনুস ﵇ কে উদাহরণ হিসেবে চিন্তা করা যায়। ইউনুস ﵇ মাছের পেটে থাকা অবস্থায় শুধুমাত্র দু'আই করেছেন কারণ তখন তাঁর পক্ষে দু'আ ছাড়া অন্য কিছু করা সম্ভব ছিল না। মূসা ﵇ যখন ফিরআউন ও সমুদ্রের মাঝখানে আটকা পড়েছিলেন তখন তিনি শুধুমাত্র দু'আই করেছেন কারণ উনি ইতিমধ্যে সাধ্যের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছেন আর তখন অন্য কোনো কিছু করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। এমনিভাবে রাসূল ﷺ তায়েফের লোকদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে উপহাস, বিদ্রুপ এবং তাদের মারধর সহ্য করেছেন। যখন রক্ত রাসূল ﷺ এর জুতার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়া শুরু করল তখনই তিনি দু'আ করা শুরু করেন। পাহাড়ের গুহায় আটকে থাকা তিন ব্যক্তির গল্পেও আমরা দেখি যে, প্রত্যেকেই শুধু দু'আই করেছেন কারণ তাদের পক্ষে এই বিশাল পাথরকে সরানোর জন্য অন্য কোনো কাজ করা সম্ভব ছিল না।

তাই, আমরা যদি আমাদের জীবনের দিকে লক্ষ করি তাহলে আমরা আমাদের দু'আ এবং প্রচেষ্টার মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাব। জীবিকা অর্জনের জন্য আমরা কেউই শুধুমাত্র ঘরে বসে দু'আ করি না। পোশাক বা সম্পদ কেনার জন্যও করি না। আমাদের ঘরবাড়ি সাজানোর জন্যও আমরা শুধুমাত্র দু'আ করি না। এসকল ক্ষেত্রেই আমরা দু'আর সাথে সাথে চেষ্টাও করি। কিন্তু যখনই অপর মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য বা মুসলিম বন্দিদের জন্য সাহায্যের বিষয়গুলো আসে তখন আমরা আমাদের ভোল পাল্টাই। আমরা কোনো চেষ্টা না করে শুধুমাত্র দু'আই করে যাই। আমাদের এ কাজকে সমর্থন করার জন্য হাস্যকর যুক্তি দেখাই।

আমার এ বন্দি জীবন ২০০৪ সালের অগাস্ট মাস থেকে শুরু হয়েছে। তখন থেকেই আমার পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই আমাকে মুক্ত করার জন্য দিনরাত চেষ্টা করে যাচ্ছেন। আমার মুক্তির জন্য কখনও প্রচারণা চালাচ্ছেন কখনও টেলিফোনে কথা বলছেন, কখনও মিটিং করছেন, কখনও লেখালেখি করছেন, কখনও সরাসরি কথাবার্তা বলছেন, কখনও বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করছেন। আল্লাহ

তাঁদের সকলকেই উত্তম প্রতিদান দান করুক। তারা আমার জন্য অনেক অনেক দু'আ করছেন- আল্লাহ্ তাঁদের দু'আ কবুল করুক। এমনকি ঠান্ডা ও বৃষ্টির মধ্যে একটি প্রতিবাদ সভায় পিতামাতাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য শিশুরাও তাদের আরামকে ত্যাগ করে তাদের ভূমিকা পালন করেছে। আমার বৃদ্ধ বাবা (আল্লাহ্ উনাকে রক্ষা করুক) একটি প্রতিবাদ সভায় নাগরিকদের স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলেছেন। কিন্তু শুধুমাত্র আমার বাবা, আমার পরিবার, আমার আত্মীয় স্বজন বা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাই কেন এসকল প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করছে? তারা কেন ঘরে বসে শুধুমাত্র দু'আ করছে না? কারণ এখন তাদের পরিবারের একজন কারাগারে বন্দি। গুয়ান্তানামো বে এর কোনো চাইনিজ লোক কারাগারে বন্দি নয়। তাই তারা শুধুমাত্র দু'আ করে ঘরে বসে থাকেনি। তারা বিভিন্ন প্রতিবাদ, প্রচারণার মাধ্যমে আমাকে মুক্ত করার জন্য চেষ্টা করছে।

এখন আমরা আমাদের এ ক্ষণস্থায়ী জীবন উপভোগ করছি। ব্যাংকে জমানো টাকা, ছেলে মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, স্থায়ী চাকুরী, সুন্দর বাড়ি আর সুখী পরিবার নিয়ে আমাদের জীবন কেটে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে মুসলিম কারাবন্দীদের জন্য শুধুমাত্র দু'আ করে আমরা দায়িত্ব পালনের আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছি। কিন্তু কী হবে যদি সামনের দিন আমাকেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়? কী হবে যদি আমার ঘরের দরজা ভেঙে আমার স্বামী, ভাই, সন্তান বা বাবাকে অস্ত্রধারী শয়তানরা পাশবিক নির্যাতন করে তারপর তাকে কারাগারে বন্দি করে, ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষের জন্য তাকে চার দেয়ালের মাঝে আমরণ আটকে রাখে? তখন কি পরিস্থিতি পালটে যাবে না? তখনও কি আমরা অসহায়ই থাকব যেমনটি আমরা থেকেছিলাম গুয়ান্তানামো বে এর চাইনিজ লোকটির জন্য? তখন কি আমরা শুধুমাত্র দু'আ করেই আমাদের দায়িত্ব শেষ করব? না কি আমরা পুরো পরিবার তার মুক্তির জন্য চেষ্টা করব? আমরা কি তার জন্য টেলিফোনে কথা বলা, লেখালেখি, বিভিন্ন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ, প্রতিবাদ সভা প্রভৃতি করব না? নিজের সাথে সৎ হলে আমরা দেখতে পাব যে, আমাদের মৃত আত্মা এবার জেগে উঠবে। আমরা এবার শুধু ঘরে বসে দু'আ করব না এর সাথে সাথে চেষ্টাও করব।

তাই, সামনে থেকে যখনই দু'আর মাধ্যমে নিজের দায়িত্ব সেরে ফেলার চেষ্টা করবেন তখন নিজেকে সৎভাবে প্রশ্ন করবেন আপনার পরিস্থিতি কি আসলেই মাছের পেটের ইউনুস ﷺ এর মতো অথবা সমুদ্রের সামনের মূসা ﷺ এর মতো? যদি কারও শুধুমাত্র দু'আ ছাড়া অন্য কিছু করার না থাকে তারা হচ্ছে আমাদের মতো কারাবন্দিরা। কিন্তু এমনকি আমরা জেলে থেকেও দু'আর বাইরেও অনেক কিছু করি। আমাদের মধ্যে যারা লেখালেখি করতে পারি তারা লেখালেখি করি।

যারা ছবি আঁকতে পারি তারা ছবি আঁকি। এমনকি যদি আমরা লিখতে বা ছবি আঁকতে নাও পারি তারপরও জেলের অন্যান্য কয়েদিদের মাঝে মুসলিমদের প্রতি ভালো ধারণা জন্মানোর চেষ্টা করি। এতে তারা জেল থেকে বের হলে মুসলিম এবং মুসলিম বন্দিদের প্রতি সুধারণা পোষণ করবে। তারা মুসলিমদেরকে আক্রমণ করার আগে কয়েকবার চিন্তা ভাবনা করবে।

কাজ এবং দু’আ একে অপরের পরিপূরক। তাই যখনই আমরা কোনো আলোচনা সভা আয়োজন করার পরিকল্পনা করি তখন এর পুর্বে দু’আ করি যাতে ভালোভাবে আমরা পরিকল্পনা করতে পারি। সভা চলাকালীন সময়েও দু’আ করি, সভা শেষেও দু’আ করি যাতে আমাদের প্রচেষ্টা ইসলামের জন্য উপকারী হয় এবং যাতে আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টা কবুল করে নেন। এটাই হচ্ছে কষ্টকর পরিস্থিতিতে দু’আর ভূমিকা। তাই পরবর্তীতে যখন শয়তান আমাদেরকে ‘‘আমি শুধুমাত্র দু’আই করতে পারি অন্য কিছু না’’ এ ধরনের কথা বলে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করবে তখন আমরা নিজেদেরজকে সৎভাবে প্রশ্ন করব এবং আমরা দেখতে পাব এসকল কথা দায়িত্ব থেকে দায়সারাভাবে মুক্তিলাভের একটা অগ্রহণযোগ্য অজুহাত ছাড়া আর কিছুই না।

কবিতা

Innocent

He's been indicted,
The general decided,
The paper incited,
He must be guilty

The agents presumed,
Prosecutors consumed,
The Judge assumed,
We're sure he is guilty

The bigots are infused,
TV is amused,
The public is confused,
But trust us, He is guilty

Doesn't matter what we saw,
We'll simply change the law,
Call it the final straw,
We think he is guilty

We have him on a call,
It may be to congressional Hall,
Our goal is to make him fall,
Because we believe he is guilty

The trial would be perfect,
When guilty is the verdict,
Even if the evidence is suspect,
Never mind, we find him guilty

Darioni spoke his mind,
To people of every kind,
Justice may be blind,
But it's hard to find because he is innocent

(প্রফেসর সামি আল-আরিয়ান একজন ফিলিস্তিনী-আমেরিকান মানবাধিকার কর্মী, যিনি আমেরিকায় কারাবন্দী অবস্থায় আছেন।)

‘A DRONE OVER THE SKIES OF MADINAH ...’ (The Final Crusade)

In the Name of Allâh, the Most Beneficent, the Most Merciful

Ask yourself: if the Prophet was with us today,
If he spoke the same words and lived the same way,
If he returned with the same message to relay,
How long would the forces of the world let him stay?

Back then, he taught humankind to: Bow down to none,
No idol, no tyrant, no oppressive nation,
Keep your heart and mind free from their domination,
True power is with God, so don’t fear anyone!’

Quraysh let him be so long as he was benign,
And to his message, they thought that few would incline,
But when he preached openly, would not bend his spine,
The state turned against him, for he had crossed the line;

At first, they rushed to him seeking some compromise,
They’d give him the mic if he just ceased to chastise,
The ills around him they feared he would neutralize,
But he would not clothe his words in any disguise;

And he persisted in making more minds aware,
Of society’s false gods of which to beware,
Of the tyrants of Earth, so the state could not bear,
And his “freedom of speech” vanished into thin air;

Choking him as he prayed, they tried suffocation,
Then imposed three years of economic sanction,
Signed off authorizing his assassination,
He was hunted in his land, forced to migration;

To track down this “radical”, the vast land they’d comb,
Abu Jahl led the pack, his mouth frothing with foam,

Put him on a 'Wanted' list in his own home,
Like Jesus Christ before him at the hands of Rome;

And the Romes of today at whose hands we're abused,
Who preach to us values from which they're self-excused,
How similar the tools of repression they used,
The tyrants of past and present are ever fused;

Today, he'd see us consumed by the same fires,
With the gods in our hearts these worldly desires,
And the gods of the Earth nations and empires,
Headed by killers and professional liars;

He laid siege to Qaynuqa' for one woman's fear,
So what would he say to those who gang-raped 'Abeer[১০]?
Muffled 'Aafia's screams as she shed tear after tear?
And occupy Muslim countries year after year?

He'd come back to remind us to: 'Bow down to none,
No idol, no tyrant, no oppressive nation,
Keep your heart and mind free from their domination,
True power is with God, so don't fear anyone!'

In a repeat of that reality uncouth,
Imagine he stood and struggled for the same truth,
And had the same impact on society's youth,
Would they not once again fight this man nail & tooth?

Of course, they'd first test him to see what he's about,
Would he stay true like before, or would he sell out?
Would fear of the state instill in his mind some doubt?
No doubt, he'd be a mountain shaking off their clout;

---

[১০] আবীর ক্বাসিম আল-জানাবি, ১৪ বছরের ইরাকী এক বালিকা যাকে আমেরিকান সেনারা গণধর্ষণ করে, মারধর করে, তাকে ও তার পরিবারকে গুলি করে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে।

In an era where his inheritors[১১] deprave,
The trust of their knowledge so their skins they would save,
He'd be an inspiration for every field slave,
Craving an example of the fearless and brave;

Their think-tanks would scramble to counter his appeal,
Find scholars for dollars with whom to make a deal,
To persuade us: 'The Prophet is just full of zeal,
Grieving injustices - quote – "perceived" and not real!'

They'd wiretap him as he said: 'Bow down to none,
No idol, no tyrant, no oppressive nation,
Keep your heart and mind free from their domination,
True power is with God, so don't fear anyone!'

Then they'd name him on a federal indictment,
American court would charge him with incitement,
Through Surat at-Tawbah - marked 'Criminal Statement'
Khalid bin al-Walid as his co-defendant;

They'd say he conspired from the North to South Pole,
And seek a life sentence with no chance of parole,
In a bright orange suit on lockdown in the Hole,
Such do they treat those spirits they cannot control;

Like the rest of us who have committed no crime,
But to be a proud Muslim at this point in time,
As the war on his message has reached its full prime,
Giving those who live by it more mountains to climb;

When they saw that in this message he would persist,
They would designate him a global terrorist,
And just like Quraysh, they would pound an angry fist,
Before placing his name on their own target list;

---

[১১] এটি একটি সুপরিচিত হাদীস: 'আলিমগণ হচ্ছেন নবীদের উত্তরসূরী।

Over the skies of Madinah, they'd send a drone,
Distribute 'Wanted' posters with his bearded face shown,
Talk to local tribes, make the reward money known,
For those who capture or kill him and retrieve each bone;

They'd study Badr and Uhud, learn his strategy,
And profile those who pledged to him under the Tree[১২],
Try to identify his 'Number Two' and 'Three, '
Is it Abu Bakr, 'Umar, 'Uthman, or 'Ali?

To the Prophet's Mosque, they'd send an entire brigade,
To round up the Ansar who had given him aid,
To kick down his family's door in a night raid,
To make him the target of their final crusade;

Because his message would still be: 'Bow down to none,
No idol, no tyrant, no oppressive nation,
Keep your heart and mind free from their domination,
True power is with God, so don't fear anyone!'

Imagine if the Prophet was with us today,
If he spoke the same words and lived the same way,
If he returned with the same message to relay,
They'd reserve him a cell at Guantanamo Bay...

তারিক মেহান্না
সোমবার, ৯ যুল-হিজ্জাহ, ১৪৩১/ নভেম্বর ১৫, ২০১০।
প্লাইমাউথ কারেকশনাল ফ্যাসিলিটি, আমেরিকা
আইসোলেশন ইউনিট – সেল#১০৮

[১২] হুদাইবিয়ার সন্ধির দিনে বাইয়াতে রিদওয়ানের কথা বলা হচ্ছে, যা সূরা ফাতহের ১৮ নং আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

Cry of the Caged Bird

Beyond the mask and beyond the front.
Beyond the name and beyond the image.
Beyond the rhyme and beyond the prose.
Beyond the metaphors and beyond the rhetoric.
Beyond the campaign and beyond the publicity.
Beyond the words and beyond the speeches…
There is a caged bird.

There is a caged bird whose only wish is to be a bird again.
There is a caged bird that yearns to fly free again
And soar over the mountain tops and glide through the valleys.
There is a caged bird that is no better than any other bird
And no different to any other bird.
There is a caged bird whose wings have been cut and voice has been muted
Whose only desire is to be a bird again.
That’s why the caged bird sings.

বাবর আহমাদ
২৫/০৫/২০০৭

টীকা

টীকা

আ

আল গায়েব – অদৃশ্য, অজানা বিষয়।

আল ওয়ালা ওয়াল বারা – আল্লাহর জন্য কাউকে ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই কাউকে ঘৃণা করা।

আশ'আরি – ইসলামের একটি ফিরকা।

আহ্‌কামুল হাকিমীন – শ্রেষ্ঠতম বিচারক।

আরববসন্ত – মধ্যপ্রাচ্যের স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে গণজাগরণ।

ই

ইলম – আক্ষরিক অর্থে জ্ঞান, শরী'আহর পরিভাষায় ইসলামের জ্ঞান।

ইসরা – রাতের ভ্রমণ।

ইনসাফ – ন্যায়বিচার।

ইন্টেরোগেশন সেল – জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গঠিত সেল।

ইয়াওমাল হিসাব – শেষ বিচারের দিবস।

ইলাহ – উপাস্য।

উ

উপসাগরীয় যুদ্ধ -অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম নামে সমধিক পরিচিত এই যুদ্ধ সংঘটিত হয় ইরাক বনাম ৩৪টি দেশের জাতিসংঘ নেতৃত্বাধীন যৌথ বাহিনীর মধ্যে।

এ

এক্সট্রা-জুডিশিয়াল – বিচার বহির্ভূত।

এন্তেজাম – ব্যবস্থা।

ক

কারামাহ – অলৌকিক কর্ম।

গ

গীরাহ – আগলে রাখার প্রবণতা, ঈর্ষাপরায়ণতা।

চ

চেকমেট – কিশতিমাত, দাবা খেলায় পরাজিত করা।

জ

জম্বি – জীবন্মৃত।

জিহাদ – আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে জান, মাল ও মুখ দ্বারা যুদ্ধ করা (আল বাদাই উস সানাই)

জিম ক্রো আইন – কালোদের প্রতি এক ধরনের বৈষম্যমূলক আইন যা ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বলবৎ ছিল।

ড

ড্রোন – চালকবিহীন বিমান, আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে এই ধরনের বিমান থেকে বোমা হামলা করা হয়।

ত

তাক্বদীর - এটি হলো ইসলামের আক্বীদার একটি মৌলিক বিশ্বাস যে মতে, এই বিশ্বজগতে যা কিছু হয় তার সবই আল্লাহর ইচ্ছার অধীনে সংঘটিত হয় এবং আল্লাহ তা'আলা জানেন যে কী হতে যাচ্ছে।

তাগুত – আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু বা যাকেই উপাসনা করা হয়।

ত্রিতত্ত্ববাদ (trinity) – খৃষ্টধর্ম ও হিন্দুধর্মের একটি ধারণা যেখানে বোঝানো হয় স্রষ্টা তিনটি সত্তায় বিভক্ত বা বিরাজমান।

দ

দা'ঈ – যিনি মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের পথে ডাকেন, দাওয়াত দেন।

দিলনাশিন – অন্তরকে জুড়িয়ে দেয় এমন।

দীদার – সাক্ষাৎ/দর্শন।

প

পাপস্বীকার (confession) – খৃষ্ট ধর্মের একটি বিশ্বাস, যেখানে একজন পাপী ব্যক্তি গির্জার পাদ্রীর কাছে নিজের পাপ স্বীকার করে তার পাপমোচন করে।

ব

বে-জান – প্রাণহীন।

ম

মি'রাজ – ঊর্ধ্বে আরোহণ।
মুওয়াহহিদ – তাওহীদবাদী। যিনি স্রষ্টার একত্ববাদে বিশ্বাস করেন।
মুবাহালা - যদি মুসলিমদের দুই পক্ষ (বা দুই ব্যক্তি) কোনো ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হয়, তখন উভয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে এবং মিথ্যাবাদীর উপর অভিসম্পাত কামনা করে।
মুত্তাক্বী – যার মাঝে আল্লাহ ভীতি রয়েছে, তাক্বওয়াবান।
মুনাফিক্ব – যার অন্তরে নিফাক রয়েছে। অর্থাৎ মুখে ইসলামে বিশ্বাস করি বললেও অন্তরে রয়েছে ইসলাম বিদ্বেষ।
মুন্তাজির – অপেক্ষমান ব্যক্তি।
মুসনাদ – মুসনাদ-ই-আহমাদ, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বাল / কর্তৃক সংকলিত একটি হাদীসের কিতাব।
মিনিটম্যান - আমেরিকান গেরিলা সশস্ত্রযোদ্ধা।

র

রেদা – সন্তুষ্টি।

শ

শরী‘আহ – আল্লাহ প্রদত্ত বিধি বিধান।

স

সালাফ – পূর্বসূরী। মূলত সাহাবি ﷺ, তাবে'ঈ এবং তাবে-তাবে'ঈদের সালাফ বলা হয়।
সালাফি – যারা সাহাবি ﷺ, তাবে'ঈ ও তাবে তাবে'ঈদের পন্থা অনুসরণ করেন।
সীরাহ – রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনী।
সুফিয়ান আস সাওরী - একজন তাবে'ঈ, সাহাবিদের পরের প্রজন্মের।
সুফি – যারা তাসাউউফের দাবি করেন। অর্থাৎ আত্মশুদ্ধির জন্য দুনিয়া বিমুখ হয়ে কতিপয় নির্দিষ্ট জিকিরে আজকারে মগ্ন হয়ে পড়েন।
স্যাম এডামস ও জন হ্যানকক – আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রামের দুই অগ্রপথিক।

হ

হিজরত – আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে এবং নিজের দ্বীনদারিকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে কোনো স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা।
হিজরি ক্যালেন্ডার – রাসূল ﷺ এর হিজরতের পর থেকে গণনাকৃত ক্যালেন্ডার।
হেবা দাব্বাগ (Heba Dabbagh) – সিরিয়ার কুখ্যাত শাসক হাফিয আল আসাদের এক কারাগারের এক বন্দিনী, যিনি সেখানকার নারকীয় অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি বই লিখেছেন যেটির নাম Just Five Minitues□

অন্যান্য

Counter-radicalism conference- ইসলাম ও মুসলিমদেরকে প্রতিরক্ষা করার প্রচেষ্টা তথা জিহাদকে ‘চরমপন্থা’ আখ্যা দিয়ে কীভাবে সেটার মোকাবেলা করা হবে সে উদ্দেশ্যে আয়োজিত কুফফার আয়োজিত একটি কনফারেন্স, যেখানে কিছু মুসলিম দা’ঈ অংশ নিয়েছিলেন বলে লেখক এর তীব্র সমালোচনা করেছেন।

ICNA - Islamic Circle of North America.

M15 – ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস।

M16 – ব্রিটিশ সিক্রেট ইন্টেলিজেন্ট সার্ভিস।

Stockholm syndrome - এমন একটি মানসিক অবস্থা যেখানে জিম্মি বা অপহৃত ব্যক্তি অপহরণকারী ব্যক্তির প্রতি এক ধরনের সহানুভূতি বোধ করে।

………..

‘...আমরা আমাদের এ ক্ষণস্থায়ী জীবন উপভোগ করছি। ব্যাংকে জমানো টাকা, ছেলে মেয়ের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, স্থায়ী চাকুরী, সুন্দর বাড়ি আর সুখি পরিবার নিয়ে আমাদের জীবন কেটে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে মুসলিম কারাবন্দিদের জন্য শুধুমাত্র দু'আ করে আমরা দায়িত্ব পালনের আত্মতৃপ্তির ঢেঁকুর তুলছি। কিন্তু কী হবে যদি সামনের দিন আমাকেই ধরে নিয়ে যাওয়া হয়? কী হবে যদি আমার ঘরের দরজা ভেঙে আমার স্বামী, ভাই, সন্তান বা বাবাকে অস্ত্রধারী শয়তানরা পাশবিক নির্যাতন করে? আটকে রাখে? তখনও কি আমরা অসহায় চেয়ে থাকবো? শুধুমাত্র দু'আ করেই ক্ষান্ত হবো?...’